সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কিশোর সাহিত্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কিশোর সাহিত্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কিশোর সাহিত্য

সম্পাদনা

অশোককুমার মিত্র

শিশু সাহিত্য সংসদ

SYED MUSTAFA SIRAJ : KISHOR SAHITYA

(Selected Works of Syed Mustafa Siraj)

ed. Ashokekumar Mitra

ISBN : 978-81-7955-149-3

পুস্তকসজ্জা ও অলংকরণ : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

অলংকরণ : অলয় সেনগুপ্ত

প্রকাশক

দেবজ্যোতি দত্ত

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি.

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক

নটরাজ অফসেট

১, নিরঞ্জন পল্লি, তেঁতুল তলা

কলকাতা-৭০০ ১৩৬

সূচি
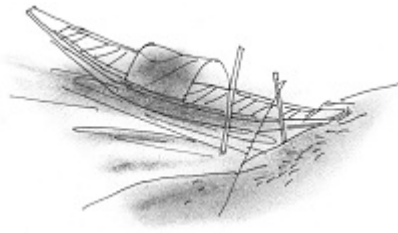
প্রকাশকের কথা

শিশু সাহিত্য সংসদের বয়স হল তিন কুড়ি। ছড়ায়-পড়ায়, গদ্যে-পদ্যে, জ্ঞানে-মনোরঞ্জনে এতখানি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুনির্মল বসু, সুখলতা রাও সেই থেকে আজও আছেন। খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত শিশু-কিশোর সাহিত্যের সে ভাঁড়ারে আজও জোগান দিচ্ছেন। এ ছাড়া এখন যাঁরা দিয়ে চলেছেন : ছোটোদের জন্য গৌরী ধর্মপাল, শৈলেন ঘোষ ও বলরাম বসাক, ছড়া-কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শঙ্খ ঘোষ, কিশোর সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, নবনীতা দেবসেন এবং সদ্যপ্রয়াত মতি নন্দী। শিশু সাহিত্য সংসদের হীরকজয়ন্তী উদযাপন এঁদের নিয়েই, যাঁরা দিয়ে চলেছেন, তাঁদেরই স্ব-নির্বাচিত লেখার সংকলন নিয়ে। জয়ন্তী উদযাপনের এর চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে!

এ প্রসঙ্গে শ্রীঅশোককুমার মিত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ। তিনিই অক্লান্ত পরিশ্রমে লেখা জোগাড় থেকে সম্মতি সংগ্রহ পর্যন্ত সব কাজ করে সংকলনগুলিকে সম্ভব করে তুলেছেন। তাঁর উৎসাহের তুলনা নেই। সর্বোপরি তাঁর যোগ্য সম্পাদনাতে সংকলনগুলি আশা করি পাঠকদের মনের মতো হয়ে উঠতে পেরেছে।

দেবজ্যোতি দত্ত

কলকাতা

ডিসেম্বর ২০১০

সম্পাদকের কথা

ইংরেজিতে ছোটোদের জন্য রংচঙে কত বাহারি বই, বিদেশি ভাষাতেও। বাংলায় তো তেমন একখানি বই-ও নেই। কেন? বাংলায় কি তেমন লেখক নেই, তেমন ছবি-আঁকিয়ে নেই? এমনই ভাবনা জেগেছিল এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর মনে। এতদিন তো জীবন কেটেছে বিদেশি নাগপাশ ছেঁড়ার লড়াইয়ে। সদ্যস্বাধীন দেশে ছোটোদের জন্য আনন্দ আর শিক্ষাদানের বই প্রকাশে উদ্যোগী স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রকাশ করলেন *ছড়ার ছবি*-১। পুরোনো দিনের ছড়ায় ছবি আঁকলেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৯ সালে বেরোল চার রঙে ছাপা ছোটোদের মন-কাড়া বড়ো মাপের সেই বই, যা এতকাল তিনি চেয়ে এসেছিলেন। পরের বছরে বেরোল *ছড়ার ছবি*-২ আর *ছড়া-ছবিতে অ আ ক খ*। আর তখনই ঠিক হল স্থায়ী প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা। ১৯৫১-র ১ আগস্ট জন্ম নিল নতুন ধারার প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান, ছোটোদের সাহিত্যের জন্য 'শিশু সাহিত্য সংসদ' আর বড়োদের বইয়ের জন্য 'সাহিত্য সংসদ'। এ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য শুধু মুদ্রণ সৌকর্যেই নয়, বিষয় নির্বাচনেও। প্রকাশিত প্রতিটি গ্রন্থের পিছনে থাকে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা, নিখুঁত সম্পাদনা ও অনুপম প্রকাশনা। শুরু থেকে প্রকাশনা মানের যে ঐতিহ্য নির্মাণ করেছিলেন মহেন্দ্রনাথ, তাকে আজ এই হীরকজয়ন্তী বর্ষেও ধরে রেখে উন্নত করার সাধনায় ব্রতী রয়েছেন তাঁর উত্তরসূরীগণ। এখন বিষয় নির্বাচনে তারা অতি সতর্ক, নিত্য উদ্ভাবক। প্রকাশন সৌষ্ঠবে দরদি ও নিপুণ।

বাংলায় ছোটোদের সাহিত্যে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে নিয়ে যত কাহিনি লেখা হয়েছে, তত গল্প আর কোনো গোয়েন্দাকে নিয়ে আজও লেখা হয়নি। অথচ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রথমে গোয়েন্দা কাহিনি লিখতেন না, এমনকী ছোটোদের জন্যেও সাহিত্য রচনা করতেন না। আসলে সিরাজ সাহেবের জীবনটাই বড়ো বিচিত্র। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের মানুষ। বিল, মাঠ, দ্বারকা নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকা, গাছপালা, রং-বেরঙের পাখি, প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতির উদার আহ্বানে তাঁর মনপ্রাণ ভরে যেত। বিলের জলে মাঝে মাঝে হাঁসের ঝাক উড়ে আসত। জোছনার আলোয় বালক সিরাজের মনে হত পরির দল নামছে। গাঁয়ের রাখাল, জেলে, চাষি, মজুর সবাই বন্ধু। আবার ইশকুলে পড়াশোনা, বাড়ির শিক্ষিত পরিশীলিত পরিবেশ। আরেকটি গুণ ছিল, মাঝে মাঝেই বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যেতেন- কোনো বন্ধুর বাড়ি, কি দূরের কোনো আত্মীয়ের বাড়ি। যাত্রা-নাটক দেখারও নেশা ছিল, আবার লাইব্রেরির বই পড়ারও। বাঘের দেখা পেয়েছেন, ভূত দেখতে গিয়েছিলেন। গাঁ-শহরের কত ধরনের মানুষ যে দেখেছেন! গান গাইতে পারতেন, ইস্কুলে পড়ার সময়ে এক বেয়ারার কাছে বাঁশি বাজানো শিখেছিলেন। বহুকাল আলকাপের দলের মাস্টার ছিলেন। আলকাপ হল মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের অপেরাধর্মী লৌকিক গান। বাংলা লোকসংস্কৃতির এক অমূল্য সম্পদ। এই দলের সঙ্গে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে অনেক ঘটনা দেখেছেন, অনেক মানুষ চিনেছেন।

কলকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা *অমৃত*-র জন্য কর্নেলকে নিয়ে প্রথম উপন্যাসটি লেখেন। লালবাগে দেখা একটি মানুষের আদল আছে কর্নেলের চেহারায়। সেটি ছিল

বড়োদের জন্য লেখা উপন্যাস। ছোটোদের জন্য লিখলেন *আনন্দমেলায়*, সত্যজিৎ রায়ের অনুরোধে *সন্দেশ*-এ আর কিশোর পাঠকদের চাহিদায় ছোটোদের প্রায় সব পত্রিকায়।

তবে শুধু কর্নেল কাহিনি নয়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প নানা রসের, নানা ধারার। ভূতের গল্পে, কল্পবিজ্ঞানের গল্পে, রূপকথার গল্পে, মজার গল্পে, মেঘলা দিনের গল্পে-তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বিচিত্র জীবন যাত্রা তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিটি যেমন ভরে দিয়েছে তেমনি তাঁকে গল্পের জোগান দিয়ে চলেছে নিরন্তর স্রোতের মতো।

ধরো, বকুল গাছের সেই লোকটা। বেঁটে নাদুসনুদুস গড়নের। হনুমানের মতো ধুপ করে বকুল গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল। হাঁটু অবধি পরা ধুতি, খালি গা, কুচকুচে কালো রং। বুকের ওপর পইতে ঝুলছে-অত বিবরণে দরকার কী-সে লোকটির গল্প কত মজার।

কর্নেলের গল্প তো রইলই, তা ছাড়া আরও অনেক অনেক গল্পে সাজানো হল সিরাজের কিশোর সাহিত্য।

অশোককুমার মিত্র

কলকাতা

ডিসেম্বর ২০১০

গল্প

খাই খাই বুড়ো

সেই আজব রাজ্যের সুখের কথা কী বলব, এমন সুখশান্তি পৃথিবী খুঁজলে কোথাও তুমি দেখতে পাবে না। সেখানে মাঠভরা সোনার ফসল, গাছভরা মিঠে ফল, আর শহরে-বাজারে, দোকানপাটে থরে থরে সাজানো কতরকম সুন্দর জিনিস। কারও কোনো অভাব নেই। সবাই সুখী। তাই চোর-ডাকাত নেই। খুনোখুনি নেই। তা ছাড়া পশুপাখিরা সেখানে মানুষকে ভয় করে না। ফুলে ফুলে আলো সে রাজ্যের বাগিচাগুলো। প্রজাপতি ওড়ে। পাখি ডাকে। লোকেরা মনের আনন্দে গান গায়, আর যে-যার কাজ করে। তারপর রাত হলে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

হঠাৎ একদিন সেই সুখের রাজ্যে এক অবাক কাণ্ড দেখা গেল।

রান্না করে বউ-ঝিরা নাইতে গেছে ঘাটে। ফিরে এসে দেখে, সব খাবার কে চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছে।

ফলের বাগানে গাছভরা ফল ছিল। হঠাৎ কখন সব ফল উধাও।

চাষিরা মাঠে ফসল লাগিয়েছিল। সেই ফসল আর দেখা যাচ্ছে না।

আর সে-রাজ্যের রাজার ছিল ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি। সকালে আস্তাবলে এসে ঘোড়ার সহিস আর হাতির মাহুতের চোখ কপালে উঠেছে। কী সর্বনাশ! গেল কোথায় সব?

তারপর দিনে দিনে আরও আজগুবি ঘটনা ঘটতে লাগল...

কোথাও একটুখানি খাবার মতো জিনিস নেই। ঘরে ঘরে উপোস চলল। রাজার কাছে নালিশ গেল। রাজা কোতোয়ালকে ধমকে বললেন, ‘যেমন করে হোক, এই আজব কাণ্ডের বিহিত করো। নইলে গর্দান যাবে।’

কোতোয়াল পাহারা দেয়। কিন্তু কোনো ফল হয় না। এমনকী, শেষে দেখা গেল সবুজ পাতাগুলি নেই, ঘাস নেই-সব রুক্ষ ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে। আর প্রজাপতি দেখা যায় না। পাখি নেই। জন্তুজানোয়ার বলতে কিছু নেই। তারপর একটা-দুটো করে জ্যান্ত মানুষও উধাও হয়ে যাচ্ছে। দেশটা একেবারে শ্মশানের মতন দেখাচ্ছে।

তখন কোতোয়াল রাজার সামনে এসে বলল, 'মহারাজ, নির্ঘাত কোনো মায়াবী রাক্ষসের কাণ্ড। মায়াবলে অদৃশ্য হয়ে সব কিছু খেয়ে ফেলছে। হয়তো এরপর সব জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদ খাওয়া শেষ হলে আস্ত ঘরবাড়িগুলো খেয়ে ফেলবে। তার চেয়ে বরং আমরাই এখুনি কেটে পড়ি চলুন।'

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'সর্বনাশ! একটা উপায় বের করো তো মন্ত্রী।'

মন্ত্রী মাথা চুলকে বলল, 'উপায় আর কী মহারাজ। কোতোয়াল যা বলছে, তাই করা যাক। চলুন, সরে পড়ি। প্রাণে বাঁচলে ফের একটা রাজ্য মিলতে পারে। সেনাপতি আছে, তার কোমরে তলোয়ার আছে-তখন সে ভাবনা নেই। কী বল সেনাপতি?'

সেনাপতি সায় দিয়ে তলোয়ার ঘুরিয়ে বলল, 'আমিও তাই বলছি মহারাজ।'

ব্যাস রাতারাতি রাজা মন্ত্রী সেনাপতি কোতোয়াল আর যারা যারা বেঁচে ছিল, দল বেঁধে পালাল রাজ্য ছেড়ে। রাজ্যে তখন সত্যি সত্যি শ্মশানদশা। খাঁ-খাঁ নিঝুম পুরী। একটুও সবুজ রং নেই কোথাও। শুধু ঘরবাড়িগুলিই যা রইল...

কিন্তু না, সবাই পালাল বলছি বটে, একজন থেকে গেল চুপিচুপি। এক সুন্দর ছেলে। এই রাজ্যের প্রতিটি জিনিসের উপর ছিল তার ভালোবাসা। এর মাঠ, নদী, বন, গাছপালা, ফুল, পাখি, প্রজাপতিদের সে ভালোবাসত। সে তাই এই শ্মশান-রাজ্য ছেড়ে কোথায়ও যেতে চাইল না। সে অবাক হয়ে খুঁজতে বের হল, কে সেই অদৃশ্য রাক্ষস? কেন সে সব কিছু খেয়ে ফেলল এমনি করে?

মাটিতে ঘাস গজায় না। গাছে গজায় না পাতা। নদীর জল গেছে শুকিয়ে। আর সে সেই শূন্য রুক্ষ মরুভূমির মতো মাটিতে ক্লান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। আজব রাক্ষস কিন্তু তাকে খায় না। হয়তো মজা দেখে। অতটুকু একটা বাচ্চা ছেলে। রাক্ষুসে মুখে বড়ো জোর একটা খুদে রসগোল্লা বই তো আর নয়!

কিন্তু রাক্ষুসে লোভ যাবে কোথায়? একদিন সে আর থাকতে পারল না। সামনে এসে দাঁড়াল। গর্জে উঠল, 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ!'

ছেলেটি কিন্তু ভয় পাবে কী, ওকে দেখে হেসেই খুন।

রাক্ষস চোখ কটমট করে বলল, 'হাসছ যে? ভয় হচ্ছে না আমায় দেখে?'

ছেলেটি জবাব দিল, 'হাসব না কেন? আরে, তুমি যে দেখছি মানুষের মতো।'

'মানুষের মতো?' রাক্ষস একেবারে অবাক।

'হ্যাঁ, তোমায় কেমন দেখাচ্ছে জান? অবিকল একটা বুড়ো মানুষ। রোসো, তোমার নাম দিলুম, খাই খাই বুড়ো। খুশি তো?'

রেগে-মেগে রাক্ষস ওকে হালুম করে গিলে ফেলল। কিন্তু কী মুশকিল! ছেলেটি পেটের ভিতর এমন লাফালাফি শুরু করে যে, সে ওয়াক করে উগরে দিতে বাধ্য হয়। ফের অবশ্য গিলে নেয়। ছেলেটি নাকের ভিতর অ্যায়সা সুড়সুড়ি দেয় যে, সে হেঁচে ফেলে, 'হ্যাঁচ্ছো'। ছেলেটি ডিগবাজি খেয়ে বেরিয়ে পড়ে, হাততালি দিয়ে হাসে।

অগত্যা বেচারা হার মেনে বলল, 'ওফ! কী সর্বনেশে ছেলে রে বাবা! ঠিক আছে। তোমায় ছেড়ে দিলুম।'

ছেলেটি বলল, 'না খাই খাই বুড়ো, সেটি হচ্ছে না। আমি কিন্তু তোমায় ছাড়ছি না।'

রাক্ষস চোখ পাকিয়ে বলল, ‘ছাড়ছি না মানে? যাও বকবক কোরো না আর। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। দেখি, অন্য কোথাও যাই। এখানে তো আর খাবার মতো কিছু নেই।’

ছেলেটি বলল, ‘তোমার খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?’

‘ঃও! ভীষণ খিদে। দিন-রাত্তির পেটটা শুধু খাই খাই করে। ওই তো হল জ্বালা...’ রাক্ষস দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

চিন্তিত মুখে ছেলেটি বলল, ‘তাই তো! খাই খাই বুড়ো, তোমার সত্যি কোনো দোষ নেই বাপু। এত খিদে থাকলে তুমি আর কী করবে বলো। তবে যদি একটা কাজ কর, এত খিদে তোমার থাকবে না-আর রাজ্য শ্মশান হবে না। করবে?’

খাই খাই বুড়ো আর ছেলেটি তখন হনহন করে হাঁটতে থাকল। মাঠ নদী বন জঙ্গল পেরিয়ে সে আর এক রাজ্য। সেখানে একটা পাহাড়ের চুড়োয় ঘর। ছেলেটি বলল, ‘খাই খাই বুড়ো, এই ঘরে যে থাকে সে তোমার মিতে-নাম তার উপোসি বুড়ো। বেচারা কিস্যু খেতে পারে না! শুকিয়ে আমশি হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। কত কবরেজ-বদ্যি করল, কোনো ফল হয়নি। ওর খিদেই পায় না।’

খাই খাই বুড়ো মহানন্দে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, ‘মিতে, ওহে উপোসি মিতে!’

উপোসি বুড়ো রোগাপটকা গতর নিয়ে বেরিয়ে অতি কষ্টে বলল, ‘কে রে?’

‘আহা, কাছে এসেই দেখো, কে এসেছে।’ বলে ছেলেটি উপোসি বুড়োকে টানতে টানতে খাই খাই বুড়োর সামনে নিয়ে গেল।

কী তাজ্জব কাণ্ড! দুই বুড়ো যেই-না কাছাকাছি হয়েছে, ছেলেটি দু-জনের পিছনে দুটো ধাক্কা লাগাতেই ব্যাস। দুই বুড়ো একাকার-একসঙ্গে মিলেমিশে একজন।

তার ফলাফল কী হল বলব?

বলে আর লাভ নেই। নিজেই বুঝে নাও না।

আর যদি অগত্যা বুঝতে না পার, অঙ্ক কষে দেখো প্ল্যাসকে মাইনাস দিয়ে গুণ করলে কী হয়? স্রেফ মাইনাস।

তাহলে বুঝতে পারছ, ফের গাছভরা ফুলফল, পশুপাখি, প্রজাপতি আর খেতভরা ফসল, থরে থরে সাজানো দোকানপাট, মানুষ নির্ভয়ে সুখশান্তিতে বাঁচছে।

ছেলেটি কে চিনতে পারছ না?

আরে, সে তো তুমিই।

বকুল গাছের লোকটা

এ আমার ছেলেবেলার কাহিনি। ইচ্ছে হলে বিশ্বাস না করতেও পার কেউ। কিন্তু সত্যি ঘটেছিল।

এক শীতের সকালে পুবের বারান্দায় ঝলমলে রোদ্দুর খেলছে। আমি আর আমার বোন ইলু শতরঞ্চি পেতে বসে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করছি। ক-দিন বাদেই বার্ষিক পরীক্ষা কিনা! তার ওপর মেজোকাকা বলে দিয়েছেন, 'যত জোরে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করবি, তত ভালো রেজাল্ট হবে।' ইলু তো গলা ভেঙে ফেলল উৎসাহের চোটে। কিছুক্ষণ পরে শুনি, ফ্যাঁসফ্যাঁস আওয়াজ বেরোচ্ছে বেচারির গলা থেকে। সে মাঝে মাঝে বই থেকে মুখ তুলে করুণ চোখে তাকিয়ে যেন মেজোকাকাকেই খুঁজছে।

মেজোকাকার পাত্তা নেই। আমি বললুম, 'ইলু, বরং জল খেয়ে আয়!'

ইলু ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, 'যদি মেজোকাকু এসে পড়েন!'

'তুই ঝটপট খেয়ে আয় গে না! আমি বলব মা ইলুকে ডেকেছেন।'

এই শুনে ইলু জল খেতে গেল ভেতরে। আমি আবার চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করেছি, 'মোগল সম্রাট আকবর... মোগল সম্রাট আকবর...', সেই সময় কোত্থেকে হেঁড়ে গলায় কে বলে উঠল, 'কী পড়া হচ্ছে খোকাবাবু?'

আমাদের বাড়ির এদিকটায় বাগান। বাগানের ওপাশে ধান খেত। সবে পাকা ধান কেটে নিয়েছে চাষিরা। সেদিকে দূরে ঘন নীল কুয়াশা ভাসছে, যেন বুড়ো মাঠ আলোয়ান গায়ে দিয়ে এখন ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে আছে। বারান্দা থেকে কয়েক মিটার তফাতে আছে একটা ঝাঁকড়া বকুল গাছ। মনে হল, আওয়াজটা এসেছে ওই গাছ থেকেই। তাই মুখ তুলে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। খুঁজছি কে কথা বলল।

হঠাৎ দেখি, বকুল গাছ থেকে হনুমানের মতো ধুপ করে নীচে লাফিয়ে পড়ল একটা বেঁটে নাদুসনুদুস গড়নের লোক। হাঁটু অব্দি পরা ধুতি, খালি গা, কুচকুচে কালো রং।

বুকের ওপর দিয়ে একটা পইতে ঝুলছে। তার মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলো ছোটো করে ছাঁটা, খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে। টিকিতে ফুল গোঁজা। তার গোঁফগুলো সেইরকম বিচ্ছিরি। হাতে একটা হুঁকোও আছে। পায়ে খড়ম আছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল। তারপর এগিয়ে আসতে লাগল। আমি তো অবাক। হাঁ করে তাকিয়ে আছি। নাকে ভুরভুর করে তামাকের মিঠে গন্ধ ভেসে আসছে। আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই ঠিক এমন সুগন্ধি তামাক খেতেন।

কিন্তু বকুল গাছে এমন হুঁকো-খাওয়া বিদঘুটে চেহারার লোক থাকাটা যদি-বা মেনে নেওয়া যায়, তার এভাবে পড়া ডিসটার্ব করতে আসাটা মোটেও উচিত হয়নি। মেজোকাকা থাকলে নিশ্চয় আপত্তি করতেন।

সে হুঁকোয় গুড়ুক গুড়ুক আওয়াজ করে টান দিতে দিতে আমার একটু তফাতে পা ঝুলিয়ে বসল। তারপর হুঁকো নামিয়ে বাঁ-হাতে ধরে রেখে বলল, ‘কী? ওটা কী পড়া হচ্ছে?’

গম্ভীর মুখে জবাব দিলুম, ‘ইতিহাস।’

এই শুনে সে খিক খিক করে হেসে উঠল, ‘ইতিহাঁস? সে আবার কেমন হাঁস খোকা? এ্যা? ঢের ঢের হাঁসের নাম শুনেছি। ইতিহাঁস নামে কোনো হাঁসের কথা তো শুনিনি!’

কী বোকা লোক রে বাবা! হাসি পেল। বললুম, ‘না, না। হাঁস নয়। ইতিহাস।’

লোকটা বলল, ‘সেই তো বলছি গো! পাতিহাঁস, এলেহাঁস, বেলেহাঁস, জলহাঁস, রাজহাঁস, বুনোহাঁস... কতরকম হাঁস আছে। তা সেসব ছেড়ে ওই উড্ডুট্টে ইতিহাঁস নিয়ে পড়াটা সুবিধের নয়। বরং ওই যে কী বলে পাতালহাঁস-নাকি হাঁসপাতাল-সেটাও মন্দ নয়!’

এবার একটু রাগ হল। বললুম, ‘তুমি কিস্যু বোঝ না!’

‘বুঝি না? আমি বুঝি না?’ লোকটাও চটে গিয়ে মুখখানা তুম্বো করে ফেলল। ‘আমি বুঝি না তো কে বোঝে শুনি? কোথায় থাকে তোমার ইতিহাঁস?’

বইয়ের পাতা দেখিয়ে বললুম, ‘এই তো এখানে থাকে।’

সে আবার ফিক করে হাসল।-‘ওই শুকনো খসখসে বইয়ের পাতায় ইতিহাঁস থাকে? বলছ কী খোকা! খায় কী? এখানে তো দেখছি জল-টল একফোঁটা নেই। সাঁতার কাটছেই-বা কেমন করে?’

বুঝলুম, বকুল গাছের এই হুঁকোখোর লোকটা একটি মুখ্যু। লেখাপড়াই জানে না। তাই ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবার জন্য বললুম, ‘ইতিহাঁস নয়, ইতিহাস। এর মানে কী জান?’

সে আপত্তি করে বলল, ‘আমাকে মানে বোঝাতে এসো না! বিস্তর হাঁস দেখে দেখে বুড়ো হয়ে গেলুম। দিনে-রেতে ঝাঁকে ঝাঁকে ডানা শনশন করে কত হাঁস আসছে যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। কতরকম গানও গায় তারা, জান? শোনো।’ বলে সে হেঁড়ে গলায় গুনগুন করে গেয়ে উঠল :

‘তেপান্তরের মধ্যিখানে

মস্ত একটা বিল আছে।

কলমিদামে শালুক পানায়

কত যে ফুল ফুটতাছে

শামুক বুড়ো চিংড়িবুড়ি

বড়ো সুখে রোদ পোহায়

কে যাবি ভাই আয় রে সাথে

শনশনিয়ে আয় রে আয়...'

গানটা কেমন ঘুম ঘুম সুরে ভরা। শুনতে শুনতে হাই ওঠে। ঢুলুনি চাপে। শীতের লম্বা রাতে বেজায় লম্বা ঘুমের পর এই মিঠে রোদের সক্কাল বেলা আবার ঘুমিয়ে পড়াটা বিপজ্জনক। মেজোকাকা এসে টের পেলেই চুল খামচে ধরবেন।

গান শেষ করে লোকটা চোখ নাচিয়ে বলল, 'দারুণ গান। তাই না?' বলে সে আবার গুড়ুক গুড়ুক আওয়াজ করে হুঁকো টানতে থাকল।

আমি ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে বললুম, 'গানটা ভালো লাগল। তবে বড্ড ঘুম পায় যে। ওগো লোকটা, তুমি বরং রাতে শোবার সময় এসো। এখন যাও। পড়া ডিসটার্ব কোরো না। মেজোকাকা বকবেন।'

'কে তোমার মেজোকাকা? ঢ্যাঙা রোগামতো ছোকরাটা বুঝি?'

'চুপ! ও কথা বোলো না। মেজোকাকাকে রোগা বললে আগুন হয়ে ওঠেন। মেজোকাকার একটা কুকুর আছে, জান তো? তার নাম কালু। কালুকে...'

এ পর্যন্ত শুনেই লোকটা যেন চমকে উঠল। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কালু এখন বাড়িতে আছে নাকি?'

বললুম, 'মনে হচ্ছে না। থাকলে এতক্ষণ তোমাকে...'

'ওরে বাবা! বোলো না বোলো না!'

ওকে ভয় পেতে দেখে খুব মজা লাগল। বললুম, 'তাই তো বলছি, পড়ায় ডিসটার্ব না করে তুমি কেটে পড়ো। এক্ষুনি কালু এসে পড়তে পারে। বোধ হয় মেজোকাকার সঙ্গে পাড়াবেড়াতে বেরিয়েছে।'

লোকটা উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'তাহলে আসি। আমার কথা কাকেও বোলো না যেন। পরে সময়মতো এসে তোমাকে আরও হাঁসের গান শোনাব। ইচ্ছে করলে দেখতে যেতেও পার হাঁসেরা কোথায় থাকে! কিন্তু তাই বলে সেখানে তোমার ওই ইতিহাঁস দেখতে পাবে ভেবো না! তোমার পড়ার বইতে মিথ্যে লিখেছে! বরং ওই যে কী বলে পাতালহাঁস বা হাঁসপাতাল সত্যি হলেও হতে পারে।'

এই বলে সে খড়ম পায়ে চাপা খট খট শব্দ তুলে বকুল গাছে দিব্যি চড়ে গেল এবং ঝাঁকড়া ডালপালার মধ্যে অদৃশ্য হল। আমি অবাক হয়ে বসে রইলুম। আমাদের বাগানের বকুল গাছটাতে এমন কেউ থাকে তা তো শুনিনি। বাবা মা মেজোকাকা সেজোকাকা ছোটোকাকা কেউই বলেননি।

ইলু এতক্ষণে এসে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'কী রে বিলু? কী দেখছিস অমন করে? সেই লেজঝোলা পাখিটা?'

উঁহু, বকুল গাছের লোকটা পইপই করে বারণ করেছে। কাকেও ওর কথা বলব না।

'কী রে বিলু? বলছিস না যে! বারবার জিজ্ঞেস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে না বুঝি?'

ইলুকে পাত্তা না দিয়ে আবার পড়া শুরু করলুম: 'মোগল সম্রাট আকবর... মোগল সম্রাট আকবর... ইতিহাস না-পাতিহাঁস এলেহাঁস বেলেহাঁস রাজহাঁস পুষতে ভালোবাসতেন। তাই তিনি...'

ইলু অবাক হয়ে বলল, 'কী পড়ছিস রে? দাঁড়া, মেজোকাকু আসুক।...'

বকুল গাছের লোকটার কথা আমি কাকেও বলিনি। সেই যে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল, তারপর কত বার এই বারান্দা কিংবা বাগানে একলা হলেই সে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। কতরকম মজার মজার গল্প শুনিয়েছে। কত আজব ছড়া!

কিন্তু মুশকিল বাধাচ্ছিল মেজোকাকার কুকুর কালু। বেশ দু-জনে কথা বলছি, হঠাৎ কালুটা কোথায় ঘেউ ঘেউ করে ওঠে, অমনি লোকটা বকুল গাছে লুকিয়ে পড়ে। কালুটা মহাপাজি। গাছটা চক্কর দিয়ে ওপরে মুখ তুলে কতক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে। আমি ওকে তাড়াতে গেলে দাঁত বের করে আমাকে কামড়াতে আসে। আমি ঢিল ছুড়ে তাড়াই।

একদিন বিকেলে স্কুল থেকে শেষ পরীক্ষা দিয়ে ফিরে বাগানে একলা দাঁড়িয়ে ওর একটা গপ্প শুনছি। গপ্পটা দারুণ মজার। আমাদের গাঁয়েরই এক শাকতোলানি বুড়ি গেছে তেপান্তরের মাঠের মধ্যিখানে সেই হাঁসচরা বিলে। বুড়িটা ছিল বড্ড কুঁদুলি। লোকে বলত পাড়াকুঁদুলি। কারণ পাড়ার লোকের সঙ্গে হুট করতেই কোঁদল জুড়ে দিত।

সেই পাড়াকুঁদুলি বুড়ি আপন মনে হাঁসচরা বিলে কলমি শাক তুলছে। তার স্বভাব যাবে কোথায়? একটা শামুকের শুঁড়ে ওর ঠ্যাঙে সুড়সুড়ি লেগেছে বলে বুড়ি তার সঙ্গে কোঁদল জুড়ে দিয়েছে।

বুড়ি নেচে নেচে ছড়া গেয়ে কোঁদল করছে:

'তোর মুণ্ডু খাই, তোর কত্তাবাবার খাই

কড়মড়িয়ে খাই আমি মড়মড়িয়ে খাই

খেয়েদেয়ে ড্যাংডেঙিয়ে নাতির বাড়ি যাই...'

এদিকে হয়েছে কী, জলার ধারে থাকে এক শাঁখচুন্নি। সেও পেতনিপাড়ার নামকরা কুঁদুলি। শাঁখ, গুগলি, কাঁকড়া আর শামুক তার খাদ্য। এ বুড়ি যেমন পেটের জ্বালায় শাক তুলতে গেছে, সেই শাঁখচুন্নিও তেমনি পেটের জ্বালায় গুগলি, শামুক খুঁজতে গেছে। শাকতোলানির গলা পেয়ে সে ট্যাঙস ট্যাঙস করে সেখানে হাজির হয়েছে। হয়ে বলেছে, 'কী কী কী?'

ব্যাস! দুই কুঁদুলিতে বেধে গেছে তুমুল কোঁদল। কেউ থামবার নয়। পরস্পর আঙুল তুলে পরস্পরকে শাসাচ্ছে। সে কী চিলচ্যাঁচানি! সে কী নাচনকোঁদন!

হেন সময়ে জলার হাঁসদের রাজার কানে গেছে সেই খবর। হাঁসের রাজা রাজহাঁস খাপ্পা হয়ে বলল,

'প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁকোর প্যাঁক...

শিগগির গে দেখ তো

কারা দেখায় জাঁক রে

কাট তাদের নাক

তবু না থামে যদি,

কাটিস চুল আর দু-কানের লতি

প্যাঁক প্যাঁকোর প্যাঁক

শিগগির গে' দেখ তো।।...'

হুকুম পেয়েই জলার যত পাতিহাঁস বেলেহাঁস, শনশনিয়ে ডানা কাঁপিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লেগেছে। আকাশ-বাতাসে হুলুস্থুল। জলার জল ঢেউয়ে তোলপাড়। তারপর কিনা...

আচমকা ঘেউ ঘেউ! ঘেউ ঘেউ! বাড়ির ভেতর থেকে হতচ্ছাড়া কালুটা বেরিয়ে বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পড়ল এবং তাকে দেখেই আমার বকুল গাছের হুঁকোখেকো বন্ধুবেচারা এক লাফে গাছে চড়ে অদৃশ্য হল। তার হুঁকোটা পড়ে গেল হাত ফসকে। কলকে উলটে ছাই পড়ল গড়িয়ে। আগুনের ফুলকি উঠল চিড়বিড়িয়ে। বগ বগ করে একটু জলও হুঁকোর খোলের ফুটো থেকে গড়িয়ে পড়ল।

কালু চ্যাঁচামেচি করে গাছ চক্কর দিচ্ছে। এমন সময় মেজোকাকা বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। এসেই কালুকে ধমক দিয়ে বললেন, 'শাট আপ! শাট আপ!'

কালু থামবার পাত্র নয়। সে মেজোকাকুর কাছে এসে হাঁটুর কাছে মুখ তুলে কেঁউমেঁউ করে কী বলল। তারপর আবার দৌড়ে গেল গাছতলায়।

এবার মেজোকাকা সন্দেহাকুল চোখে গাছটা দেখতে দেখতে বললেন, 'গাছে হনুমান আছে নাকি রে বিলু?'

বললুম, 'না মেজোকাকু। কালু একটা কাঠবেড়ালি দেখেছে।'

হঠাৎ গাছতলায় উলটে পড়ে থাকা হুঁকোটার দিকে চোখ গেল মেজোকাকার। হুঁকোটা তুলে নিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কার হুঁকো রে বিলু?'

'আমি তো জানিনে মেজোকাকু।'

মেজোকাকা ধমক দিয়ে বললেন, 'জান না? এখনও কলকেয় আগুন রয়েছে। কে হুঁকো খাচ্ছিল বল হতভাগা? আলবাত জানিস?'... বলে হুঁকোটা তুলে ভুড়ুক ভুড়ুক করে কয়েকটা টান মেরে মেজোকাকা ফুরফুর করে ধোঁয়া উড়িয়ে দিলেন। 'বাঃ, এ তো ভারি সুগন্ধি তামাক!'

'ও মেজোকাকু! ছ্যা ছ্যা! তুমি হুঁকো খাচ্ছ? বলে দেব বাবাকে?'

মেজোকাকা চোখ টিপে বললেন, 'চুপ। লেবেনচুষ দেব।' তারপর মনের আনন্দে হুঁকো খেতে থাকলেন। ততক্ষণে কালু মেজোকাকার কাছে ফিরে এসে মুখ তুলে যেন তামাকের গন্ধ শুঁকছে। কালুর মুখটা বেজায় গম্ভীর। চোখে সন্দেহের চাউনি।

তারপর কালু আমার কাছে এসে বেজায় ধমক দিল বার তিনেক। আমি অবিকল মেজোকাকার গলায় বললুম, 'শাট আপ কালু! শাট আপ!'

কালু যেন কুকুরের ভাষায় পালটা ধমক দিয়ে বলল, 'চালাকি কোরো না বিলু। সব বুঝতে পেরেছি আমি।' তারপর সে কিছুক্ষণ ঘুরঘুর করে লেজ তুলে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

মেজোকাকা তারিয়ে তারিয়ে হুঁকো খাওয়ার পর চাপাস্বরে বললেন, 'এই বিলু, আরও দুটো লেবেনচুষ দেব। বল না, কার হুঁকো এটা?'

বলব, না, বলব না ভাবছি-হঠাৎ বিদঘুটে ব্যাপার ঘটে গেল। ততক্ষণে শীতের বেলা ফুরিয়ে এসেছে। বাগানে আর একটুও দিনের আলো নেই। আবছায়া ঘনিয়েছে। গাছগুলো গায়ে কুয়াশার চাদর টেনে নিয়েছে। সেই ধূসর কুয়াশা আর আবছা অন্ধকারে বকুল গাছটা থেকে একটা মস্ত লম্বা কালো হাত বেরিয়ে খপ করে মেজোকাকার হাত থেকে হুঁকোটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

অমনি মেজোকাকা আঁতকে উঠে গোঁ গোঁ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

আর আমিও এতদিন পরে এতক্ষণে ঝটপট বুঝে নিয়েছি, বকুল গাছের বন্ধুটি খুব সহজ লোক নয়। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছি সঙ্গেসঙ্গে।

আমার চ্যাঁচামেচিতে বাবা বেরিয়ে এলেন। মা এলেন। আর সব কাকারা এলেন। সে এক হুলুস্থুলস ব্যাপার। আলো আন! জল আন! পাখা আন!

পরদিন সকালে বুধু ওঝাকে ডেকে আনা হল। সে নাকি ভূতপ্রেতের যম। লোকে বলে বুধু ওস্তাদ। সে মেজোকাকাকে খুব ঝাড়ফুঁক করে বলল, 'বলুন, নেই!'

মেজোকাকা মিনমিনে স্বরে বললেন, 'নেই।'

তারপর বুধু গাছটার চারপাশে ঘুরে দেখে-শুনে বাবাকে বলল, 'বড়োবাবু! এই গাছটা আজই কেটে ফেলুন। এ-গাছে ব্রহ্মদত্যি আছে।'

বাবা ভয় পেয়ে বললেন, 'বল কী হে ওস্তাদ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ বড়োবাবু।'... বলে বুধু আমার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে ফের বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, খোকাবাবুর দিকেও নজর পড়েছে ওনার। কেমন যেন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে! হুঁ-খোকাবাবুর চোখে ব্রহ্মদত্যিমশাইকে দেখতে পাচ্ছি। ওই তো হুঁকো টানছে গুড়ুক গুড়ুক করে!'

মা সভয়ে আমাকে টেনে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। খোকা কিছুদিন থেকে ভালো করে খাচ্ছে-টাচ্ছে না। খালি বকুলতলায় মন পড়ে থাকে। কী যেন ভাবে আর বিড়বিড় করে কথা বলে!'

আমি বললুম, 'ভ্যাট। আমার কিস্যু হয়নি।'

বুধু আমার বুকে তার কড়ে আঙুল ছুঁইয়ে বিড়বিড় করে কী মন্ত্র পড়ল। তারপর ঘুরে বকুল গাছটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ধমক দিল, 'যা, যা! ভাগ!...'

সেদিন দুপুরে দেখি, মকবুল কাঠুরেকে ডেকে আনা হয়েছে। সে কুড়ুল নিয়ে গাছটার কাছে যেতে আমি কান্নাকাটি জুড়ে দিলুম। মেজোকাকা আমাকে থাপ্পড় তুলে ধমক দিলেন, 'শাট আপ! শাট আপ!'

আমার চোখের সামনে নিষ্ঠুর মকবুল কাঠুরে গাছটার গোড়ায় কোপ মারতে শুরু করল। দুঃখে-রাগে আমি অস্থির। কিছুক্ষণের মধ্যেই অত সুন্দর বকুল গাছটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। মকবুল দাঁত বের করে হেসে বলল, 'এবারে শীতের রোদ্দুর অনেকটা

পাবেন বাবুমশাই! এখানে ফুলের গাছ লাগাবেন। দেখবেন, কেমন রাঙা রাঙা ফুল ফুটবে!'

টুকুন ও চুমকি

টুকুনের মন খারাপ। তার বড়ো শালিখ পাখিটা খাঁচা থেকে পালিয়ে গেছে। এক বছর ধরে তাকে কত আদরে পুষছিল টুকুন। নাম রেখেছিল চুমকি। রোজ স্কুল থেকে ফিরে টুকুন তার সঙ্গে গল্প করত। স্কুলে সেদিন যা যা হয়েছিল, সেই সব মজার মজার গল্প। চুমকি মন দিয়ে শুনত আর কিচির কিচির করে হেসে খুন হত। চুমকির ভাষা টুকুন দিব্যি বুঝতে পারত। তেমনি টুকুন যা বলত, তাও কি বুঝত না চুমকি? নইলে অত হাসি কীসের?

তবু চুমকি পালিয়ে গেল। পালিয়ে গেল ছোটোমামার দোষে। খাঁচার দরজা খুলে আদর করতে গেছেন, আর চুমকি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেছে। টুকুন রাগে-দুঃখে ছোটোমামাকে আঁচড়ে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। ছোটোমামার ওই এক কথা, 'ভারি তো একটা শালিখ। ময়না হলে কথা ছিল।'

রাতে টুকুন শুধু চুমকির স্বপ্ন দেখল। সকালে উঠে তাঁকে খুঁজতে বেরোল। যেখানে শালিখ পাখি দেখতে পায়, খুশিতে লাফিয়ে ওঠে। চিক্কুর ছেড়ে ডাকে, 'চুমকি-ই-ই!' চুমকি হলে তো সাড়া দিয়ে কাছে আসবে! ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে ডানা মেলে পালিয়ে যায়। টুকুনের আরও মন খারাপ হয়ে যায়।

টুকুনদের গাঁয়ে কত শালিখ! শুধু চুমকিই নেই। তাহলে কি কানুদের সেই রাক্ষুসের পাল্লায় পড়েছিল? বেড়ালটা টুকুনকে দেখতে পেয়েই কেটে পড়ছে কেন? টুকুন কানুদের বাড়ির পেছনে ওত পেতে বসে রইল। হাতে একটা ইটের টুকরো। বেড়ালটাকে উচিত সাজা দেবে।

কানুর বোন বিনু এসে বলল, 'ও কী রে টুকুন? কাকে মারবি তুই?'

টুকুন থতোমতো খেয়ে ঢিলটা ফেলে দিল। কাঁদো-কাঁদো মুখ করে বলল, 'বিনুদি, আমার চুমকিকে দেখেছ? চুমকি পালিয়ে গেছে কাল।'

বিনু বলল, 'চুমকি কে রে?'

ন্যাকামি দেখে গা জ্বলে যায় টুকুনের। সে রাগ চেপে বলল, 'আমার শালিখ পাখি বিনুদি। দেখনি তাকে?'

বিনু মুখটিপে হেসে বলল, 'তাই বল। একটু আগে নদীর ঘাটে ভারু পাটনির ছেলে নোটনের কাছে একটা শালিখ পাখি দেখলুম। গিয়ে খোঁজ নে তো!'

টুকুন দৌড়োল। নদীর ঘাটে নৌকোয় বসে ভারু মাঝি হুঁকো খাচ্ছে আর খক খক করে কাশছে। বলল, 'কী খোকাবাবু? ওপারে যাবে নাকি? এসো, পার করে দিই।'

টুকুন বলল, 'নোটন কোথায় মাঝি? তাকে খুঁজছি।'

ভারু বলল, 'নোটন? সে তো ওপারের বনে গোরু চরাতে গেল।'

টুকুন ব্যস্ত হয়ে বলল। 'মাঝি, আমাকে শিগগির পার করে দাও।' আসল কথাটা ফাঁস করল না। ভারু যদি পার না করে? ভারু তাকে পার করে দিল। ওপারে মেঠো পথের দু-ধারে সবুজ ধান খেত। এদিক-ওদিক বন-বাদাড়। টুকুন দেখল বনের ধারে একপাল গোরু চরছে। তাহলে ওখানেই নোটন আছে। টুকুন আবার দৌড়োল।

কিন্তু কোথায় নোটন? একটা গাছের তলায় একদল রাখাল ছেলে খেলা করছে। তারা বলল, নোটনকে তারা দলে নেয় না। নোটন খুব একানড়ে ছেলে। সে তাই একলা গোরু চরায়। ওই তো তার বাঁশির সুর শোনা যাচ্ছে।

বাঁশির সুর যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে গভীর বন। টুকুনের এবার একটু ভয় করছিল। তবু সে মরিয়া হয়ে ছুটে চলল। শরৎকালের আকাশ জুড়ে টুকরো টুকরো মেঘ ভাসছে। কাশ বনে সাদা ফুলের মেলা বসেছে। এই রোদ, এই ছায়া। ফুরফুরে বাতাস বইছে। সবুজ ঘাসের পাতায় রং-বেরঙের ঘাসফড়িং কিরকির করে গান গাইছে। নালার ধারে এক পায়ে বসে থাকা বকটা টুকুনের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকাল। যেন বলল, 'কে হে তুমি, এখন ঝামেলা করতে এলে?'

নালা পেরোবে কেমন করে? টুকুন নালার ধার দিয়ে দৌড়ে ঝিলের সামনে পড়ল। থমকে দাঁড়াল। এই কি সেই ডাইনির ঝিল-যেখানে পদ্মপাতায় বসে রোদ্দুরে চুল শুকোয় এক আদ্যিকালের বুড়ি ডাইনি? তার নীল চোখ নাকি জ্বলজ্বল করে। ছেলেপুলে দেখলেই সে চোখ দিয়ে রক্ত চুষে খায়। টুকুনের বুক ঢিপ ঢিপ করল। সে ভয়ের চোখে তাকিয়ে রইল ঝিলের দিকে।

কিন্তু ডাইনিটা নেই। ঝিলের জলে কত পাখি। মনের সুখে সাঁতার কাটছে। মাঝে মাঝে ডানা শনশন করে ঝাঁক বেঁধে ওড়াওড়ি করছে। টুকুন ভাবল, এই কি তাহলে পাখিদের দেশ?

হঠাৎ কে ভারী গলায় বলে উঠল, 'কে ওখানে?'

চমক খেয়ে টুকুন ঘুরে দেখল, ঝাঁকড়া আর বেঁটে একটা গাছের তলায় এক বুড়োমানুষ বসে আছে। টুকুনও ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি টুকুন। নোটনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সে আমার চুমকিকে ধরেছে। নোটন কোথায় বলতে পার?'

বুড়ো হাসতে লাগল। তারপর বলল, 'নোটন? ওই শোনো সে বাঁশি বাজাচ্ছে। কিন্তু চুমকি কী খোকাবাবু?'

'চুমকি আমার শালিখ পাখির নাম।' বলে টুকুন আবার পা বাড়াল।

বুড়ো বলল, 'হুঁ, নোটনের কাছে একটা শালিখ পাখি দেখেছি বটে!'

বাঁশির সুর গভীর বনের ভেতরে। টুকুন যত যায়, তত মনে হয় বাঁশির সুর দূরে সরে যাচ্ছে। বনের ভেতর ঘন ছায়া। পাখপাখালি ডাকছে। ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। নোটনের

বাঁশির সুর সমানে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় নোটন? হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেল টুকুন। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল। সে ধুপ করে বসে পড়ল।

কতক্ষণ পরে তার কানে এল কেউ তার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। টুকুন উঠে দাঁড়াল। তারপর দেখল, ছোটোমামা আর সেই বুড়ো মানুষটা হন্তদন্ত হয়ে এদিকেই আসছেন। টুকুন গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ছোটোমামা বললেন, 'তোকে খুঁজে খুঁজে সারা। বাড়ি আয় হতভাগা ছেলে!'

টুকুন গোঁ ধরে বলল, 'নোটনের কাছে আমার চুমকি আছে যে!'

ছোটোমামা হাসলেন। 'না, না। তোর চুমকি ফিরে এসেছে দেখবি আয়!'

টুকুন লাফিয়ে উঠল। বুড়ো বলল, 'হুঁ, পোষা পাখি। যাবে কোথায়? বনের পাখি তো আর তাকে দলে নেবে না। তবে নোটনের একটা শালিখ পাখি আছে। ওই শোনো, নোটন কেমন বাঁশি বাজাচ্ছে।'

যেতে যেতে ছোটোমামা গান শুনে বললেন, 'বেশ বাজায় তো ছেলেটা। কোথায় বসে বাজাচ্ছে?'

বুড়ো বলল, 'সেটাই বলা কঠিন। নোটন তো এক জায়গায় থাকে না।'

বাড়ি ফিরে টুকুন দেখল চুমকি খাঁচার ভেতর মনমরা হয়ে বসে আছে। তাকে দেখে কিচিরমিচির করে বলল, 'তোমার মন খারাপ হবে বলে ফিরে এলুম, টুকুন! নইলে আকাশে উড়ে বেড়ানোর যা মজা!'

টুকুন বলল, 'না চুমকি। তোকে আর সব সময় খাঁচায় ভরে রাখব না। নোটনের মতো তোকে সঙ্গে করে রোজ নদীর ওপারে নিয়ে যাব। সেখানে কত পাখি জানিস তো?'

তারপর সে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'ও মা! আমি একটা বাঁশের বাঁশি কিনব যে! পয়সা দাও!'

নদীর ওপারে ঝিলের ধারে গভীর বন। টুকুনের ইচ্ছে করছে, সেই বনে গিয়ে রাখাল ছেলের মতো বাঁশি বাজাবে। আর তার কাঁধে বসে থাকবে চুমকি! কী মজাই না হবে! ছোটোমামা খুঁজতে গেলে তাকে খুঁজেই পাবেন না, অথচ তার বাঁশির সুর শুনতে পাবেন। সে এক দারুণ লুকোচুরি খেলা!

দুঃস্বপ্নের দ্বীপ

১

আমার কুকুর জিমকে নিয়ে জ্বালায় পড়েছি দেখছি। এমন নয় যে তাকে কখনো বনজঙ্গল, পাহাড়পর্বতে আনিনি। এই তো মাস তিনেক আগে তাকে নিয়ে কাশ্মীরের বরফ-ঢাকা পাহাড়ি মুল্লুকে ঘুরেছি। কিন্তু জিমের এমন পালাই পালাই ভাবভঙ্গি তো কখনো দেখিনি।

প্রথমে ভেবেছিলুম, একেবারে বিদেশবিভুঁই জায়গায় এসে ওর বুঝি অসুখবিসুখ করেছে। আমাদের সঙ্গে আছেন ভাগ্যক্রমে প্রাণীবিজ্ঞানী ডক্টর মুরলীধর প্রসাদ। নৈনিতালের লোক। তিনি জিমকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে বলেছেন, 'জিম ইজ অলরাইট। ওর কিস্যু হয়নি। তবে কী জানেন জয়ন্তবাবু? মানুষের যেমন, তেমনি সব প্রাণীরই ওই একটা ব্যাপার আছে। সব জায়গায় মন টেকে না।'

ভেবে পাইনি, এমন সুন্দর জায়গায় মন না টেকার কারণ কী থাকতে পারে। চারিদিকে নীল সাগরে ঘেরা এই দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। ক্যাম্পের সামনে সবুজ ঘাসে-ঢাকা একটা সমতল মাঠ। সেখানে নির্ভয়ে হরিণের পাল চরে বেড়ায়। কখনো লুকোচুরি খেলতে আসে সাদা রঙের দু-একটা খরগোশ। পাখিও কম নেই. ঝাঁক বেঁধে মাঠে নেমে তারা পোকামাকড় খুঁজে যায়। কিন্তু আশ্চর্য, জিমকে ছেড়ে দিয়ে দেখেছি, সে অভ্যাসমতো পশুপাখিদের মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে বা তাড়া করে মজা লুটতে ছোটে না।

এমনকী, তার প্রায় নাকের ডগায় কোনো পাখি বা খরগোশ বেয়াদপি করে গেলেও জিম মুখেও ধমকায় না। খালি মুখ তুলে বোবার মতো তাকিয়ে থাকে। তার শরীর কেমন যেন থরথর করে কাঁপে।

সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে তার আচরণ, সন্ধ্যার দিকে। ক্যাম্পের সামনে খোলামেলায় আগুন জ্বেলে আমরা যখন বসে গল্পসল্প করি, জিম আমার কোলে বসে মুখের ভেতরে কী একটা অস্পষ্ট শব্দ করে। মাঝে মাঝে যেন সে ভীষণ চমকে ওঠে।

সারারাত যতবার ঘুম ভাঙে, শুনতে পাই জিমের ওই বোবার মতো চাপা অদ্ভুত আওয়াজ। রাতের দিকে বেশ ঠান্ডা বলে তার গায়ে এক টুকরো কম্বল জড়ানো থাকে। দেখেছি, জিম কম্বলের ভেতর মুখটাও ঢুকিয়ে তালগোল পাকানো শরীরে পুঁটুলির মতো গুটিয়ে রয়েছে। ভয়েই কি? কীসের ভয়? এখানে ভয় পাবার মতো কিছু দেখছি না তো।

আজ তিন দিন হল আমরা এই দ্বীপে এসেছি। আমরা মানে, ওই ড. মুরলীধর প্রসাদ, আমি এবং আমাদের প্রখ্যাত 'বুড়ো ঘুঘু' কর্নেল নীলাদ্রি সরকার মহোদয়। আর এক জন সঙ্গীও অবশ্য আছে। সে কর্নেলের 'পুরাতন ভৃত্য' শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ। তাকে না আনলে এ অখদ্যে দ্বীপে না খেয়ে মরতে হত। খুব চালাকচতুর এবং এই প্রৌঢ় বয়সেও তার গায়ের জোরের পরিচয় অনেকবার পেয়েছি।

আজও কর্নেল ভোর বেলা ড. প্রসাদকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। সামনের মাঠের পারে উঁচু পাঁচিলের মতো বিশাল পাহাড় দ্বীপের একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত চলে গেছে। দ্বীপটাকে নাকি দু-ভাগে ভাগ করেছে পাহাড়টা। কর্নেলরা যান ওই পাহাড়ে।

এ দ্বীপের নাম ভেগা আইল্যান্ড। আর ওই পাহাড়টার নাম ওয়াকিমো মাউন্টেন। ওয়াকিমো কথাটার মানে নাকি বদরাগী। পাহাড়টার এমন বিশ্রী নাম কেন? শুনেছি এ সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে আসে, তাদের বিশ্বাস, ওখানে একটা বেজায় বদরাগী দানো বাস করে। তাই মাছধরা জাহাজ এ দ্বীপের ছায়া মাড়ায় না।

কর্নেল কি দানোটাকে জব্দ করতে এসেছেন তাহলে? মোটেও না। কর্নেল যা বলছেন, শুনে তাক লেগে যায়। ওয়াকিমো পাহাড়ে একধরনের বিচিত্র প্রাণীর বাস। প্রাণীটা নেকড়ে এবং কুকুরের মাঝামাঝি। পনেরো হাজার বছর আগে গুহাবাসী আদিম মানুষেরা জন্তু শিকার করে এনে গুহার ভেতর বসে মহানন্দে খেত। আর হাড়গোড় ফেলে দিত বাইরে। নেকড়েরা এইসব হাড়গোড়ের লোভে গুহার কাছে জড়ো হত। কালক্রমে এই উচ্ছিষ্ট খাদ্য খেতে খেতে তারা শিকার করাই ভুলে গেল। মানুষ-ঘেঁষা হয়ে পড়ল। তারপর মানুষ তাদের বশ করে ফেলল। তারাই গৃহপালিত কুকুরের পূর্বপুরুষ।

কিন্তু মানুষের ভেতর যেমন, তেমনি জন্তুদের ভেতরেও কিছু বেয়াড়া জীব থাকে। তেমন কিছু বেয়াড়া নেকড়ে মানুষের পোষ মানল না, অথচ শিকারের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। তারা কী করল তখন? অগত্যা পেটের জ্বালায় বাঁদর-হনুমানদের মতো উদ্ভিদভোজী-যাকে ইংরেজিতে বলে ভেজিটেরিয়ান হয়ে গেল। গাছের পাতা, ফল-মূল-এসব খেয়েই বেঁচে রইল।

প্রাণীবিজ্ঞানীদের ধারণা, এইসব জাত-খোয়ানো নেকড়ের বংশধর এখনও কোথাও টিকে থাকতে পারে। কর্নেল কোনো সূত্রে খবর পেয়েছেন, ভেগা দ্বীপের পাহাড়ে নাকি সেই আজব নেকড়ে-কুকুর এখনও আছে। তাই প্রাণীবিজ্ঞানী ড. প্রসাদকে নিয়ে এখানে হাজির হয়েছেন।

আর আমি তো কর্নেল বুড়োর ছায়াসঙ্গী। যাকে বলে ন্যাওটা। তাই আমাকেও আসতে হয়েছে। পোর্টব্লেয়ার থেকে হেলিকপ্টারে আসতে ঘণ্টা পাঁচেক লেগেছে। কিন্তু একটুও ক্লান্তি বা বিরক্তি জাগেনি। জিমকে সঙ্গে আনার কারণ, সেই আজব নেকড়ে-কুকুর বা কর্নেলের ভাষায় 'নেকুর' যদি একটা পাকড়াও করতে পারেন, পোষা কুকুরের সামনে তার আচরণ কেমনধারা হবে, পরীক্ষা করে দেখবেন। তা ছাড়া জিমের জন্য একটা জরুরি কাজও আছে। জিমকে দেখিয়ে নেকুরদের ফাঁদে ফেলার মতলব ছিল কর্নেলের। পোষা

ঘুঘু পাখির সাহায্যে ব্যাধ যেভাবে বুনো ঘুঘু পাখি ডেকে এনে ফাঁদে ফেলে, ঠিক সেইভাবে।

কিন্তু দ্বীপে এসে জিমের হাবভাব দেখে কর্নেল আপাতত সে মতলব কাজে লাগাচ্ছেন না। লাগাতে চাইলে আমিও আপত্তি করতুম।

আজ তিন দিনের দিন একটা সন্দেহ জেগেছে। জিম কি তাহলে নেকুরের ভয়ে এমন অস্থির?

কর্নেলের কাছে কথাটা তুলতে হবে। তবে জিম শক্তিমান অ্যালসেশিয়ান। তার গায়ের রং কুচকুচে কালো। দশাসই গতর। একবার একজন খুনে গুন্ডাকে প্রায় মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। জিমের মতো সাহসী দুর্দান্ত কুকুর শাকপাতাখেকো নেকুরকে ভয় পাবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু কিছু বলাও যায় না। গরিলাও তো মাংসাশী প্রাণী নয়। অথচ গরিলাকে সিংহও ভয় পায়।

২

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সকালে ক্যাম্পের সামনে চেয়ার পেতে বসে কফি খাচ্ছি। ষষ্ঠীচরণ তার কিচেন-তাঁবুর সামনে খোলামেলায় পিকনিকের উনুনের মতো উনুন বানাতে ব্যস্ত হয়েছে, কারণ কেরোসিন তত বেশি সঙ্গে আনা হয়নি এবং কতদিন থাকতে হবে, তার ঠিক নেই। জিম আমার চেয়ারের পায়া ঘেঁষে বসে আছে-মুখটা বেজায় বিষণ্ণ। হঠাৎ ষষ্ঠীচরণ কাজ ফেলে আমার কাছে এসে কাঁচুমাচু মুখে একটু হেসে বলল, 'ছোটো সায়েব যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি।'

বললুম, 'অত বিনয়ের অবতার তো তোমায় কোনোদিন দেখিনি ষষ্ঠী। ব্যাপারটা কী?'

ষষ্ঠীচরণের হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। সে গম্ভীর হয়ে চাপা গলায় বলল, 'আজ্ঞে, আমার বড্ড গা বাজছে।'

অবাক হয়ে বললুম, 'সে কী হে ষষ্ঠী! তুমি অমন ডানপিটে সাহসী মানুষ। তোমার গা বাজছে মানে?'

ষষ্ঠীচরণ আরও গলা চেপে বলল, 'এ দ্বীপটায় অমানুষ থাকে আজ্ঞে।'

'অমানুষ মানে?' হাসতে হাসতে বললুম, 'ও ষষ্ঠী! তুমি কি ভূতের ভয় পেয়েছ?'

ষষ্ঠীচরণ এবার বসল। চারিদিকটা দেখে নিয়ে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এই মাত্তর আমার ওপর টুপ টুপ করে ঢিল পড়ছিল। আপনার দিব্যি ছোটো সায়েব। মিথ্যে কথা আমায় কখনো বলতে শুনেছেন?'

মার্চ মাসের উজ্জ্বল সকাল বেলা। আকাশে মেঘের কুটোটি নেই। তাঁবুর পেছনে অবশ্য একটু তফাতে ঝোপঝাড় আর গাছপালা আছে। কিন্তু সামনেটা ফাঁকা। সবুজ ঘাসের মাঠ ওয়াকিমো পাহাড় পর্যন্ত ছড়ানো, এই ফাঁকা জায়গায় দিনদুপুরে ষষ্ঠীকে ভূতেরা ঢিল ছুড়ে নাকাল করেছে, ভাবতেই হাসি পায়। আমি হো-হো করে হেসে বললুম, 'কই, চলো তো দেখি-ভূতের কেমন সাহস।'

ষষ্ঠীচরণ বলল, 'বন্দুকটাও সঙ্গে নিন স্যার।'

পা বাড়িয়ে বললুম, 'ভূতের গায়ে বন্দুকের গুলি বেঁধে না। কই, চলো দেখি। আয় জিমি!'

জিম যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার সঙ্গে এগোল। মাত্র তিরিশ হাত তফাতে ষষ্ঠীচরণের কিচেন-তাঁবু। ঠিক মাঝামাঝি পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার গায়ে টুপ টুপ করে কী পড়ল কয়েক বার। ঠাহর করে দেখি, সেগুলো খুদে মার্বেলের মতো গড়নের গোল ঢিল। চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে কাউকেও দেখতে পেলুম না। দৌড়ে ওই তাঁবুর পিছনে ঢুকলুম। কেউ কোথাও নেই। ওদিকটা প্রায় পঁচিশ গজ অবধি ফাঁকা। তারপর জঙ্গল। জঙ্গল থেকে ঢিল ছুড়ছে কি? তারা কারা?

জিম আমার পেছন পেছন এসে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে তাকে ইশারা করলুম। কিন্তু জিম কথা মানল না। শুধু লেজটা গুটিয়ে কেমন চাপা শব্দ করতে লাগল।

ষষ্ঠীচরণ এগিয়ে এসে বলল, 'ঢিলটা পরখ করে দেখুন তো স্যার! এ তো ঢিল বলে মনে হচ্ছে না।'

হাতের তালুতে রেখে দেখলুম, খুব হালকা ধূসর রঙের গুটি। গুটিটা শুকনো ঘাস দিয়ে তৈরি। সাধুবাবারা গাঁজা খাওয়ার জন্য নারকেল ছোবড়ার যেমন খুদে গুলতি বানায়, ঠিক তেমনি। কিন্তু ওগুলো আরও ছোটো। ওজনে হালকা হলেও দৈবাৎ চোখে লাগলে বিপদ হতে পারে।

ততক্ষণে ষষ্ঠীচরণ আরও কয়েকটা ভূতের ঢিল খুঁজে পেয়েছে। সেগুলো সে একটা কাগজের মোড়কে রেখে বলল, 'বড়ো সায়েবকে দেখাতে হবে। কী বলেন স্যার?'

ভূতপ্রেতে আমার বিশ্বাস নেই। নিশ্চয় এভাবে ভূতুড়ে ঢিল ছুড়ে কারা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে কোনো উদ্দেশ্যে। ব্যাপারটা দেখতে হয়।

দৌড়ে আমার তাঁবু থেকে রাইফেল নিয়ে বেরোলুম। জিম অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে অনুসরণ করল। ষষ্ঠীচরণ ব্যাপার দেখে আরও ভয় পেয়ে বলল, 'ওরে বাবা! আমার কী হবে?'

'কিচ্ছু হবে না। ভূতেরা ঢিল ছুড়লে তুমিও ঢিল ছুড়বে।' বলে যেদিক থেকে ঢিলগুলো এসেছিল সেইদিকে এগিয়ে গেলুম।

কিন্তু আর ঢিল ছুড়ল না কেউ। ঝোপজঙ্গল দুর্ভেদ্য বললেই হয়। ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই। চোখে পড়ল, বড়ো বড়ো পাথরও রয়েছে জঙ্গল জুড়ে। একখানে প্রকাণ্ড একটা পাথর জঙ্গলের বাইরে অবধি ছড়িয়ে রয়েছে দেখে সেখানে গেলুম। প্রথমে জিমকে তুলে দিলুম পাথরটার ওপর। তারপর আমি উঠলুম।

জঙ্গলের মাটিটা ক্রমশ ওদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে বোঝা যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির সৃষ্টি হল। ওই ঘন সবুজ জঙ্গলের ভেতর থেকে কে বা কারা যেন আমাকে দেখছে। তাদের দেখতে পাচ্ছি না, অথচ তারা আমাকে দেখছে-অস্বস্তিটার কারণ এই।

কিন্তু ভালো করে খুঁটিয়ে দেখেও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ছিল না।

তবু হলফ করে বলতে পারি। একদল অদৃশ্য আজব প্রাণী যেন আড়াল থেকে আমার ওপর লক্ষ রেখেছে। কিছুতেই এ অনুভূতি মন থেকে তাড়াতে পারলুম না।

তারপর জিম একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। আমাকে ফেলে রেখে লাফ দিয়ে পাথর থেকে নামল। তারপর লেজ গুটিয়ে গলার ভেতর অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে খোলা ঘাসজমির ওপর দিয়ে তাঁবুর দিকে দৌড়োল। আমি রেগে-মেগে চিৎকার করে ডাকলুম, 'জিম! জিম! কী হচ্ছে! এই জিম!'

জিম কথা কানে করল না। কিচেন-তাঁবুর পাশে ষষ্ঠীচরণ দাঁড়িয়ে আছে দেখলুম। তার হাতে একটা বল্লম কিংবা লাঠি। এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। জিম সটান গিয়ে আমার তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

পেছনে ঘুরছিলুম জিমের জন্যে। এবার জঙ্গলের দিকে ঘুরে চমকে উঠলুম।

আন্দাজ গজ বিশেক দূরে নীচে এমনি একটা পাথরের পাশে তিনটে বিদঘুটে প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ওপর রোদ্দুর পড়েছে বলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

তারা মানুষের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের রং কালো কুচকুচে। গলা কাঠির মতো। মাথা তেকোনা এবং প্রকাণ্ড। নীচের ধড়টা ঝোপের ভেতর বলে বোঝা যাচ্ছে না কেমন। সবচেয়ে অদ্ভুত ওদের চোখ। তেকোনা মাথায় দুটো গোল রঙিন কাচের মতো মস্ত চোখের রং লাল, কখনো নীল, কখনো হলুদ হয়ে উঠছে।

আমার মাথায় পলকে ভেসে এল, ওরা যেন অতিকায় পিঁপড়ে। কিন্তু পিঁপড়েরা কি অমন খাড়া দাঁড়াতে পারে মানুষের মতো?

ভয় হল, ওরা আমাকে আক্রমণ করবে না তো? তাই রাইফেল তাক করলুম।

অমনি প্রাণীগুলো গা ঢাকা দিল পাথরের আড়ালে। বুঝলুম, জিম কেন ভয় পেয়েছে। এও বুঝলুম ঘাসের গুলতিগুলো কারা ছুড়েছিল।

৩

বেলা দুটোয় কর্নেল এবং ড. প্রসাদ ঘেমে-তেতে ফিরলেন। নেকুরের লেজের ডগাটুকুও দেখতে পাননি। তবে ওয়াকিমো পাহাড়ের অনেকটা চিনে ফেলেছেন। পাহাড়টা যত দুর্গম দেখায়, তত কিছু নয়! সহজে ওঠা যায় এবং যতদূর খুশি ঘোরাঘুরি করা যায়।

ঘাসের গুলতি আর পিঁপড়ে মানুষের কথা শুনে প্রাণীবিজ্ঞানী ড. প্রসাদ তো ভীষণ উত্তেজিত। কর্নেল বললেন, 'বোঝা গেল, কেন ভেগা দ্বীপ ভূতুড়ে দ্বীপ বলে বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত হয়েছে। ক-বছর আগে এক জাহাজের ক্যাপ্টেন আমাকে এখানকার পিঁপড়ে-মানুষের কথা বলেছিলেন। বিশ্বাস করিনি। এখন দেখা যাচ্ছে কথাটা সত্যি।'

ড. প্রসাদ বললেন, 'কর্নেল! নেকুর থাক। বরং আমরা পিঁপড়ে-মানুষের দিকে মন দিই।'

আমি বললুম, 'একটা কথা বুঝতে পারছি না। এই ঘাসের গুলতির রহস্যটা কী?'

কর্নেল বললেন, 'এগুলো পিঁপড়ে-মানুষদের অস্ত্র। পোকামাকড় ওদের খাদ্য। এই গুলতি ছুড়ে ওরা পোকামাকড়কে কাবু করে। বুঝলে?'

হাসতে হাসতে বললুম, 'ব্যাটারা আমাদেরও গুলতি ছুড়ে কাবু করবে ভেবেছে। একটা মানুষের মাংসে ওদের বছর চলে যাবে কিনা।'

ষষ্ঠীচরণ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে কথা শুনছিল। আতঙ্কে সে বলে উঠল, ‘ওরে বাবা!’

কর্নেল সকৌতুকে বললেন, ‘ষষ্ঠী! তোমার গা-গতর দেখে ওদের বেজায় লোভ হয়েছে মনে হচ্ছে। নইলে প্রথম তোমার ওপর গুলতি ছুড়ল কেন ওরা।’

ষষ্ঠীচরণ আরও ভয় পেয়ে করুণ স্বরে বলল, ‘ওরে বাবা।’

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল আর ড. প্রসাদ একটা ফাঁদ নিয়ে বেরোলেন। যেখানে আমি পিঁপড়ে-মানুষদের দেখেছি, সেখানে কোথাও ফাঁদটা পেতে রাখবেন। সঙ্গে ষষ্ঠীচরণকেও নিয়ে গেলেন। সে দা দিয়ে কুপিয়ে জঙ্গল সাফ করে চলার রাস্তা বানাবে। যা দুর্গম জঙ্গল!

আমি রইলুম তাঁবুর পাহারায়। জিম সেই যে তাঁবুর খাটের তলায় ঢুকেছে, আর বেরোবার নাম করে না। তার ওপর রাগ হচ্ছিল। খুব বকাবকি করলুম তাকে ভীতু বলে। শাসালুম, কলকাতায় ফিরে বেচে দেব ব্যাটাচ্ছেলেকে। জিম গ্রাহ্য করল না। শুধু গলার ভেতর সেই চাপা কান্নার মতো আওয়াজ করল।

বিকেল নেমেছে। গুলিভরা রাইফেল কাঁধে রেখে সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে লক্ষ রেখে সান্ত্রির মতো পায়চারি করছিলুম।

দূরে একপাল হরিণ চরছিল। মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক পাখি উড়ে যাচ্ছিল। একসময় উত্তর দিকে জঙ্গলের মাথার ওপর একটা প্রকাণ্ড বেলুন দেখতে পেলুম। হলুদ রঙের বেলুনটা নিঃশব্দে ওদিকে কোথাও আস্তে আস্তে নামছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। বেলুনটা গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হলে ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। এই নির্জন আজব দ্বীপে বেলুন নামাটা বড়ো রহস্যময়।

তাঁবুর দরজায় পর্দা শক্ত করে বেঁধে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপারটা দেখতে। যেদিকে পিঁপড়ে-মানুষ দেখেছিলুম, এটা তার উলটো দিকে। ওদিক দিয়েই আমরা এ দ্বীপে ঢুকেছি। আমাদের হেলিকপ্টার ওদিকে সমুদ্রতীরে বালির বিচে নেমেছিল। যখন আমাদের দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার সময় হবে, তাঁবুর ভেতর রাখা বেতার যন্ত্রে খবর পাঠাবেন কর্নেল। তাহলে ওঁর বন্ধু এক সামরিক অফিসার হেলিকপ্টারটা নিয়ে আসবেন দ্বীপে।

জিমকে নাড়ানো যাবে না। তা না হলে ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতুম।

জঙ্গলের ভেতর দৌড়ে চললুম। একটু পরেই জঙ্গলের ওধারে ঢালু পাহাড়ি জমি নীচে সমুদ্রের বিচে গিয়ে মিশেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখি, বেলুনটা চুপসে বালির ওপর পড়ে রয়েছে। বেলুনের তলায় দড়িদড়া থেকে ঝুলন্ত প্রকাণ্ড বাস্কেটের মতো আসন। একটা বেঁটে গাবদা মোটা লোক সবে বেরোচ্ছে। তার চেহারা চীনাদের মতো। কোমরে বাঁধা একটা লম্বাটে রিভলবার। লোকটাকে দেখে পছন্দ হল না। কেমন খুনে মার্কা চেহারা।

বেলুন সেইভাবেই পড়ে রইল। লোকটা এদিকে ঘুরে ঢালু জমিটা বেয়ে উঠতে থাকল। তখন আমি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম।

সে জঙ্গলে ঢুকে পশ্চিমে এগোল। তাকে অনুসরণ করতে থাকলুম। ফাঁকা মাঠের দিকে না গিয়ে সে সমুদ্রের সমান্তরালে জঙ্গলের ভেতরে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে সে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা পাথরের ওপর উঠল। তারপর তিন বার হাততালি দিল।

জঙ্গলের ভেতর ছায়া ততক্ষণে আরও ঘন হয়েছে। তবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর ক্রিয়াকলাপ। মিনিট খানেক পরে যা দেখলুম, আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। এ কি স্বপ্ন, না

সত্যি সত্যি ঘটছে!

পাথরের ওপাশ থেকে এক দঙ্গল পিঁপড়ে-মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

লোকটা প্যান্টের পকেট থেকে মুঠো মুঠো কী সব জিনিস ছড়িয়ে দিল। আর পিঁপড়ে-মানুষগুলো কাড়াকাড়ি করে তা কুড়িয়ে খেতে থাকল। একটু পরে লোকটাকে দেখলুম ওদের সঙ্গে চলেছে। আমি আড়ালে আড়ালে কিছুটা এগিয়ে গেলুম। কিন্তু পাথরের কাছে এসে ওদের হারিয়ে ফেললুম। ওরা যেন বেমালুম উবে গেছে।

এদিক-ওদিক সাবধানে খোঁজাখুঁজি করেও ওদের পাত্তা পেলুম না। ততক্ষণে পশ্চিমে ওয়াকিমো পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে সূর্য। জঙ্গল থেকে দক্ষিণে এগিয়ে ফাঁকা মাঠটায় পৌঁছোলুম। তাঁবুর দিকে প্রায় দৌড়ে চললুম।

জিমের জন্যে ভাবনা হচ্ছিল।

আমার তাঁবুর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। দরজার পর্দা ছেঁড়া। শুধু ছেঁড়া নয়, কুটিকুটি করে কেটে কেউ বা কারা ছড়িয়ে রেখেছে।

ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকলুম, 'জিম! জিম!'

জিমের সাড়া নেই। ক্যাম্পখাটের তলা ফাঁকা। টর্চ জ্বেলে তাঁবুর ভেতরটা ভালো করে দেখে নিলুম। জিম নেই।

রাগে দুঃখে বাইরে বেরিয়েছি। কর্নেলদের সাড়া পাওয়া গেল। সন্ধ্যার আবছা আলোয় ওঁদের দেখা যাচ্ছিল। কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছেন তাঁবুর দিকে।

৪

কর্নেল তাঁর ধুরন্ধর গোয়েন্দাবুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, পিঁপড়ে-মানুষরাই জিমকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করতে হলে পিঁপড়ে-মানুষদের ডেরা খুঁজে বের করতে হবে। কর্নেলের ধারণা, জিমকে মেরে ফেলা ওদের উদ্দেশ্য নয়। অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। আপাতত সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

এ-রাতেও জ্যোৎস্না ছিল। আমরা চুপিচুপি একটা কাজ সেরে ফেললুম। সমুদ্রতীরের সেই বেলুনটা গুটিয়ে নিয়ে এলুম তাঁবুতে। তারপর পালাক্রমে রাইফেল হাতে পাহারা দিলুম। কিন্তু রাতে কোনো ঘটনা ঘটল না।

ভোর বেলা কর্নেল একা বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে জানালেন, ব্যাটাচ্ছেলেরা ফাঁদটাকে কুটিকুটি করে কেটেছে। তবে লুকিয়ে রাখা ক্যামেরায় ছবিগুলো উঠেছে। কর্নেলের ক্যামেরার কীর্তিকলাপ আমার জানা। অন্ধকারে ছবি তুলতে ওস্তাদ।

ছবিগুলো প্রিন্ট করে দেখালেন। পিঁপড়ে-মানুষরা ফাঁদ কীভাবে দাঁত দিয়ে কাটছে, তার পরিষ্কার ছবি উঠেছে!

ব্রেকফাস্ট সেরে আমি, কর্নেল ও ড. প্রসাদ বেরিয়ে পড়লুম উত্তর দিকের জঙ্গলে-যেখানে কাল সন্ধ্যায় বেলুনের লোকটাকে অদৃশ্য হতে দেখেছি।

সেই পাথরের কাছে গিয়ে দিনের আলোয় একটা ব্যাপার দেখতে পেলুম। পাথরের গায়ে সাদা আঁকিবুঁকি রয়েছে। পিঁপড়ে-মানুষদের ছবি আঁকার শখ? নাকি ওতে কিছু লেখা

রয়েছে? তাহলে স্বীকার করতে হয়, ওরা মানুষদের মতো লেখাপড়াও করে।

প্রাণীবিজ্ঞানী ড. প্রসাদ হেসে উড়িয়ে দিলেন। কর্নেল হাঁটু গেড়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে ও ঘাসে কিছু খুঁজছিলেন। ওই অবস্থায় বাঁ-দিকে এগিয়ে আরও একটা বড়ো পাথরের কাছে গিয়ে চাপা গলায় বলে উঠলেন, 'পেয়েছি! পেয়েছি!'

ড. প্রসাদ বললেন, 'কী পেয়েছেন কর্নেল?'

কর্নেল কোনো জবাব না দিয়ে পাথরটার ওপর উঠতে শুরু করলেন। তারপর দেখি, উনি হঠাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ কী দেখার পর ইশারায় আমাদের ডাকলেন। ড. প্রসাদ আর আমি পাথরে উঠে ওঁর মতো উপুড় হতেই এক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলুম।

পাথরের ওদিকে ঢালু হয়ে মাটিটা নেমে গেছে এবং একটা বিশাল গর্তের মতো সমতল জায়গায় অসংখ্য উইঢিবির মতো ঢিবি রয়েছে। ঢিবির দরজা আছে এবং জানলার মতো ফোকরও আছে কয়েকটা। ঢিবিঘরের ভেতর থেকে পিঁপড়ে-মানুষরা বেরোচ্ছে, আবার ঢুকছে। একখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে একদল পিঁপড়ে-মানুষ। মধ্যিখানে একটা বেদিমতো উঁচু জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা লাল পিঁপড়ে-মানুষ। ওর মাথায় ঘাসের মুকুট। মুকুটে রঙিন পালক গোঁজা এবং উজ্জ্বল মণির মতো কী জিনিস-তা থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার, বেদির নীচে ঘাসের মোটা দড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বেলুনের লোকটা।

আমরা দম আটকানো ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ওই আজব দৃশ্য দেখতে থাকলুম। তারপর কানে এল, পিঁপড়ে-মানুষেরা পোকামাকড়ের ডাকের মতো চাপা ক্ষীণ শব্দে কথাবার্তা বলছে। সে শব্দ এত চাপা যে মনে হচ্ছে, অনেক দূরে কোথাও হাজার হাজার পোকামাকড় ডাকছে।

তারপর যা দেখলুম, আমি লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম আর কি-কর্নেল টেনে ধরে ফের শুইয়ে দিলেন।

সামনেকার একটা ঢিবিঘর বেশ বড়ো-প্রায় ফুট ছয়েক উঁচু এবং ফুট তিনেক চওড়া। সেটার রং পাটকিলে। সেটা নিশ্চয় রাজার বাড়ি। সেখান থেকে চ্যাংদোলা করে পিঁপড়ে-রক্ষীরা আমার জিমকে বের করে আনছিল।

পেছনে আরেকটা লাল পিঁপড়ে-মানুষ। নিশ্চয় রানি। কিন্তু জিম যেন মড়া। টুকটুক করে তাকাচ্ছে। নির্জীব অবস্থা।

রানি বেদিতে উঠে রাজার পাশে দাঁড়াল। জিমকে পিঁপড়ে-রক্ষীরা তাদের পায়ের কাছে বেদির ওপর শুইয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য, জিম ছাড়া পেয়েও তেমনি নির্জীব হয়ে পড়ে রইল।

এবার রানিকে দেখলুম দু-হাত তুলে জোরে নাড়ছে। তারপর ঢিবি রাজবাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা অদ্ভুত প্রাণী। ধূসর রঙের হায়নার মতো দেখতে। কিন্তু অত কুৎসিত নয়। বরং নেকড়ে বলে মনে হল। পিঁপড়ে-রানির মাথাতেও মুকুট আছে। মুকুটে ফুল গোঁজা। রানি একটা ফুল মুকুট থেকে নিয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। প্রাণীটা বেদিতে উঠে খপ করে ফুলটা মুখে পুরল। চিবুতে থাকল। তারপর জিমের গা শুঁকতে শুরু করল।

ড. প্রসাদ উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করে বললেন, 'নেকুর! নেকুর!'

নেকুর তাহলে পিঁপড়ে-মানুষদের কাছে পোষ মেনেছে! অবাক হয়ে নেকুর দেখতে থাকলুম। জন্তুটা জিমকে যেন আদর করছে। জিম তেমনি নিঃসাড়।

জিমের চারপাশে ঘুরে নেকুরটা খেলা করতে থাকল। সবাই এবার ভিড় করে খেলা দেখছিল। ঢিবিঘরগুলো থেকে ছোটো-বড়ো সব পিঁপড়ে-মানুষ ভিড় জমিয়েছে ততক্ষণে। এই সময় কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, 'সাবধানে নেমে এসো তোমরা। ঢিবিঘরগুলোর পেছনে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। তারপর কী করতে হবে, বলে দেবখন।'

সাবধানে তিন জনে পাথরের টুকরো আর খাঁজের আড়ালে নীচে নেমে গেলুম। বুঝলুম, এই সমতল বিশাল গর্তমতো জায়গাটা কোনো যুগের আগ্নেয়গিরির ক্রেটার। ঢিবিঘরের পেছনে ঝোপের আড়ালে তিন জনে বসে পড়লুম।

তারপর দেখি, কখন ওদের অজান্তে বেলুনের লোকটা দড়ির বাঁধন খুলে ফেলেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাক করে বেমক্কা রিভলবার থেকে গুলি ছুড়ল দু-বার।

পলকের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল। পিঁপড়ে-মানুষরা পিলপিল করে এদিকে-ওদিকে ক্রেটারের কিনারায় ঢালু পাড় বেয়ে উঠল এবং পালিয়ে গেল। রাজা ও রানি যেন হতভম্ব। স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটা বেদির ওপর লাফ দিয়ে উঠল এবং রাজার মুকুট ধরে টানাটানি শুরু করল।

নেকুরটা জিমকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এবার আচমকা গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। রিভলবার ছিটকে পড়ল নীচে। নেকুরটা ওর গলা কামড়ে ধরেছে। লোকটা বিকট আর্তনাদ করে হাত-পা ছুড়ছে।

কর্নেল বলে উঠলেন, 'চলে এসো সবাই!'

আমরা যেই দৌড়ে গেছি, রাজা-রানি তিরের মতো ছুটল উলটো দিকে। বেদির কাছাকাছি পৌঁছোনোর সঙ্গেসঙ্গে নেকুরটাও দৌড়ে পালিয়ে গেল। কর্নেল বেলুনের লোকটার কাছে হাঁটু দুমড়ে বসলেন। ওর গলাটা ফাঁক হয়ে গেছে, গলগল করে রক্ত

বেরোচ্ছে। ওকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। এক মিনিটের মধ্যে হাত-পা খিঁচিয়ে ওর দেহটা শক্ত হয়ে গেল। সেই বীভৎস দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

জিম আমাকে দেখে এতক্ষণে ওঠার চেষ্টা করল। পারল না। ওকে দু-হাতে বুকের কাছে তুলে নিলুম। ওর শরীর থরথর করে কাঁপছিল।

কর্নেল লোকটার পকেট হাতড়ে একটা নোটবই পেলেন। চীনা ভাষায় কী সব লেখা আছে। নোটবইটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে কর্নেল বললেন, 'আসুন ড. প্রসাদ, আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি। বেচারি পিঁপড়ে-মানুষদের বিব্রত করে লাভ কী? ওদের কচি বাচ্চারা নিশ্চয় ঘরে আছে। ওরা না ফিরলে সেগুলো না খেয়ে মারা পড়বে।'

ঠিক তাই। ঢিবিঘরের দরজায় খুদে পিঁপড়ে-মানুষরা উঁকি দিচ্ছিল দেখে মায়া হয়। আমরা চলে গেলে মা-বাবা ফিরে এসে খেতে দেবে। এ বেলা হয়তো বেলুনের লোকটার মাংস দিয়েই পিঁপড়ে-পুরীতে বড়ো রকমের একটা ভোজ হবে।

৫

তাঁবুতে ফিরে দেখি আরেক কাণ্ড। ষষ্ঠীচরণ বন্দি। কিচেন-তাঁবুর ভেতর তার ক্যাম্পখাটে ওকে কারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। যা দিয়ে বেঁধেছে, তা শক্ত ঘাসের দড়ি। ও ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মুখে কথা নেই।

কর্নেল একটা ছুরি দিয়ে বাঁধন কেটে ওকে মুক্ত করলেন। তখন ষষ্ঠীচরণ উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল এবং জব্বর একটা হাই তুলল।

বললুম, 'ব্যাপার কী ষষ্ঠী?'

ষষ্ঠীচরণ বলল, 'খুব ঘুম পেয়েছিল স্যার!'

তার জবাব শুনে অবাক হয়ে বললুম, 'কিন্তু তোমায় অমন করে বেঁধেছিল কারা?'

এতক্ষণে ষষ্ঠীচরণের যেন খেয়াল হল। কাটা দড়িগুলো দেখে নিয়ে বলল, 'তাহলে আমাকে সত্যি সত্যি বেঁধেছিল ব্যাটাচ্ছেলেরা? আমি ভাবছি, স্বপ্ন দেখছিলুম। ওরে বাবা! এ কী বিদঘুটে জায়গায় এসে পড়েছি।'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি নিশ্চয় আরাম করে খাটে শুয়েছিলে?'

ষষ্ঠীচরণ জিভ কেটে বলল, 'অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। মাফ করে দিন। আপনারা যাওয়ার পর কেমন ঢুলুনি পেয়েছিল। ভাবলুম একটু শুয়ে নিই। রাত্তিরে তরাসে ঘুম হয় না কিনা!'

কর্নেল বললেন, 'ভাগ্যিস, তোমাকে পিঁপড়ে-মানুষরা ধরাধরি করে জিমের মতো বয়ে নিয়ে যায়নি! তাহলে আজ দুপুরের খাওয়াদাওয়া কারও জুটত না আমাদের।'

ষষ্ঠীচরণ ভয় পেয়ে বলল, 'ওরে বাবা!' তারপর সে ব্যস্তভাবে উনুন ধরাতে গেল।

আমরা কর্নেলের তাঁবুতে গেলুম। ড. প্রসাদ বললেন, 'লোকটার নোটবইয়ে নিশ্চয় সব কথা লেখা আছে। চীনা ভাষা জানলে ভালো হত। কিন্তু...'

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, 'আমি অল্পস্বল্প জানি চীনাভাষা। দেখি, কী লেখা আছে?'

কর্নেল মিনিট দশেক ধরে নোটবইটা নিয়ে মেতে রইলেন। আমরা দু-জনে চুপচাপ কৌতূহল নিয়ে বসে রইলুম। তারপর কর্নেল বললেন, 'লোকটার নাম সান-ওয়ান-সু। হংকং-এ বাড়ি। কীভাবে ভেগা দ্বীপের পিঁপড়ে-মানুষদের কথা জেনেছিল, লেখা নেই। তবে এটুকু লেখা আছে, মোট তিন বার এসেছে এর আগে। পিঁপড়ে-মানুষদের রাজার মুকুটে যে বহুমূল্য মণি দেখেছি আমরা, সান-ওয়ান-সু ওটা হাতাতে চেয়েছিল।'

ড. প্রসাদ বললেন, 'ওদের সঙ্গে ভাব করল কীভাবে, লেখা নেই?'

কর্নেল বললেন, 'আছে। প্রথম বার এসে ওদের গতিবিধি জেনে গিয়েছিল আড়াল থেকে। দ্বিতীয় বার সঙ্গে এনেছিল একটা প্রকাণ্ড কেক।'

বললুম, 'কেক দিয়ে পিঁপড়ে-মানুষদের সঙ্গে ভাব করেছিল? ভারি বুদ্ধিমান তো।'

কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ। তৃতীয় বার এনেছিল এক বস্তা চিনি।'

বললুম, 'কিন্তু এ-বার তার সঙ্গে কিছু ছিল না। আমি দেখেছি।'

কর্নেল হাসলেন। বললেন, 'এই চতুর্থ বার সে যা এনেছিল, তা বেলুনের বাস্কেটে এখনও আছে। ওই যে দেখছ প্যাকেট বাঁধা জিনিসটা, ওটা লজেঞ্চুস।'

আমরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলুম। কর্নেল ফের বললেন, 'প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে কেন যায়নি, একটু ভাবলেই বোঝা যায়। আমার মনে হচ্ছে, পিঁপড়ে-মানুষদের রাজাকে সে সমুদ্রের ধারে তার বেলুনের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। হয়তো বলেছিল, ওখানে গেলেই রাজাকে উপহারটা দেবে। তার মতলব ছিল, ওইভাবে ডেকে নিয়ে মণিটা কেড়ে নিয়ে বেলুনে চড়ে পালাবে। কিন্তু পিঁপড়ে-মানুষরা বুদ্ধিমান। ওর মতলব টের পেয়েছিল।'

আমার বুদ্ধি খেলল এবার। বললুম, 'উঁহু। তা নয়, বেলুনটা আমরা নিয়ে এসেছিলুম বলে সমুদ্রের ধারে গিয়ে যখন পিঁপড়ে-মানুষরা কিছু পায়নি, তখন রেগে গিয়ে ওকে বন্দি করেছিল।'

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন, 'মন্দ বলনি জয়ন্ত। সম্ভবত...'

কর্নেলের কথা হঠাৎ বন্ধ হল। উনি কোনের দিকে গুটিয়ে রাখা বেলুনটার দিকে হঠাৎ এগিয়ে গেলেন। তারপর বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ! বেলুনের অবস্থাটা কী করেছে! কুটিকুটি করে রেখে গেছে যে!'

আমি ও ড. প্রসাদ হুমড়ি খেয়ে দেখতে লাগলুম। বেলুনের ভাঁজকরা রবারটা আর আস্ত নেই। ঝাঁঝরা হয়ে রয়েছে। তার মানে বেলুনটা আর ওড়ানো যাবে না। শুধু দোলনার মতো বাস্কেটটা টিকে আছে। তার মধ্যে বসার আসন, লজেন্সের প্যাকেট, অল্পস্বল্প কলকবজা রয়েছে। পিঁপড়ে-মানুষরা সেসব ছোঁয়নি। লজেন্সের প্যাকেটটা অন্তত নিয়ে পালানো উচিত ছিল। কেন নেয়নি?

ড. প্রসাদ একটু হেসে বললেন, 'আমরা লজেন্সগুলো দিয়ে ওদের সঙ্গে ভাব করব। কী বলেন কর্নেল?'

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'ওই লজেন্সে তীব্র বিষ মেশানো আছে, ড. প্রসাদ।'

আমরা দু-জনে আঁতকে উঠলুম। বললুম, 'সে কী! কী ভাবে বুঝলেন?'

কর্নেল বললেন, 'ওই দেখো, কত খুদে পিঁপড়ে আর পোকামাকড় ঘরে পড়ে রয়েছে। তাই দেখে পিঁপড়ে-মানুষরা প্যাকেটটা ছোঁয়নি। এবার আশা করি বুঝতে পারছ, লোকটাকে কেন ওরা অমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে শাস্তি দিচ্ছিল।'

ড. প্রসাদ বললেন, 'সর্বনাশ! পিঁপড়ে-মানুষরা দেখছি ভারি ধূর্ত। আমরা বেরিয়ে গেছি, আর ওরা সেই ফাঁকে এতসব কাণ্ড করেছে! তার মানে, ওরা সারাক্ষণ আমাদের চোখে চোখে রেখেছে। কিন্তু ওদের আস্তানা থেকে আমরা এতদূরে রয়েছি। আমরা ওদের আস্তানায় পৌঁছোবার আগেই অত তাড়াতাড়ি কীভাবে ওরা এখানে এল এবং ফিরে গেল?'

কর্নেল বললেন, 'সেটা একটা রহস্য বটে। আমার মনে হচ্ছে, এখানে কোথাও একটা সিধে পথ আছে, মাটির তলায় তলায়। অর্থাৎ সুড়ঙ্গপথ। খুঁজে দেখা যাক।'

তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম তিন জনে। জিম আমার সঙ্গে এসেছে। নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরির ক্রেটার অর্থাৎ পিঁপড়ে-মানুষদের বসতি এখান থেকে উত্তর-পশ্চিম কোনে মাইলটাক দূরে। ওদিকটা জঙ্গল আর পাহাড়ে বড়ো দুর্গম দেখাচ্ছে।

এইসময় হঠাৎ জিম একটা চাপা গরগর আওয়াজ করল। আগের আতঙ্ক মেশানো আওয়াজ। তারপর এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলুম।

আমাদের সামনে খোলামেলা ঘাসের মাঠে আচম্বিতে পিলপিল করে কালো রঙের পিঁপড়ে-মানুষরা যেন মাটি ফুঁড়ে বেরোল। অসংখ্য জায়গা থেকে অসংখ্য পিঁপড়ে-মানুষ আর তাদের সঙ্গে সেই নেকুরের পাল।

বুঝলুম অজস্র গর্ত ছিল ঘাসের আড়ালে। ওগুলো সুড়ঙ্গপথ। সেখান দিয়ে বেরিয়ে গোটা মাঠ জুড়ে একটা মোটা কালো রেখার মতো দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সামনে একটা করে নেকুর নিয়ে একজন করে পিঁপড়ে-মানুষ। নিশ্চয় ওরা সেনাবাহিনী।

তারপর দীর্ঘ সেই কালো রেখা অর্ধবৃত্তাকার হয়ে এগিয়ে আসতে থাকল আমাদের দিকে। কতক্ষণ হতবাক হয়েছিলুম কে জানে! হঠাৎ কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সমুদ্রের কাছে চলো সবাই। সমুদ্রের কাছে।' তারপর দৌড়ে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন।

কখন ষষ্ঠীচরণ রান্না ফেলে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলে উঠল, 'ওরে বাবা!'

আমি রুদ্ধশ্বাসে বললুম, 'রাইফেল এনে গুলি ছুড়ি কর্নেল!'

কর্নেল তাঁবুর ভেতর থেকে শুনতে পেয়ে বললেন, 'না জয়ন্ত। গুলি করে ওদের শেষ করা যাবে না। সারা দ্বীপের মাটির তলায় তলায় দুর্গের মতো কোটি কোটি পিঁপড়ে-মানুষ রয়েছে মনে হচ্ছে। এসো, সবাই সমুদ্রের দিকে পালাই।'

আচমকা চার জনে সবকিছু ফেলে পুবে সমুদ্রের দিকে দৌড়ে চললুম। কর্নেল শুধু বেতারযন্ত্রটা সঙ্গে নিয়েছেন দেখা গেল।

যখন বিচে পৌঁছোলুম, তখন আমাদের দম আটকানোর অবস্থা। বুঝতে পারছিলুম না, এখানে কীভাবে ওদের হাত থেকে বাঁচব। এদিকে সমুদ্র অনেকটা শান্ত। কর্নেল সোজা জলে নেমে গিয়ে ডাকলেন, 'এসো জয়ন্ত! আসুন ড. প্রসাদ। আমরা এখন নিরাপদ।'

ষষ্ঠীচরণ কর্নেলের সঙ্গেই জলে নেমেছে। ঢেউয়ের ঝাপটায় কোমর অবধি ভিজে যাচ্ছে ওদের। আমি ও ড. প্রসাদও ওদের কাছে গেলুম। বললুম, 'কর্নেল! আমরা এখানে কীভাবে নিরাপদ? ওই তো ওরা এগিয়ে আসছে!'

কর্নেল বেতারযন্ত্রের চাবি ঘুরিয়ে কোনো বেতারকেন্দ্র ধরার চেষ্টা করছেন! বললেন, 'ওরা জলকে বড়ো ভয় পায়।'

জিমকে আমি দু-হাতে বুকের কাছে ধরে রেখেছি। সে থরথর করে কাঁপছে। বিচের ওধারে উঁচু ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে নেমে আসছে পালে পালে নেকুর। বীভৎস তাদের মুখভঙ্গি। জিভ লকলক করছে। পিঁপড়ে-মানুষরা তিড়িং-বিড়িং করে নাচতে নাচতে আসছে ওদের পেছন।

বিচের বালিতে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল।

কর্নেল বেতারযন্ত্রে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। শুনলুম উনি বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভেগা আইল্যান্ড। শিগগির হেলিকপ্টার নিয়ে আসুন। আমরা বিপন্ন।'

ষষ্ঠীচরণ চোখ বুজে ঠক ঠক করে কাঁপছে এক হাঁটু জলে। জিম আমার বুকে মুখ লুকিয়েছে। ড. প্রসাদ বিড়বিড় করে বলছেন, 'আহা! ক্যামেরাটা আনলে কত ভালো হত! কেউ কি বিশ্বাস করবে আমাদের কথা?'

কথাটা কানে যেতেই কর্নেল প্রায় আর্তনাদ করে বললেন, 'এই যাঃ! আমার ক্যামেরাটা আর কি ফিরে পাব? কী ভুলো মন আমার!'

উজ্জ্বল রোদে সোনালি বিচের ওপর পালে পালে জিভ বের করা নেকুর আর অসংখ্য পিঁপড়ে-মানুষ একইভাবে দাঁড়িয়ে।

ঘরের ছেলে বেঁচেবর্তে ভেগা আইল্যান্ড থেকে ঘরে ফিরতে পেরেছিলুম, এই যথেষ্ট। দিন সাতেক পরে পোর্টব্লেয়ার থেকে কর্নেল তাঁর বন্ধু বিমানবাহিনীর সেই জাঁদরেল অফিসারের সাহায্যে হেলিকপ্টারে চেপে ভেগা দ্বীপে তাঁর অত্যদ্ভুত ক্যামেরা আর আমার রাইফেলের খোঁজে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন। কিন্তু কোথায় ভেগা দ্বীপ? দ্বীপ যেন বেমালুম তলিয়ে গেছে ভারত মহাসাগরে। অনেক ওড়াউড়ি করে তাঁরা ফিরে আসেন।

এখন কর্নেল বলেন, 'তাহলে কি আমরা চার জনেই একইরকম বিদঘুটে স্বপ্ন দেখেছিলুম।'

ষষ্ঠীচরণ বলে, 'তা আর বলতে।'

আমিও সায় দিয়ে বলি, 'ঠিক ঠিক। স্বপ্নই বটে। তবে স্বপ্নে যদি ক্যামেরা বা রাইফেল হারায়, তাহলে তো বড়ো রহস্যের! ও কর্নেল, জীবনে কত রহস্যের সমাধান করেছেন, এটা করবেন না?'

কর্নেল উদাসভাবে শুধু বললেন, 'তাই তো!'

রাতের মানুষ

ঝুলনপূর্ণিমার রাতে গঞ্জের মেলায় ছোটোমামার সঙ্গে কলকাতার যাত্রা দেখতে গিয়েছিলুম। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি পড়ছিল। ফেরার সময় দেখি আকাশ ফাঁকা। ঝলমলে চাঁদ কাত হয়ে বাদবাকি জ্যোৎস্না ঢেলে নিজেকে খালি করে দিচ্ছে। রাস্তা শুনশান ফাঁকা। মানুষজন মেলায় রাত কাটাতেই আসে। কিন্তু ছোটোমামা খুঁতখুঁতে মানুষ। 'ঘুম পাচ্ছে বলেই যেখানে সেখানে শুয়ে পড়তে হবে নাকি? মোটে তো পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা। চলে আয় পুটু।'

ঘুম ঘুম চোখে রাস্তা হাঁটা বেশ কষ্টকর। তা ছাড়া ছোটোমামার চেয়ে আমার পা দুটো বড্ড বেশি ছোটো। বার বার পিছিয়ে পড়ছি আর ধমক খাচ্ছি।

হঠাৎ রাস্তার বাঁকের মুখে গঞ্জের শেষদিকটায় একটা সাইকেল-রিকশো দেখা গেল। রিকশোটা দাঁড়িয়েই ছিল। তবু ছোটোমামা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'রোখকে! রোখকে!'

রিকশোওয়ালা হেসে অস্থির। 'রুখেই তো আছি বাবুমশাই! যাওয়া হবে কোথায়?'

আমারও হাসি পাচ্ছিল। ছোটোমামার সবকিছুই অদ্ভুত। তো আমরা ঝাঁপুইহাটি যাব শুনে রিকশোওয়ালা খুশি হল। বলল, 'চলুন! আমি কাছাকাছিই থাকি। ওদিককার প্যাসেঞ্জারের জন্য অপেক্ষা করছিলুম। খালি রিকশো নিয়ে বাড়ি ফেরা পোষায় না।'

রিকশোতে উঠে বসে ঘুমটা আমাকে বাগে পেয়েছিল। কিন্তু ছোটোমামার বার বার ধমক এবং 'পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার' হুমকি ক্রমশ ঘুমটাকে এলোমেলো করে দিচ্ছিল। কিছুদূর চলার পর রিকশোওয়ালা রিকশো থামাল। ছোটোমামা বললেন, 'কী হল? চেন খুলে গেল নাকি?' রিকশোওয়ালা সিট থেকে নেমে বলল, 'আজ্ঞে না। চক্কোত্তিমশাই হজমিগুলি আনতে দিয়েছিলেন। দিয়ে আসি।'

ছোটোমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখানে কোথায় তোমার চক্কোত্তিমশাই?'

রিকশোওয়ালা কান করল না। রাস্তার ধারে ঝাঁকড়া একটা গাছের তলায় গিয়ে ডাকল, 'চক্কোত্তিমশাই! ঘুমোচ্ছেন নাকি?'

গাছের ভেতর থেকে খ্যানখ্যানে গলায় কেউ বলল, 'ঘুমোব কী রে বাবা! পেট আইঢাই। এত দেরি করলি কেন রে?'

'প্যাসেঞ্জার পেলে তবে তো আসব। এই নিন হজমিগুলি।'

'এনেছিস? কই, দে দে। শিগগির দে।'

রিকশোওয়ালা কাকে হজমিগুলি দিয়ে এসে সিটে উঠল। প্যাডেলে চাপ দিল। রিকশোর চাকা গড়াল। ছোটোমামা বললেন, 'ব্যাপার কী হে রিকশোওয়ালা? তোমার চক্কোত্তিমশাই কি গাছে থাকেন নাকি?'

'আজ্ঞে।'

'অ্যাঁ? গাছে থাকেন কেন?'

'ওটাই তো তেনার ডেরা।'

'তার মানে?'

'মানে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কী বাবুমশাই? ঝাঁপুইহাটি যাবেন। পৌঁছে দেব। ব্যাস!'

ছোটোমামা রেগে গেলেন। 'অদ্ভুত তো তোমার কথাবার্তা! রাতবিরেতে গাছের ওপর-'

রিকশোওয়ালা ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'চুপ! চুপ! চক্কোতিমশাইয়ের কানে গেলেই কেলেঙ্কারি।' আমার কাছ থেকে ততক্ষণ ঘুমটা কেটে পড়েছে। বরাবর দেখে আসছি, ছোটোমামার সঙ্গে কোথাও রাতবিরেতে বেরোলেই গোলমেলে সব ঘটনা ঘটে। বুঝতে পারি না, রাত এলেই পৃথিবীটা অন্যরকম হয়ে যায়? নাকি ছোটোমামার ভুলেই রাতটা গোলমেলে হয়ে যায়? কিন্তু তারপর তো ছোটোমামা 'চলে আয় পুঁটে' বলে শেষ পর্যন্ত উধাও হয়ে যান। ধাক্কাটা সামলাতে হয় আমাকেই। এবার কতদূর গড়াবে কে জানে! বুক টিপ টিপ করতে লাগল।

একটু পরে আবার রিকশো দাঁড়াল এবং রিকশোওয়ালা তড়াক করে নেমে গিয়ে ডাক দিল 'ঠাকরুনদিদি! অ ঠাকরুনদিদি!'

একটা শুকনো গাছের ডাল থেকে নেমে সাদা কাপড়পরা কেউ এদিকে এগিয়ে এল। 'ভূতু এলি? কখন থেকে পথ তাকিয়ে চোখে ব্যথা ধরে গেল। দোক্তা এনেছিস তো?'

'না আনলে ডাকছি কেন? এই নিন।'

দোক্তা নিয়ে ঠাকরুনদিদি ন্যাড়া গাছটার দিকে চলে গেল। ছোটোমামা গুম হয়ে বসেছিলেন। বললেন, 'কোনো মানে হয়?'

রিকশোওয়ালা আবার চুপচাপ রিকশো চালাতে শুরু করল। কিছুদূর গেছি, হঠাৎ কোত্থেকে কেউ হেঁড়ে গলায় ডাকল, 'ভূতু! অ ভূতু! অ্যাই ভূতো!'

ছোটোমামা চাপাস্বরে বললেন, 'থেমো না যে-ই ডাকুক!'

একটা কালো বেঁটে লোক ধমক দিল, 'অ্যাই ব্যাটাচ্ছেলে! কথা কানে যায় না?'

রিকশোওয়ালা বলল, 'রোজ রোজ বাকিতে জিনিস দেবে নাকি?'

'দেবে না মানে? ওর বাপ দেবে। এখনও তেষট্টি টাকা, সাতষট্টি পয়সা জমা আছে খাতায়!'

‘সে আপনি মামলা করে আদায় করুন গে।’

লোকটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। ‘বাজে কথা বলিসনে। আসলে তুই যাসনি দত্তর দোকানে।’

‘কী ঝামেলা করছেন বাবু? গাড়িতে প্যাসেঞ্জার আছে দেখছেন না?’

লোকটা প্রায় কেঁদে ফেলল, ‘এখন আমি ঘুমোব কী করে? একগুলি আফিং আমাকে এত রাত্তিরে কে দেবে?’

রিকশোওয়ালা পরামর্শ দিল, ‘শ্মশানতলায় চলে যান। দারোগাবাবুর কাছে একগুলি পেতেও পারেন।’

‘ওরে বাবা! মৌতাত ভাঙলে লক-আপে ঢোকাবে।’

‘তাহলে বরঞ্চ পাঁচুর কাছে যান।’

‘সে ব্যাটা তো চোর।’

‘চোর বলেই তো বলছি। দারোগাবাবুর কৌটো থেকে দু-একটা গুলি সেই হাতাতে পারবে।’

লোকটা কিন্তু কিন্তু করে বলল, ‘তা পাঁচুকে পাচ্ছি কোথায়? ও তো ফেরারি আসামি।’

রিকশোওয়ালা চাপাস্বরে বলল, ‘সন্ধ্যে বেলা পাঁচুকে একপলক দেখেছি। মোড়ল মশাইয়ের তাল গাছের কাছে দাঁড়িয়েছিল। মোড়লমশাই গঞ্জের মেলায় গেছেন। কাজেই পাঁচু নিশ্চয় তেনার ডেরায় ঘুমিয়ে নিচ্ছে।’

বেঁটে কালো ছায়ামূর্তিটি তখনই উধাও হয়ে গেল। রিকশোওয়ালা প্যাডেলে চাপ দিয়ে বলল, ‘রোজ রাত্তিরে আমার এই এক জ্বালা বাবুমশাই। রাজ্যের লোকের হাজার ফরমাস।’

ছোটোমামা গুম হয়ে বসে আছেন। আমি ভাবছি, হঠাৎ আমাকে ফেলে পালিয়ে না যান। বড্ড বেশি গোলমেলে ঘটনা ঘটছে। কিছুদূর যাওয়ার পর রাস্তা বাঁক নিল। এবার দু-ধারেই ঘন জঙ্গল। রাস্তায় চকরাবকরা জ্যোৎস্না পড়েছে।

রিকশোওয়ালা বলল, ‘আর এক জায়গায় একটুখানি থামতে হবে। সিঙ্গিমশাইয়ের নস্যির কৌটোটা দিয়েই আমার ছুটি।’

একখানে জঙ্গলটা কিছু ফাঁকা। রিকশো সেখানে থামল। রিকশোওয়ালা সিট থেকে রাস্তার ধারে গিয়ে চ্যাঁচাতে থাকল, ‘সিঙ্গিমশাই! সিঙ্গিমশাই!’

তারপর সাড়া না পেয়ে এগিয়ে গেল। আর তাকে দেখতে পেলুম না। ভয়ে ভয়ে ডাকলুম, ‘ছোটোমামা!’

ছোটোমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘চুপচাপ বসে থাক। আমাদের বাড়ি পৌঁছোনো নিয়ে কথা।’

এইসময় কাছাকাছি একটা গাছ থেকে কেউ বলল, ‘কারা এখানে?’

ছোটোমামা ভারিক্কি চালে বললেন, ‘আমরা।’

‘আমরা মানে? নাম কী? বাড়ি কোথায়?’

ছোটোমামা রেগেই ছিলেন, বললেন, 'তা জেনে তোমার কাজ কী? কে তুমি? গাছে কী করছ?'

'অ্যাঁ! বলে কী! গাছে কী করছি। হি হি হি হি! ন্যাকা!'

'খবরদার! বাজে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।'

'এটা বাজে কথা হল? জান না গাছে কী করছি?'

ছোটোমামা খাপ্পা হয়ে বললেন, 'না। জানি না। আমরা মানুষ। আমরা তোমাদের মতো রাতবিরেতে গাছে কাটাই না।'

'হি হি হি! প্রথম প্রথম এই ভুলটা হয়।'

'কী ভুল হয়?'

'মানুষ-মানুষ ভুল।'

'কী অদ্ভুত!'

'অদ্ভুত তো বটেই। অদটুকু বাদ যেতে কয়েকটা দিন দেরি, এই যা। তা তোমরা কি ডেরা খুঁজে বেড়াচ্ছ? বোকা আর কাকে বলে? ভূতোর রিকশোতে চেপে-হি হি হি হি! ভূতোটা এক নম্বরের ধড়িবাজ। সাবধান করে দিচ্ছি কিন্তু!'

ছোটোমামা রিকশো থেকে নেমে ঘুসি পাকিয়ে দাঁড়ালেন। 'কে হে তুমি! গাছ থেকে নেমে এসো তো দেখি।'

আমিও নামতে দেরি করলুম না। ছোটোমামার মারামারি করার অভ্যাস আছে। কিন্তু রাতবিরেতে গাছের লোকটার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন কি না আমার সন্দেহ। রিকশোওয়ালাও আসছে না। মারামারি বাধলে থামাবে কে, এটাই আমার ভাবনা।

ছোটোমামা ঘুসি বাগিয়ে এবার হুংকার দিলেন, 'কাম অন! কাম অন!'

গাছের লোকটা এবার বিদঘুটে হাসল। 'হি হি হি হি! ইংরেজির কী ছিরি! কাম অন কী হে ছোকরা? গেট ডাউন! কিন্তু গেট ডাউন করি কী করে? একটা ঠ্যাংই যে নেই। থাকলে পরে এতক্ষণে নেমে কানটি ধরে স্ট্যান্ড আপ অন দা বেঞ্চ করিয়ে দিতুম।'

পাশের একটা গাছ থেকে কেউ বলল, 'কী হে পণ্ডিতমশাই? ছাত্র জোটাতে পারলেন নাকি?'

'নাহ। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না।'

ছোটোমামা আর সহ্য করতে পারলেন না। রাস্তার ধারে পাথরকুচির স্তূপ থেকে পাথর কুড়িয়ে ছুড়তে শুরু করলেন। আমাকেও বললেন, 'হাত লাগা পুঁটু। আমাকে গাধা বলছে! আমাকে ইংরেজি শেখাচ্ছে পাঠশালার পণ্ডিত?'

ওদিকে পণ্ডিতমশাইয়ের চ্যাঁচামেচিতে চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে। হইহই রইরই করতে করতে কালো কালো কারা সব গাছ থেকে ঝুপঝাপ করে নেমে আসছিল। আমি ভয়ে প্রায় কেঁদে ফেললুম, 'ছোটোমামা! ছোটোমামা!' এবার ছোটোমামার চোখে পড়ল ব্যাপারটা। তারপর যা ভেবেছিলুম এবং বরাবর যা ঘটে আসছে তা-ই হল। ছোটোমামা 'চলে আয় পুটু' বলে রিকশোওয়ালা যেদিকে গিয়েছিল, সেইদিকে দৌড়োলেন। আমিও দৌড়োলুম।

কিন্তু ভাগ্যিস ছোটোমামা হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, তাই সঙ্গ পাওয়া গেল। জ্যোৎস্নায় একটা ভাঙাচোরা দালানবাড়ি দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির দরজায় ছোটোমামা ধাক্কা দিতে লাগলেন। একটু পরে ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কে?'

ছোটোমামা ব্যস্তভাবে বলল, 'আমরা খুব বিপদে পড়েছি। দয়া করে দরজা খুলুন।'

'কী বিপদ?'

'কারা আমাদের তাড়া করেছে।'

'তারা কারা?'

'গাছে গাছে যারা থাকে।'

'গাছে থাকে ভূত বনে থাকে বাঘ

জলে থাকে মাছ মনে থাকে রাগ।'

'কী বিপদ। আপনি পদ্য বলছেন নাকি?'

'ঠিক ধরেছ। কেমন হয়েছে পদ্যটা বলো।'

'খুব ভালো। দয়া করে এবার দরজা খুলুন। ওরা আসছে।'

'ঘোড়ায় যদি পাড়ে ডিম

জলে যদি জ্বলে পিদিম

বলো তবে অঃত কিম?'

ছোটোমামার পদ্য লেখার বাতিক ছিল। বলে দিলেন, 'জাম গাছে ফলবে শিম।'

'খাসা! খাসা! স্বাগত! সুস্বাগত!'

দরজা খুলে গেল। ছোটোমামা বললেন, 'আলো নেই কেন? আলো জ্বালুন।'

'যত বড়ো কবি তুই হোস না

যদি না বাসিস ভালো জোসনা

থেকে যাবে কত আফশোস না!

তাই বলি চুপ করে বোস না।'

ভদ্রলোক বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। জানলা গলিয়ে জ্যোৎস্না এসে ঘরে ঢুকেছিল। আবছা দেখা যাচ্ছিল ওঁকে। ঢ্যাঙা, বড়ো বড়ো চুল, পরনে পাঞ্জাবি- পাজামা। হাতে একটা বই বা মোটা খাতা। পাতা ওলটাতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, 'এই পদ্যটা আরও ভালো।

একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়া ছিল

সারসপাখি লম্বা ঠোঁটে হাড় তুলিয়া দিল

পুরস্কার চাইলে পরে বাঘ রাগিয়া কহে,

মুণ্ডুখানা ফেরত পেলি তা-ই যথেষ্ট নহে?'

পাশের ঘর থেকে কেউ বিটকেল গলায় ডাকল, 'ঘোঁতনা! অ্যাই ঘোঁতনা! কাকে পদ্য শোনাচ্ছিস?'

'মানুষকে।'

'কয় জন মানুষ?'

'দেড় জন।'

'ধুস! পোষাবে না।'

ছোটোমামা বললেন, 'কে উনি?'

কবি ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার দাদার ওই এক স্বভাব। খালি খাই খাই।'

'খাই খাই মানে?'

'দাদার খুব খিদে আর কি! যাক গে। এই পদ্যটা পড়ি।...'

সেই সময় বাইরে ডাকাডাকি শোনা গেল, 'ছোটোবাবু! ছোটোবাবু! ছোটোবাবু!'

কবি খাপ্পা হয়ে দরজা খুলে বললেন, 'কী হয়েছে? চ্যাঁচাচ্ছিস কেন রে ভূতো?'

'আমার প্যাসেঞ্জার হারিয়ে গেছে। খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'কয় জন?'

'আজ্ঞে দেড় জন।'

ছোটোমামা আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন। 'চলে আয় পুটু!'

রিকশোওয়ালা আমাদের দেখেই বলে উঠল, 'সর্বনাশ! কোথায় ঢুকেছিলেন আপনারা? চলে আসুন। চলে আসুন। এ-বাড়ির বড়োবাবুর বেজায় খিদে।'

আমরা তিন জনে দৌড়োচ্ছি। পেছনে কবির করুণ আর্তনাদ কানে আসছে, 'অত ভালো পদ্যখানা শুনে গেল না! আমার যে আবার মরতে ইচ্ছে হচ্ছে গো! ও হো হো হো...'

ছোটোমামা রাস্তার কাছে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ওহে রিকশোওয়ালা! ওরা সব নেই তো?'

রিকশোওয়ালা হাসল, 'নাহ। ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে। শুনতে পাচ্ছেন না?'

ছোটোমামা কান করে শুনে বললেন, 'হুঁঃ!'

আমি তেমন কোনো শব্দ পেলুম না। তবে বাতাসে গাছপালা খুব নড়ছে। নানারকম শব্দও হচ্ছে বটে। কিন্তু ভোঁস ভোঁস নয়। শোঁ শোঁ সর সর খড় খড়। কে জানে বাবা কী।...

এবার আর কোনো গণ্ডগোল হল না। আমাদের গাঁয়ের মোড়ে পৌঁছে দিয়ে রিকশোওয়ালা ভাড়া মিটিয়ে নিল।

ছোটোমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোন গাছে থাক হে?'

রিকশোওয়ালা বেজায় হেসে বলল, 'আমি কেন গাছে থাকতে যাব বাবুমশাই? আমার কি ঘরদোর নেই? নামটাই না হয় ভূতো। রাতবিরেতে রিকশো চালাই বলে তেনাদের সঙ্গে চেনাজানা হয়েছে।'

ছোটোমামা সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, 'তুমি মানুষ?'

‘আজ্ঞে, ষোলোআনা মানুষ।’ বলে সে শেষরাতের জ্যোৎস্নায় রিকশো চালিয়ে কালো হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেল।

বাঁটুবাবুর টাট্টু

‘ঘোড়া ইজ ঘোড়া।’ বাঁটুবাবু-ডাক্তার খাপ্পা হয়ে বললেন। ‘এইচ ও আর এস ই হর্স। খবরদার! আর কক্ষনো আমার ঘোড়াকে টাট্টু-ফাট্টু বলবে না।’

পণ্ডিতমশাই ফিক করে হেসে বললেন, ‘এই চতুষ্পদ বক্রগতি বামন প্রাণীটিকে যদি ঘোড়া বলতে হয়, তাহলে সিঙ্গিমশাইয়ের রামছাগলটিও ঘোড়া!’

বাঁটুবাবু-ডাক্তার তেড়েমেড়ে বললেন, ‘তুমি পণ্ডিতমূর্খ! রামছাগলের শিং থাকে। আমার ঘোড়ার শিং আছে?’

‘ছিল। তুমি তো ডাক্তার। অস্ত্রচিকিৎসা করে কেটে দিয়েছ।’ পণ্ডিতমশাই ডিবে বের করে একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন এবং বিকট হাঁচলেন।

হয়তো হাঁচির শব্দেই ভয় পেয়ে আচমকা টাট্টু ঘোড়াটি পিঠে ডাক্তারবাবু সমেত প্রায় দিশেহারা হয়েই পালিয়ে গেল। পণ্ডিতমশাই খিক খিক করে হাসতে লাগলেন। ভিড় করে দাঁড়িয়ে যারা তর্কাতর্কি শুনছিল, তারাও হাসতে লাগল।

বাঁটুবাবুর আসল নামটা কী, এখনও অনেকে জানে না। বেঁটে গাবদাগোবদা মানুষ বলে সবাই বাঁটুডাক্তার বলে। এই গ্রামের সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিনি বদলি হয়ে এসেছেন। এলাকার অবস্থা শোচনীয়। না রাস্তাঘাট, না কিচ্ছু, বিষ্টিবাদলা হলেই জল-কাদা। সাইকেলও চলে না। তাই বুদ্ধি করে ডাক্তারবাবু ঘোড়াটি কিনেছেন।

গুজব আছে, দূরের পাহাড়ি মুল্লুক থেকে ঘোড়ার পিঠে জাঁতা-শিল-নোড়া চাপিয়ে এ-তল্লাটে যারা বেচতে আসে, তাদের কাছেই নাকি বাঁটুবাবু ঘোড়াটি কিনেছেন। হাড়-জিরজিরে একটা টাট্টুই বটে। নড়বড় করে দৌড়োয়। এ-ও শোনা যায়, টাট্টু ঘোড়াটির স্বভাব বেয়াড়া বলেই জাঁতাওয়ালারা তাকে কম দামে বেচে দিয়ে যায়। কেউ বলে পাঁচ টাকায়, কেউ বলে মাত্র দু-টাকায়। আবার কেউ বলে, জাঁতাওয়ালাদের আন্ত্রিক রোগ হয়েছিল। তারই ভিজিট।

তবে এটা সত্যি, ডাক্তারবাবুর একটা ঘোড়ার খুব দরকার ছিল।

সেবার দেশে খুব আন্ত্রিক রোগের প্রাদুর্ভাব। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে মানুষ মরছে। ডাক্তারবাবুর দম ফেলার ফুরসত নেই। ওই টাট্টুর পিঠে চেপে গাঁয়ে গাঁয়ে চিকিৎসা করে বেড়াচ্ছেন। লোকে তারিফও করে, এমন জনদরদি ডাক্তার বহুকাল আগে দেখেনি। খুব শিগগির তিনি দারুণ পপুলার হয়ে উঠেছেন এলাকায়।

বাঁটুবাবু এমনিতে হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু কেউ তাঁর ঘোড়ার বদনাম করলে বেজায় চটে যান। স্কুলের প্রাক্তন সংস্কৃতশিক্ষক পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব। পণ্ডিতমশাই বাইরে বাইরে কাঠখোট্টা, ভেতর ভেতর কিন্তু ভারি রসিক। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হলেই ফিক করে হেসে বলেন, 'ওহে ডাক্তার, কিঞ্চিৎ শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করো।'

'সময় নেই। কাল যাচ্ছি।'

'আহা, শাস্ত্রবাক্য শ্রবণে পুণ্য হয়।' পণ্ডিতমশাই আকর্ণ হেসে বলেন। 'দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত, মতান্তরে উচ্চৈঃশ্রবা। শিবের বাহন ষণ্ড। লক্ষ্মীর বাহন পেচক। গণেশের বাহন মূষিক। কার্তিকের বাহন ময়ূর। সরস্বতীর বাহন রাজহংস। শীতলার বাহন গর্দভ। আর বাঁটুর বাহন টাট্টু!'

ডাক্তারবাবু বাঁকা হেসে বলেন, 'তুমি খুব ভোজনরসিক শুনেছি। সিঙ্গিবাড়ির বুড়োসিঙ্গির শ্রাদ্ধে একশো আটখানা পান্তুয়া খেয়েছিলে। কিন্তু সাবধান! এটা আন্ত্রিকের সময়। আন্ত্রিকে ধরলে তখন, দেখছ তো?' ব্যাগ খুলে প্রকাণ্ড ইঞ্জেকশন-সিরিঞ্জ বের করে দেখান।

পণ্ডিতমশাইয়ের ইঞ্জেকশনকে বড়ো ভয়। ঝটপট গম্ভীর হয়ে বলেন, 'কিমাশ্চর্যম! আমি তো তোমার ব্যাজস্তুতিই করলুম! নিন্দার ছলে স্তুতি! টাট্টুপৃষ্ঠে বাঁটু। কেমন অনুপ্রাস অলংকার দিলুম, ভাবো!'

ডাক্তার আর একদফা শাসিয়ে টাট্টু ছোটান। বেঁটে গোবদা মানুষের চাপে বেঁটে রোগা টাট্টু ঘোড়াটি নড়বড় করে বক্রগতিতে অর্থাৎ এঁকেবেঁকে কী দৌড় দৌড়োয়, দেখবার মতো দৃশ্য। দুষ্টু ছেলেরাও কখনো হল্লা করে পেছনে দৌড়োয়। তাতে বাঁটুডাক্তারের টাট্টু ভয় পেয়ে কেলেঙ্কারি বাধায়। ডাক্তার হয়তো রুগি দেখতে যাচ্ছেন কেষ্টপুরে, তাঁকে নিয়ে গিয়ে তুলল বিষ্টুপুরে।

তবে সবখানেই আন্ত্রিক রোগ। বিষ্টুপুরের লোকেরা খুশি হয়। ডাক্তারও রুগি পেয়ে খুশি হন।

পণ্ডিতমশাই গড়নে বাঁটুবাবুর দোসর। পরনে অবশ্য খাটো ধুতি আর হাতকাটা ফতুয়া। মাথায় দেখার মতো টিকি। স্কুলে রিটায়ার করেছেন কবে। তারপর থেকে পেশা যজমানি। এ-গাঁ সে-গাঁ থেকে পুজোআচ্চায় ডাক আসে। তাই তাঁরও বাহনের অভাবে বড়ো অসুবিধে। জল-কাদা ভাঙা এ-বয়সে কষ্টকর।

বাঁটুডাক্তারের টাট্টু নিয়ে মুখে যতই রসিকতা করুন, ব্যাপারটা দেখার পর তাঁকেও ঘোড়ারোগ ধরেছিল। ভাবতেন, যেমন-তেমন, একটা ঘোড়া পেলে ভালো হয়। কিন্তু ঘোড়ার যা দাম, তাঁর পক্ষে ঘোড়া কেনা সম্ভব নয়। এক ভরসা, শীতের শেষে পাহাড়ি মুলুকের জাঁতাওয়ালারা যদি আসে এবং দৈবাৎ একটা রোগাভোগা ঘোড়া কম পয়সায় পেয়ে যান, ডাক্তারবাবুর মতোই।

পেলে দানাপানি খাইয়ে তাজা করে ফেলবেন। বাঁটুবাবুর মতো মাঠে কি জলার ধারে চরে নিজের আহার নিজেকে খুঁজতে দেবেন না। ডাক্তার বড়ো কঞ্জুস!

তখন সদ্য শরৎকাল চলছে। বিচ্ছিরি বিষ্টিবাদলা, জল-কাদা। কবে ফাল্গুন আসবে, তখন পাহাড়ি লোকেরা এসে যাবে। আজকাল জাঁতার চল কমে গেছে। তবে শিলনোড়ার চাহিদা আছে। পাথরের থালাবাটিও লোকে কেনে। সেই ভরসা। পণ্ডিতমশাই প্রতীক্ষায় ছিলেন।

দেখতে দেখতে কালীপুজো এসে গেল। প্রায় ছ-কিমি দূরে কালীপুরে এক যজমানবাড়ি আছে। পণ্ডিতমশাই তাঁদের কালীপুজোর পুরুত। প্রত্যেক বছর অবশ্য গোরুর গাড়ি পাঠায়! এবার ওই এলাকায় বন্যা হয়েছিল। রাস্তা ভেঙে-টেঙে ধুয়ে গেছে। জল-কাদায় গাড়ি আসবে না।

কিন্তু লোক তো আসবে। পায়ে হেঁটেই যাবেন বরং। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। যজমানবাড়ি থেকে লোক এল না। বংশানুক্রমে যজমান ওরা। এমন তো হওয়ার কথা নয়। বন্যায় মূর্তি গড়িয়ে পুজো না করতে পারুন, শাস্ত্রে ঘটপুজোর বিধি আছে না। গৃহদেবীর বাৎসরিক পুজো না হলেই অকল্যাণ। দিনে দিনে পাষণ্ড নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে লোকেরা। পণ্ডিতমশাই ভাবলেন, নির্বোধ। তাই শাস্ত্রবিধি জানে না। বরং নিজে গিয়ে ব্যবস্থা করবেন পুজোর। আজই অমাবস্যা। পণ্ডিতমশাই বেরিয়ে পড়লেন। দিন ফুরিয়ে আসছে। আর তো দেরি করা যায় না। অতখানি পথ।

গ্রামের শেষে দিঘি। দিঘির পাড় দিয়ে পায়ে-চলা পথ। পণ্ডিতমশাই হঠাৎ দেখতে পেলেন বাঁটুবাবুর টাট্টুটি জলের ধারে তখনও ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। অমনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

জল-কাদা ভেঙে বাঁটুডাক্তার যদি কাঁহা কাঁহা মুল্লুক ওই টাট্টুর পিঠে চেপে ঘুরতে পারেন, তিনিই-বা পারবেন না কেন? বেগড়বাঁই করলে ছাত্রদের যেমন কান টেনে শাস্তি দিতেন এবং আকর্ণ হেসে বলতেন, 'কান টানলেই মাথা আসে, মাথা এলেই বুদ্ধি আসে', তেমনি টাট্টুব্যাটার কান টেনে শায়েস্তা করবেন।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে পণ্ডিতমশাই নেমে গেলেন। হাতে একটা যষ্ঠি আছে। সাপখোপের ভয়, জল-কাদায় আছাড় খাওয়ারও ভয়। সেজন্যই এই যষ্টি। আস্ত বাঁশের খেঁটে। এটাই ছিপটির কাজ দেবে।

ঘোড়াটিকে গুঁতো মেরে জলের ধার থেকে ওঠালেন। দেখলেন, বেশ শান্ত মেজাজের প্রাণী তো! আসলে বাঁটুডাক্তার খামোকা ওকে ছিপটি মারতেন বলেই অমন করে দৌড়োত।

পণ্ডিতমশাই তার গায়ে হাত রেখে আদর করে সাধুভাষায় বললেন, 'বৎস! পুণ্যকর্মে গমন করিলে পুণ্যলাভ হইবে। প্রচুর চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় হেঁ হেঁ হেঁ...! তোমার উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় সুচিক্কণ বপু হইবে, হেঁ হেঁ হেঁ...!'

টাট্টুটি বোধ করি আনন্দে বিকট হ্রেষাধ্বনি করল, 'চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ...' এ-যাবৎ তার হ্রেষাধ্বনি শোনা যায়নি। পণ্ডিতমশাই এক লাফে তার পিঠে চাপলেন। এমন যার হাঁকডাক, তাঁর গায়ে জোর আছে বই কী!

লাগাম ছাড়া টাট্টু। আচমকা পিঠে ওজনের হেরফের টের পেয়ে থাকবে। তক্ষুনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দৌড়োল। পণ্ডিতমশাই অমনি ঝুঁকে তার গলা জড়িয়ে না ধরলে আছাড় খেতেন। সামলে নিয়ে তাকে কালীপুরমুখী করতে লাঠির গুঁতো মারলেন। টাট্টু আরও ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়ে দৌড়োল।

তারপর আর থামবার নাম নেই। আবছা আঁধারে জল-কাদা ভেঙে পক্ষীরাজের মতো যেন ডানা মেলে উড়ছে। দেখতে দেখতে আঁধার ঘনিয়ে এল। পণ্ডিতমশাই তাঁকে যত থামানোর জন্য গুঁতো মারেন, তত তার গতি বাড়ে। শেষে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন।

অমাবস্যার রাত্তির। ঘুরঘুটে আঁধার। দূরে একটা আলো জুগ জুগ করছিল। ঘোড়াটা সেই আলোর দিকেই ছুটছে মনে হল পণ্ডিতমশাইয়ের। ততক্ষণে ঝাঁকুনিতে তাঁর কোমরে ব্যথা ধরে গেছে। হাড় মট মট করে নড়ছে। জীবনে কখনো ঘোড়ায় চড়েননি। তাতে জিন নেই ঘোড়ার পিঠে। পাদান নেই। ঝুলন্ত পা দু-খানিও জল-কাদা কাঁটাখোঁচে একেবারে বিচিত্তির! হাতের লাঠিটাও কখন গেছে পড়ে। দু-হাতে ঘোড়ার গলা আঁকড়ে উবু হয়ে আছেন পণ্ডিতমশাই।

আলোর কাছাকাছি গিয়ে বাঁটুবাবুর টাট্টুর গতি কমল।

একটা গ্রামই বটে। দু-ধারে ঘরবাড়ি আবছা দেখা যাচ্ছে। একটা বারান্দায় লণ্ঠন জ্বলছিল। ঘোড়াটি সেখানে গিয়ে থামল এবং বিকট ডাক ছাড়ল, 'চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ!'

অমনি কারা চেঁচিয়ে উঠল, 'এসে গেছেন! ডাক্তারবাবু এসে গেছেন!'

তারপর চারদিকে হল্লা। একটা সাড়া পড়ে গেল। 'ওরে, ডাক্তারবাবু এসে গেছেন! ইঞ্জেকশন নিবি তো চলে আয়!'

পণ্ডিতমশাই কথা বলার চেষ্টা করলেন। গলা শুকনো। কথা বেরোল না।

যে বারান্দায় লণ্ঠন জ্বলছিল, সেখান থেকে কেউ হেঁড়ে গলায় ধমক দিল, 'চো-ও-প সব! চো-ও-প!'

হল্লাটা থেমে গেল। তখন সে ঘোড়ার কাছে এল। হাতের লণ্ঠন তুলে পণ্ডিতমশাইকে দেখে বলল, 'ডাক্তারবাবু, আপনার ব্যাগ দেখছিনে যে?'

এবার পণ্ডিতমশাই অতিকষ্টে শুধু বললেন, 'জল!'

লোকটা হাঁক ছাড়ল, 'ওরে, জল নিয়ে আয়।'

তক্ষুনি এক ঘটি জল এসে গেল। পণ্ডিতমশাই টের পেলেন জলটা বেজায় ঠান্ডা হিম! তা হোক! ঢক ঢক করে খেয়ে চোখে-মুখে ছড়িয়ে একটু সুস্থ হলেন। বললেন, 'আমাকে নামাও বাবাসকল। তারপর সব বলছি!'

কয়েক জন মিলে তাঁকে চ্যাংদোলা করে নামাল। মনে হল, গাঁয়ের চাষি মানুষজন দিনমান জল-কাদায় মাঠে কাজ করেছে, তাই এখনও হাতগুলো জলটার মতোই ঠান্ডা হিম।

লণ্ঠনের আলোটা খুব কম। স্পষ্ট করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। যেটুকু দেখা গেল, বারান্দাটা পাকা। বাড়িটাও পাকা এবং দোতলা। কিন্তু পলস্তারা-খসা পুরোনো বাড়ি। জরাজীর্ণ অবস্থা বোঝা যায়। বারান্দাতেও ফাটল ধরেছে। লণ্ঠনধারী লোকটি ঢ্যাঙা, রোগাটে গড়ন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। প্রৌঢ় বলা চলে। মাথায় কাঁচা-পাকা সিঁথে করা লম্বা চুল। ঘরে পণ্ডিতমশাইকে ঢুকিয়ে পিছু ফিরে বললেন, 'ওরে ডাক্তারবাবুর ঘোড়াটা দেখিস!'

বাইরে থেকে সাড়া এল, 'দেখছি বাঁড়ুজ্যেমশাই! ভাববেন না।'

পণ্ডিতমশাই নমস্কার করে বললেন, 'আপনি ব্রাহ্মণ?'

পালটা নমস্কার করে তিনি বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?'

পইতে দেখিয়ে পণ্ডিতমশাই করুণ হাসলেন। বললেন, 'আর বলবেন না। যাচ্ছিলুম একখানে, এসে পড়লুম আর একখানে। ওই পাষণ্ড টাট্টু...'

কথা কেড়ে বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, 'শুনেছি বটে! আপনাকে না-দেখলেও যেমন আপনার কথা শুনেছি, তেমনি আপনার টাট্টুর কথা শুনেছি। আপনি নাকি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি! কী সৌভাগ্য, আপনাকে পাওয়া গেল ডাক্তারবাবু!'

পণ্ডিতমশাই হাত নেড়ে বললেন, 'গণ্ডগোল হয়ে গেছে! গণ্ডগোল হয়ে গেছে!'

'কী গণ্ডগোল বলুন তো ডাক্তারবাবু? ব্যাগটা পড়ে গেছে তো? এক্ষুনি লোক পাঠাচ্ছি খুঁজতে। আপনি আগে রুগিকে দেখুন। আপনি চোখে দেখলেই আদ্ধেক সেরে যাবে। বাকি আদ্ধেক ইঞ্জেকশন। আগে একটু জিরিয়ে নিন।'

পণ্ডিতমশাই একটা নড়বড়ে চেয়ারে ধপাস করে বসে বললেন, 'না, না! আপনি ভুল করছেন। আমি বাঁটুডাক্তার নই।'

অদ্ভুত হেসে বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, 'তা বললে কি চলে? এলাকা জুড়ে প্রবাদবাক্য চালু হয়ে গেছে জানেন তো?

যেখানে দেখবে টাট্টু

পিঠে ডাক্তার বাঁটু।।

খুরে খট খট শব্দ

শুনে আন্ত্রিক জব্দ।।'

পণ্ডিতমশাই জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'ভুল! ভুল! আমি হলুম ভেঁটু ভটচাজ।'

বাঁড়ুজ্যেমশাই তেমনিই হেসে বললেন, 'তা বললে চলে? পায়ে হেঁটে এলে বুঝতুম, বাঁটুবাবুর বদলে ভেঁটুবাবুই নাহয় এসেছেন!'

পণ্ডিতমশাই রাগ করে বললেন, 'খবরদার, ভেঁটু বলবেন না!'

এই সময় বাইরে কে খ্যানখেনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঁড়ুজ্যেমশাই, আপনার জামাই টাট্টুর পিঠে চেপে পালিয়ে যাচ্ছেন!'

বাঁড়ুজ্যেমশাই হাঁক ছাড়লেন, 'ধর! ধর! ধরে আন!'

আবার হল্লার শব্দ। অন্ধকারে ধুপ ধুপ শব্দে দৌড়োদৌড়ি। 'ধর! ধর! পালাল! পালাল!'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'ওই যাঃ! ঘোড়াটা...'

তাঁকে থামিয়ে বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, 'ভাববেন না। এক্ষুনি ধরে ফেলবে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কী? আপনার জামাইবাবাজি অমন করে পালালেন কেন?'

গম্ভীর হয়ে বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। আন্ত্রিক রোগের ভয় হয়েছে বাবাজির। পালানোর ধান্দায় আছে টের পেয়ে পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছিলুম। এই সুযোগে কেটে পড়েছে। কিন্তু যাবেটা কোথায়?'

বলে তিনি পা বাড়ালেন ভেতরের দিকে। 'কই আসুন। আগে রুগি দেখে নিন। তারপর প্রেসক্রিপশন, ইঞ্জেকশন ওসব হবে। আসুন, আসুন!'

পণ্ডিতমশাই মরিয়া হয়ে বললেন, 'আমি ডাক্তার নই। যজমেনে বামুন।'

'তাতে কী? আমরাও যজমেনে বামুন ছিলুম। নইলে এই মুখ্যুদের গ্রামে কি কেউ বাস করতে আসে? আসুন, আসুন! যজমেনে বামুনরা কি আজকাল ডাক্তার হচ্ছে না?'

পণ্ডিতমশাই কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন, 'কিন্তু আমি যে ডাক্তারির কিস্সু জানিনে!'

'জানার দরকার নেই।' চাপা গলায় বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন। 'আপনাকে দেখলেই গিন্নির আন্ত্রিক সেরে যাবে। পথ তাকিয়ে শুয়ে আছেন। খালি বলেন, কই! বাঁটুডাক্তার তো এলেন না! ওঁকে নাকি কল দিয়ে আসিনি বলে আমাকে শাসান। আমার হয়েছে জ্বালা!'

ফিসফিস করে এসব কথা বলতে বলতে সিঁড়িতে উঠছিলেন তিনি। একটা হাতে পণ্ডিতমশাইয়ের একটা হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছেন। অন্য হাতে লণ্ঠন। ওপরতলার বারান্দায় উঠে পণ্ডিতমশাই বললেন, 'আপনার হাতটা বিচ্ছিরি ঠান্ডা কেন বলুন তো?'

বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, 'যা বিষ্টিবাদলা আর আন্ত্রিক!'

'আন্ত্রিকের সঙ্গে ঠান্ডার কী সম্পর্ক?'

পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে ঘুরে তিনি বললেন, 'চুপ! চুপ! ওসব কথা বলতে নেই।'

অন্ধকার ঘরের ভেতর প্রকাণ্ড সেকেলে খাট। তাতে গলা অবধি চাদর মুড়ি দিয়ে চিত হয়ে এক ভদ্রমহিলা শুয়ে আছেন। বাঁড়ুজ্যেমশাই লণ্ঠনটা তুলে ধরে বললেন, 'ওগো, শুনছ? বাঁটুবাবু এসেছেন!'

বাঁড়ুজ্যেগিন্নি চোখ খুলে তাকালেন। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন।

বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, 'নাড়ি দেখতে বলছে। দেখুন তো! নইলে কেলেঙ্কারি বাধাবেন।'

পণ্ডিতমশাই নাড়ি দেখতে জানেন না। কিন্তু উপায় নেই। নাড়ি দেখার ভঙ্গিতে বাঁড়ুজ্যেগিন্নির হাতটা ধরতেই নিজের হাত হিম হয়ে গেল। কী ঠান্ডা! চোখ দুটোই-বা অমন নিষ্পলক কেন?

বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, 'নাড়ি টের পাচ্ছেন?'

পণ্ডিতমশাই ভয়ে ভয়ে বললেন, 'পাচ্ছি, আবার পাচ্ছিও না। কিন্তু এঁর হাত দেখছি আপনার চেয়েও ঠান্ডা!'

ফিক করে হেসে বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, 'তা তো হবেই। বুঝলেন না? আমার তিন দিন আগে টেঁসে গেছেন।'

পণ্ডিতমশাই অবাক হয়ে বললেন, 'টেঁসে গেছেন মানে? ওই তো দিব্যি তাকাচ্ছেন। হাত বাড়িয়ে দিলেন!'

'অভ্যেস!' বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, 'ডাক্তার দেখলেই হাত বাড়ানো অভ্যেস। কথায় বলে অভ্যেস যায় না মলে।'

'মলে-মানে মৃত্যু হলে?'

'আবার কী?'

পণ্ডিতমশাই এক-পা, দু-পা করে পিছোতে পিছোতে বললেন, 'তার মানে উনি মড়া?'

'বাসি। আমার চেয়েও তিন দিনের বাসি!'

'সর্বনাশ!'

বাঁড়ুজ্যেমশাই মুচকি হেসে বললেন, 'সর্বনাশ কীসের? যতক্ষণ না আপনার ব্যাগ খুঁজে আনছে ওরা, বসুন এখানে। ততক্ষণ আপনাকে বেহালা বাজিয়ে শোনাই। বসুন, বসুন! ওই দেখুন দেওয়ালে আমার বেহালা ঝুলছে! সাধে কি এমন চুল রেখেছিলুম? বেহালা বাজালে ঠিক এইরকম চুল রাখতে হয়।'

পণ্ডিতমশাই কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'আপনি বেহালা বাজান নাকি?'

'বাজাতুম।' বেহালা পেড়ে নিয়ে বাঁড়ুজ্যেমশাই বললেন, 'যাত্রাদলে বেহালা বাজাতুম।'

'বাজাতুম! তার মানে?'

'দল উঠে গেল।'

'কেন? কেন?'

'আবার কেন? আন্ত্রিক! আন্ত্রিকে গাঁসুদ্ধু লোক...' বাকি কথাটা শোনা গেল না বেহালার ক্যাঁক-কোঁ সুরে। সুরটা কেমন যেন রাতবিরেতে বাঁশ বনের শব্দের মতো, অস্বস্তিকর।

ওদিকে বাঁড়ুজ্যেগিন্নির সেই হাতটা একই অবস্থায় বেরিয়ে উঁচু হয়ে আছে তো আছেই। চোখ দুটো পণ্ডিতমশাইয়ের দিকে। পণ্ডিতমশাই ততক্ষণে যা বোঝবার বুঝে গেছেন। যেই বাঁড়ুজ্যেমশাই বেহালা বাজাতে বাজাতে সুরের আবেশে চোখ বুজেছেন, অমনি তিনি পা টিপে টিপে দরজার কাছে।

বাঁড়ুজ্যেগিন্নি চিঁচিঁ করে বলে উঠলেন, 'পালিয়ে যাচ্ছে যে!'

বাঁড়ুজ্যেমশাই সুরে তন্ময় হয়ে আছেন। শুনতে পেলেন না। সেই সুযোগে পণ্ডিতমশাই পড়ি-কি-মরি করে বাইরে এবং সিঁড়ি দিয়ে অন্ধকারে গড়াতে গড়াতে নীচে।

তারপর বেরিয়েই দৌড়। সেই টাট্টুর মতো দৌড়। একেবারে দিশেহারা।

একটু পরে পেছনে হল্লা শুনলেন, 'ধর! ধর! পালাচ্ছে! ডাক্তার পালাচ্ছে!'

অমাবস্যার রাতে পণ্ডিতমশাই রামনাম জপতে জপতে জল-কাদা ভেঙে দৌড়োতে থাকলেন।...

ভোর হয়ে আসছে।

গায়ে আর এতটুকু জোর নেই পণ্ডিতমশাইয়ের। ধুতি-ফতুয়া কাদায় বিচিত্তির। চুলে কাদা, হাত-পায়ে কাদা। থপ থপ করে পা ফেলে হাঁটছেন। মাঝে মাঝে একটু বসে জিরিয়ে নিচ্ছেন।

দিনের আলো আরও একটু পরিষ্কার হল। কাঁচা রাস্তার দু-ধারে গাছ। ধান খেত। একটা গাছের তলায় কেউ বসে ছিল। তাঁকে দেখা মাত্র 'ওরে বাবা' বলে দৌড়োনোর উপক্রম করল সে।

পণ্ডিতমশাই হাত তুলে চেঁচিয়ে বললেন, 'মানুষ! মানুষ! আমি ভূত নই! মানুষ!'

এক যুবক। পরনের প্যান্ট-শার্টের অবস্থা পণ্ডিতমশাইয়েরই মতো। সে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'মা কালীর দিব্যি?'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মা কালীর দিব্যি!'

যুবক সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বলল, 'আসা হচ্ছে কোথা থেকে?'

'বেহালা-বাজিয়ে বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের বাড়ি থেকে।'

'ওরে বাবা! দিনের বেলা এতদূরেও লোক পাঠিয়েছে!' বলে যুবকটি আবার দৌড়োনোর জন্য পা বাড়াল।

পণ্ডিতমশাই ঝটপট বললেন, 'বাবাজি! তোমায় চিনেছি। তুমিই তাহলে বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের সেই পলাতক জামাই? শোনো, শোনো, আমি সত্যিই মানুষ।'

'তাহলে রামনাম করুন!'

'রাম রাম রাম রাম রাম...'

বাঁড়ুজ্যের জামাই ফিক করে হেসে বলল, 'থাক। থাক। বুঝেছি। তাহলে আপনিই সেই বাঁটুবাবু-ডাক্তার?'

'ধুস! আমি ভেঁটু ভটচাজ। লোকে বলে পণ্ডিতমশাই। বাঁটুডাক্তারের টাট্টু চুরি করেই তো বিপদে পড়েছিলুম!'

'বিপদ তার চেয়ে আমারই বেশি, পণ্ডিতমশাই!' বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের জামাই করুণ মুখে বলল, 'অবস্থা বুঝুন! গাঁসুদ্ধু মড়া। আমার শ্বশুরমশাই, শাশুড়িঠাকরুন পর্যন্ত। অথচ আমাকে নড়তে দেবেন না শ্বশুরমশাই। কারণ আমি যে ঘরজামাই। আমাকে ভিটে আগলাতে হবে।'

এতক্ষণে প্রাণভরে হাসতে পারলেন পণ্ডিতমশাই। বললেন, 'তা বাবাজি, টাট্টুব্যাটাচ্ছেলে কোথায় গেল?'

'বলা কঠিন। অন্ধকারে আমাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে উধাও!'

'চলো, বাবাজি! কথা বলতে বলতে এগোই।'

‘পণ্ডিতমশাই! আমার শ্বশুর-শাশুড়ি আর গাঁয়ের লোক যে ভূত হয়ে রইল?’

পণ্ডিতমশাই বললেন, ‘ভেবো না। গয়ায় তোমাকে নিয়ে গিয়ে পিণ্ডদান করলেই হল। সব পৃথিবী ছেড়ে প্রেতলোকে চলে যাবে। কিন্তু বাবাজি, বউমাকে তো দেখলুম না?’

‘আমার মামাশ্বশুর গয়ার স্টেশনমাস্টার। এখন মনে হচ্ছে, ভাগনির পিণ্ডি দিয়েছেন। তাই আমিও আপনার বউমাকে দেখতে পাইনি।’

এবার পাকা রাস্তার মোড় এসে গেল। রাস্তা চিনতে পেয়ে পণ্ডিতমশাই বললেন, ‘চলো বাবাজি! আপাতত আমার বাড়ি গিয়ে দু-মুঠো খাবে। তারপর দুপুরের ট্রেনে দু-জনে গয়াযাত্রা করব।’

গ্রামের দিঘিতে স্নান করে জল-কাদা ধুয়ে নিয়ে দু-জনে ঘাটে নামলেন। নেমেই পণ্ডিতমশাইয়ের দৃষ্টি গেল ওপারে জলের ধারে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘ওই দেখো! ওই সেই পাষণ্ড পামর চতুষ্পদ হতচ্ছাড়া! রামছাগল!’

বাঁটুডাক্তারের সেই টাট্টুই বটে। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে গম আর ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। সবে রোদ্দুর উঠেছে। বুদ্ধিমান টাট্টু। দিব্যি চান করেও নিয়েছে।

শ্যামখুড়োর কুটির

সেই যারা বাংলা মুল্লুকের পাড়াগাঁয়ে রাতবিরেতের অন্ধকারে নিরিবিলি জায়গায় আলো জ্বেলে কীসব খুঁজে বেড়ায়, এই মার্কিনমুল্লুকে এসেও তাদের দেখা পেয়ে যাব ভাবতেও পারিনি।

তফাতটা শুধু দেখলুম ভাষার। সেই একই রকম তিনটে আলো নিয়ে তিনটে ছায়ামূর্তি জলার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাকিস্বরে এক জন বলল, 'এখানে তো থাকার কথা। গেল কোথায়?'

অন্য জন বলল, 'ভালো করে খুঁজে দেখ না।'

তৃতীয় জন বলল, 'কেউ মেরে দেয়নি তো?'

ভাষাটা ইংরেজি। এমনিতে বেশিরভাগ মার্কিন একটু নাকিস্বরে কথা বলে। এরা তো ভূত। গলার স্বর বেজায় রকমের খোনা।

আমার সঙ্গী বব তেজি ছোকরা। ভূত বিশ্বাস করে না। সকাল-বিকেলে রোজ দেড় মাইল করে জগিং অর্থাৎ দৌড়ব্যায়াম করে। গাড়ি চালায় দুর্ধর্ষ বেগে। সে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো। ওদের ডেকে আনি। মনে হচ্ছে, গাড়িটা ঠেলতে হবে। উনষাট বছর বয়সের এই বুড়োগাড়ির পক্ষে এমনটা হবেই।'

উঁচু হাইওয়ের ডান ঘেঁষে আমাদের গাড়িটা দাঁড় করানো। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। কনকনে হাওয়া বইছে। ঠান্ডায় হিম হয়ে গেছি গাড়ি থেকে নেমেই। দূরে-বহু আলোর ফুটকি দেখা যাচ্ছে। হাইওয়েতে কয়েক ফার্লং অন্তর ল্যাম্পপোস্ট যদিও রয়েছে, আমরা থেমেছি দুই ল্যাম্পপোস্টের মাঝামাঝি জায়গায়।

ইচ্ছে করে কি কেউ থামে? একেই বলে, যেখানে ভূতের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়। বব হাইওয়ের ধারে ঢালু জমির দিকে পা বাড়াচ্ছে দেখে পিছু ডেকে বললুম, 'বব! বব! কথা শোনো!'

বব থেমে বলল, 'কী হল?'

'যাচ্ছ কোথায় তুমি? একটা কথা বলছি, শোনো।'

নীচের দিকে আবছাভাবে একটা জল দেখা যাচ্ছে। নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পড়েছে। ঝিকমিক করে কাঁপছে। সেখানে তিনটে আলো ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। সেদিকে দেখিয়ে বব বলল, 'ওদের ডেকে আনি। তুমি কি একা ঠেলতে পারবে ভাবছ? তুমি তো বাতাসেই উড়ে যাচ্ছ দেখছি।'

বব হাসছিল। বললুম, 'বব! ওরা কারা ভাবছ তুমি?'

বব সেদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'এখানে একটা গোরুর খোঁয়াড় আছে দেখেছি। ওরা খোঁয়াড়েরই লোক হবে। না হলে খামারবাড়ির চাষাভুসো।'

দু-পা এগিয়ে চাপা গলায় বললুম, 'ওরা কী বলাবলি করছিল আমার কানে এসেছে বব।'

এবার বব একটু চমকাল বুঝি। সেও গলা চেপে বলল, 'আমাদের ওপর ওরা হামলা করবে বলছিল নাকি? দেখো, হাইওয়েতে এমন হামলা প্রায়ই হয়। তবে আমাদের কাছে দামি কিছু তো নেই। তা ছাড়া আমার কাছে একটা অটোমেটিক রিভলবার আছে। ভেবো না।'

বললুম, 'না না। আমার ধারণা, ওরা হয়তো মানুষ নয় বব!'

বব অবাক হয়ে বলল, 'মানুষ নয় মানে? তবে ওরা কী?'

'দেখো বব, তাহলে তোমায় অনেক গল্প বলতে হয়।' ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে এবং ভূতঘটিত অস্বস্তিতে ব্যস্তভাবে বললুম, 'বরং হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে থেকেই আমরা কোনো গাড়ি থামিয়ে সাহায্য চাইব।'

বব, রাস্তার দু-দিক ঘুরে দেখে নিয়ে বলল, 'আশ্চর্য তো! এখন কোনো দিক থেকেই গাড়ি আসছে না। এ তো ভারি অস্বাভাবিক ব্যাপার। এটা এক আঃন্তরাজ্য হাইওয়ে। চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ির বিরাম থাকে না। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন?'

'সেজন্যেই তো বলছি, গতিক ভালো নয়। এসো, আপাতত গাড়ির ভেতর ঢুকে সিগারেট টানি। ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না।'

বলে আমি গাড়িতে ঢুকে বসলুম। বব কিন্তু এল না। বলল, 'এদিকে লোকগুলোও চলে যাচ্ছে যে! হ্যাত্তেরি, তোমার কথার নিকুচি করেছে। বসো, এক্ষুনি আসছি।'

সে দৌড়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেল। নীচে জলার ধারের আলো তিনটে ওদিকে উঁচুতে উঠে এগিয়ে যাচ্ছে। কালো টিলামতো উঁচু জায়গার দিকে। একটু পরে কিন্তু তিনটে আলোই মিলিয়ে গেল। তখন বব ফিরে এসে বলল, 'ব্যাটাচ্ছেলেদের অত করে ডাকলুম। শুনতেই পেল না। দেখো দিকি, কী মুশকিলে পড়া গেল! ওহে, এক বার বেরিয়ে একটু ঠেলে দাও না, দেখি কী হয়। এসো এসো।'

অগত্যা বেরোতে হল। বব এক পাশে দাঁড়িয়ে ঠেলতে ঠেলতে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করল, অন্যদিকে আমি কাঁধ লাগালুম। কিন্তু গাড়ি কান্নার মতো শব্দ করতে থাকল শুধু। স্টার্ট নিল না। এই সেকেলে ১৯২১ সালের মডেল ভিনটেজ গাড়িটা তবু মায়াবশে বব ছাড়তে নারাজ।

হতাশ হয়ে বব অন্ধকারে সেই কালো টিলাটার দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সময় দেখলুম, এবার তিনটে নয়, মোটে একটা আলো নেমে আসছে জলার দিকে। আলোটা

জলা অবধি এসে একবার থামল। তারপর আমাদের দিকে উঠতে থাকল। অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। কিন্তু বব নেচে উঠল প্রায়। সে জোর গলায় ডেকে বলল, 'ওহে লোকটা, আরও একটু পা চালিয়ে এসো দিকি! বড্ড বিপদে পড়েছি আমরা।'

আলোটা ঢালু জায়গায় থেমে গেল। তারপর খনখনে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমরা? হয়েছেটা কী?'

বব বলল, 'গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না। একটু ঠেলে দিলে বোধ হয় নেবে।'

'আমার অত সময় নেই। কর্তার কুকুরের লেজ হারিয়ে গেছে। খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'কী হারিয়েছে বললে?'

'লেজ।' বলে আলোওয়ালা ছায়ামূর্তিটা গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা পেরোতে থাকল।

বব হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি তো ভারি রসিক লোক দেখছি!'

আলোওয়ালা বলল, 'রসিকতা কী বলছ? প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কর্তার যা মেজাজ। জিমের লেজ খুঁজে না আনলে চাকরি চলে যাবে।'

আলোওয়ালা রাস্তার ওধারে গিয়ে মাঠে নামল। বব বলল, 'উঁহু উঁহু! এভাবে রাত কাটানোর মানে হয় না। তুমি অপেক্ষা করো, আমি ওর কর্তার কাছে গিয়ে সাহায্য চাই।'

আমি তো ভুক্তভোগী যাকে বলে। বাংলার পাড়াগাঁয়ে একবার ঠিক এমন আলোওয়ালাদের পাল্লায় পড়ে যা ভুগেছিলুম কহতব্য নয়। এটা তো বিদেশবিভুঁই। একা এখানে থাকি, আর যে আলোওয়ালাটা সদ্য ওধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাকে বাগে পেয়ে ঘাড় মটকাক আর কি! তাই বললুম, 'চলো বব। তোমার সঙ্গে আমিও যাই।'

বব খুশি হয়ে বলল, 'এসো।'

মনে একটা ভরসা হচ্ছে, দু-জন একসঙ্গে থাকলে ওরা সুবিধে করতে পারবে না। তা ছাড়া ববের গায়ে অসুরের জোর আছে। পকেটে রিভলবারও আছে, রিভলবারের গুলিতে ওদের ক্ষতি কিছু না হোক, আমরা অন্তত মনে সাহস পাব। রাতবিরেতে ভয় পেলে আওয়াজ একটা মোক্ষম দাওয়াই কিনা। সেজন্যেই নিয়ম আছে ভয় পেলে জোরে গান গাইতে হয় কিংবা আপন মনে কথা বলতে হয়। সাহস ছাড়া ভূতপ্রেতকে হারানোর আর কোনো উপায় নেই। ভয় পেয়েছি টের পেলেই ওরা ঘাড়টি মটকে দেবে। কাজেই ভূতের পাল্লায় পড়লেই হাবেভাবে দেখাতে হবে তুমি ভীষণ সাহসী। তাহলে উলটে ভূতই ভয় পেয়ে পালাবে।

জলার ধার দিয়ে নরম ঘাসে-ঢাকা টিলায় উঠতে উঠতে বললুম, 'রিভলবারটা তৈরি রেখো কিন্তু। কিছু বলা যায় না।'

বব বলল, 'না না। এরা চাষাভুসো লোক। বড্ড গোবেচারা।'

'বব, কুকুরের লেজ খোঁজাখুঁজির ব্যাপারটা নিয়ে তোমার মনে সন্দেহ জাগছে না?'

'ওটা তো রসিকতা। তুমি মার্কিন চাষাভুসোদের হালচাল জান না। এরা ভারি রসিক।'

'যে কর্তার কথা বলল, সে রসিক না হতেও পারে।'

'চলো তো, দেখি লোকটা কেমন।' বলে বব জগিংয়ের ভঙ্গিতে টিলাটা বেয়ে উঠতে থাকল।

আমার হাঁপ ধরে যাবার দাখিল। তবে শিগগির থামতে হল আমাদের। সামনে ঘন গাছপালা। ততক্ষণে অন্ধকারে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়েছে। একফালি পথ খুঁজে পেলুম। পথ ধরে একটু এগোলে কুকুরের ডাক শোনা গেল।

কুকুরের ডাকটা সত্যি বলেই মনে হচ্ছিল আমার। ভূতদের কুকুর থাকতেও পারে। কিন্তু তারা কখনো ডাকে বলে শুনিনি। যত এগোচ্ছি, কুকুরটার হাঁকডাক তত বেড়ে যাচ্ছে। সামনে আবছা একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কোনো আলো নেই। এমন তো হবার কথা নয়। এদেশে বিদ্যুৎ ছাড়া চলে না। শুধু আলো নয়, হাজার রকমের দরকারি কাজে বিদ্যুৎ লাগে।

বব বলল, 'ভারি অদ্ভুত তো! মনে হচ্ছে, বাড়ির ভেতর কুকুরটাকে বেঁধে রেখে বাড়ির লোকেরা কোথায় বেরিয়েছে। কিন্তু আলো নেই কেন?'

এবার ফিসফিস করে বললুম, 'বব। সেজন্যেই তো তখন বলছিলুম, এরা মানুষ নয়।'

বব আমার কথা শুনে হেসে উঠল। 'তখন থেকে তুমি মানুষ নয়, মানুষ নয় করছ কেন বলো তো?'

আসল কথাটা বলতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ বাড়ির সবগুলো আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। কুকুরের ডাকটাও থেমে গেল। সামনে সুন্দর একটা কাঠের বাড়ি দেখতে পেলুম। ছোট্ট লনে একটা ফুলবাগিচাও দেখলুম। বব দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় উঠল এবং দরজায় নক করল। আমি লনে দাঁড়িয়ে আলো-অন্ধকারে চোখ বুলিয়ে বিপজ্জনক কিছু আছে কি না খুঁজতে থাকলুম।

দরজা ফাঁক করে এক বুড়ো ভদ্রলোক উঁকি মেরে বললেন, 'কী চাই?'

বব সবিনয়ে বলল, 'দেখুন, আমরা আসছিলুম সিডার র‍্যাপিড এয়ারপোর্ট থেকে। এক বন্ধুকে প্লেনে তুলতে গিয়েছিলুম। ফেরার পথে গাড়িটা বিগড়ে গেছে।'

বুড়ো নির্বিকার মুখে বললেন, 'তা আমি কী করতে পারি?'

'দয়া করে যদি আপনার লোকেদের একটু বলেন...'

কথা কেড়ে ভদ্রলোক বললেন, 'আমার লোকেরা সবাই এখন কাজে বেরিয়েছে।'

রাগী বব খাপ্পা হয়ে বলল, 'কুকুরের লেজ খুঁজতে বুঝি?'

আশ্চর্য ভদ্রলোক খিক খিক করে হাসলেন। 'তাহলে তো জানই দেখছি। আমার জিমের ওই এক দোষ, বুঝলে? বেড়াতে গিয়ে একটা-না-একটা কিছু কোথাও ফেলে আসবেই প্রত্যেক দিন। আজ তো লেজ ফেলে এসেছে। কাল এসেছিল সামনের বাঁ-ঠ্যাংটা ফেলে। হতভাগা খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরছিল। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেল একটা ওক গাছের মাথায়।'

বব রাগ চেপে বলল, 'উড়ে গিয়ে আটকে ছিল বুঝি?'

'না, না।' বুড়ো খুব হাসলেন। 'দুষ্টু বাজপাখির কাজ। ভাগ্যিস, পরদিন খাবে বলে বাসায় রেখে দিয়েছিল। নইলে জিম খোঁড়া হয়ে থাকত।'

বলেই বুড়োর চোখ পড়ল আমার দিকে। বললেন, 'ওটা কে?'

চটপট বললুম, 'আমি ভারতের লোক। এদেশে বেড়াতে এসেছি।'

দরজাটা পুরো খুলে ভদ্রভাবে বেরোলেন। মস্ত আলখাল্লার মতো কালো ওভারকোট গায়ে চাপানো। লম্বাটে চেহারা। নাকটা অসম্ভব খাড়া আর লম্বা। কোটরগত ছোট্ট দুটো চোখ। ভুরু, চুল, দাড়ি সব সাদা। হাত বাড়িয়ে বললেন, 'স্বাগত, সুস্বাগত! তুমি ভারতের লোক। এসো এসো। ভেতরে এসো। কী সৌভাগ্য আমার, এতকাল পরে একজন ভারতের লোক পাওয়া গেল। এসো, তোমায় আমার বড্ড দরকার।'

বব তো হতভম্ব। কিন্তু বাইরে কনকনে ঠান্ডায় ততক্ষণে রক্ত যেন জমে গেছে। ভূত হোক, আর প্রেতই হোক, ঘরের ভেতর ঢোকাটাই এখন জরুরি।

ভেতরটা সেকেলে আসবাবে ঠাসা। একপাশে ফায়ারপ্লেসও রয়েছে সাবেকি রীতিতে। কানট্রি এলাকায় মার্কিনদের ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা সত্ত্বেও শখ করে ওরা সেকালের মতো ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালে এবং সেখানে বসে গল্পসল্প করে।

বব গুম হয়ে বসে রইল। ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম স্যাম বানভিল। এই এলাকায় লোকে আমাকে আংকল স্যাম-শ্যাম খুড়ো বলে ডাকে। হুম! আগে কফি খাও। পরে কথাবার্তা হবে।'

দুধ চিনি ছাড়া কালো কফি খেতে আমি ততদিনে অভ্যস্ত। কিন্তু মুখে দিয়েই বুঝেছি, গণ্ডগোল আছে। রুমাল বের করে মুখ মোছার ছলে তরল পদার্থটুকু পাচার করে দিলুম। তারপর আড়চোখে দেখি, বব কাপ থেকে বাঁ-হাতের দুই আঙুলে সরু কী একটা টেনে তুলল। তুলে বলল, 'এটা কী শ্যামখুড়ো? বাজ পাখিটার আঙুল নাকি?'

শ্যামখুড়ো চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন, 'না, না। ঘাসফড়িং।'

বব বলল, 'চীনে পাখির বাসার ঝোল রান্না করে খায় শুনেছি। ঘাসফড়িং সেদ্ধ করে কফি খাওয়ার কথা জানা ছিল না। আশা করি ডিনারে আপনি ছুঁচোর রোস্ট এবং প্যাঁচার পালকের স্যালাড খেয়েছেন?'

শ্যামখুড়ো খিক খিক করে হেসে বললেন, 'তোমাদের আমি ডিনার খাওয়াতে পারতুম। তুমি ঠিকই ধরেছ।'

বাঁচা গেল। মার্কিনরা রাতের খাওয়াটা সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেয়। কাজেই আমি আর বব শ্যামখুড়োর কাছে যদি ওই সময় আসতুম, কী খেতে হত ভেবে শিউরে উঠলুম। বব কফির কাপটা রেখে দিয়েছে ততক্ষণে। খুড়ো আপন খেয়ালে বসে বসে দুলছেন। নইলে নিশ্চয় আপত্তি করতেন এবং গিলতে বাধ্য করতেন। দেখাদেখি আমিও কাপটা রেখে দিলুম।

এইসময় একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে খুড়োর পায়ের কাছে বসল। অবাক হয়ে দেখলুম, তার লেজটা পুরোপুরি বাদ। লেজের জায়গায় একটা গর্ত মতো রয়েছে। কুকুরটার নীল জ্বলজ্বলে চোখ। সেই চোখে আমায় দেখছে দেখে ভীষণ ভড়কে গেলুম। কিন্তু ভড়কালে চলবে না। সাহস চাই, প্রচুর সাহস।

বব কুকুরটাকে দেখে বলল, 'খুড়ো আশা করি জিমকে কুকুরের স্বাভাবিক খাদ্য খাওয়ান?'

শ্যামখুড়ো জবাব দেবার আগেই জিম করল কী, যেন ববকে দেখাবার জন্য মুখ বাড়িয়ে ফায়ারপ্লেস থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠের ঠুকরো কামড়ে নিল। তারপর মুখ কাত করে হাড় চিবোনোর ভঙ্গিতে চিবোতে শুরু করল। অঙ্গারের কুচি চিড়বিড় করে ছিটকে পড়তে থাকল।

এতক্ষণে বব ভীষণ চমকে উঠল এবং তার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। শ্যামখুড়োর চোখে পড়লে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'ঃআ জিম! খায় না, ছিঃ খায় না! বদহজম হবে। তখন সেদিনকার মতো ঘোড়ার নাদির গুলি গিলতে হবে।'

জিম বারণ মানল। হয়তো ঘোড়ার নাদির গুলি গিলতে হবে বলেই। এবার শ্যামখুড়ো আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হুম। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করা যাক। হ্যাঁ হে, তোমরা ভারতীয়রা নাকি অনেকরকম গুপ্তবিদ্যা জান-মানে, অকালটের কথাই বলছি। একটু নমুনা দেখাও না আমায়?'

'খুড়োমশাই, আমি তো কিছু জানি না।' করুণ মুখভঙ্গি করে বললুম। আড়চোখে লক্ষ করলুম, ববের ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসি ফুটেছে। আমার অবস্থা দেখেই হয়তো-বা।

শ্যামখুড়ো বললেন, 'জানিনে বললে ছাড়ছিনে বাপু। বলি, আপত্তিটা কীসের? বিদ্যা তো অপরের কাছে জাহির করার জন্যই। বিদ্যা জেনে কি কেউ ঘরে চুপচাপ মুখ বুজে বসে থাকে। কই, ঝাড়ো একখানা নমুনা। ধরো, শূন্যে মাটিছাড়া হয়ে বসা-কিংবা জ্বলন্ত আগুনে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকা। যেকোনোটা।'

বেগতিক দেখে বব বলল, 'বরং তোমার তাসের ম্যাজিকটা দেখাতে পার খুড়োকে।'

খুড়ো ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ম্যাজিক? ম্যাজিক কে দেখতে চেয়েছে হে ছোকরা?'

তেজি বব বলল, 'সবই তো ম্যাজিক। ওই যে অকালট না ফকালট না গুপ্তবিদ্যার কথা বললেন, তা স্রেফ ম্যাজিক ছাড়া কী! একটু আগে আপনার জিমের আগুন খাওয়াটাও তাই। আপনি আসলে একজন ম্যাজিশিয়ান। তা কি বুঝিনি?'

'কী বললে? কী বললে? কী বললে?' শ্যামখুড়ো রাগের চোটে সটান উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনি ম্যাজিশিয়ান।' বব অকুতোভয়ে বলল।

আমি ববের দিকে বারবার চোখ টিপছি। এ বিপদের সময় তর্ক করতে নেই। গোঁয়ার বব আমার দিকে তাকাচ্ছেই না। এদিকে শ্যামখুড়ো দাঁত কিড়মিড় করে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। গুলি গুলি চোখ দুটো থেকে দেখতে পাচ্ছি, স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে। তবু হাঁদারাম বব কিছু আঁচ করছে না।

হঠাৎ লিকলিকে আঙুল তুলে খুড়ো চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও!'

'যাচ্ছি!' বলে বব উঠে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

আমি উঠতে যাচ্ছি, খুড়ো আমার কাঁধ চেপে বসিয়ে দিলেন। সারা গা হিম হয়ে গেল। কিন্তু খুড়োর মুখে মিঠে হাসি ফুটেছে তক্ষুনি। বুড়ো আঙুল তুলে ববের উদ্দেশে বললেন, 'কিস্সু জানে না ও ছোকরা। কখনো ওর সঙ্গে আর মিশো না। তার চেয়ে তুমি আমার কাছে থেকে যাও।'

মৃদু আপত্তি করে বললুম, 'পরে সময় করে আসব খুড়ো। এখন বরং আমায় যেতে দিন।'

'এই ঠান্ডার রাতে কোথায় যাবে বাবু?' শ্যামখুড়ো সস্নেহে বললেন, 'পাশের ঘরে আরাম করে ঘুমোতে পারবে। যাকগে, যা নিয়ে কথা হচ্ছিল। কই, শূন্যে বসে থাকাটাই একটু দেখাও।'

অগত্যা বললুম, ‘যখন-তখন এ বিদ্যা প্রকাশ করতে নেই খুড়ো। শাস্ত্রে নিষেধ আছে। তিথি-নক্ষত্র এসব দেখে তবে না। পাঁজি দেখে দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে।’

খুড়ো বললেন, ‘তাই বুঝি? ঠিক আছে। তাহলে ওই তো আগুন রয়েছে। অন্তত আগুনে পিঠ রেখে শোওয়াটা একবার দেখাও। ওঠো, দেরি কোরো না। টম ডিক হ্যারি এক্ষুনি এসে পড়বে। ওরা এলে আমার অন্য সব কাজকর্ম আছে। তখন আর ফুরসত পাব না। ওঠো, ওঠো।’

আগুনটাও এসময় ফায়ারপ্লেসে কেন কে জানে, দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। আঁতকে উঠলুম। শ্যামখুড়ো লিকলিকে আঙুলে আমাকে খোঁচাতে শুরু করেছেন। পাঁজি-তিথি-নক্ষত্রের কথা তুলব কী, ক্রমাগত পাঁজরে ও পেটে খোঁচা খেয়ে কাতুকুতু লাগছে। হি-হি করে হাসি পেয়ে গেল শেষ অবধি। তখন শ্যামখুড়োও হি-হি করে হাসতে হাসতে কাতুকুতুটা বাড়িয়ে দিলেন।

কাতুকুতুর চোটে ফায়ারপ্লেসে গিয়ে ছিটকে পড়ি আর কি, হঠাৎই হইহই করে দরজা খুলে তিনটে লোক ঢুকল। তিন জনের হাতেই তিনটে অদ্ভুত লণ্ঠন। হ্যাঁ, এরাই জলার ধারের সেই তারা। শ্যামখুড়ো আমায় ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘পাওয়া গেল?’

টম, হ্যারি, ডিক তুমুল কোলাহল করে জবাব দিল, ‘পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে।’

শ্যামখুড়ো বেজায় খুশিতে নাচতে নাচতে বললেন, ‘কোথায় পেলি?’

ওরা কোরাস গাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, ‘ভোঁদড়ের গর্তে।’

‘কাল ব্যাটাকে দেখব। এখন আয় তোরা, জিমকে ধর। লেজটা পরিয়ে দিই।’

চার জনে জিমকে নিয়ে ব্যস্ত হল। আর সেই সুযোগে আমি ফুড়ুৎ করে কেটে পড়লুম দরজা গলিয়ে। তারপর দৌড়, দৌড়, দৌড়। অন্ধকারে কত বার ঠোক্কর খেলুম। রাস্তায় গড়িয়ে পড়লুম। শিশিরে কাদায় পোশাকের অবস্থা যা হল, বলার নয়।

হাইওয়েতে পৌঁছে ভাগ্যিস গাড়িটা পাওয়া গেল। ভেতরে বব নির্বিকার ঘুমোচ্ছিল। ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, ‘শুয়ে পড়ো। সকাল অবধি উপায় নেই।’

হাইওয়েতে পুলিশের টহলদারি আছে। শেষরাতে তাদের ডাকে ঘুম ভেঙেছিল। গাড়ির অবস্থা দেখে তাদের অফিসার ববকে বলেছিল, ‘এই ভিনটেজ মালটা ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে নতুন একটা কেনো।’ বব তাতে রাজি। তাদের গাড়িতেই আমাদের লিফট দিয়েছিল।

পথে বব হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল, ‘গাড়ি খারাপ হওয়া জায়গাটার ওখানে টিলার ওপর কে থাকেন বলুন তো? ভারি অদ্ভুত লোক।’

অফিসার চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন, ‘গাঁজা খাও নাকি?’

বব খাপ্পা। ‘সিগারেট খাওয়া নিশ্চয় গাঁজা খাওয়া নয়।’

অফিসার একটু হেসে বলেছিলেন, ‘ও জায়গাটার নাম আংকল স্যামস কেবিন। শ্যামখুড়োর কুটির। বিখ্যাত বই আংকল টমস কেবিনের অনুকরণ। ওখানে স্যাম নামে একটা লোক থাকত। ভাঙা বাড়িটার সামনে তাঁর কবর দেখেছি। ফলকে মৃত্যু সাল লেখা আছে ১৮৭৫।’

বব আমার দিকে চোখ টিপে, কেন কে জানে, শুধু মুচকি হেসেছিল। আমি হাসিনি। ফোঁস করে বড়ো রকমের একটা নিশ্বাস ফেলেছিলুম। কারণ এই নিয়ে দু- বার ফাঁড়া গেছে। এক বার বাংলামুল্লুকে, আর একবার মার্কিনমুল্লুকে। তফাতটা শুধু ভাষায়।...

অন্ধকার রাতবিরেতে

কেকরাডিহি যেতে হলে ভামপুর জংশনে নেমে অন্য ট্রেনে চাপতে হবে। কিন্তু ভামপুর পৌঁছোতেই রাত এগারোটা বেজে গেল। ট্রেন ঘণ্টা ছয়েক লেট। খোঁজ নিয়ে জানলুম, কেকরাডিহি প্যাসেঞ্জার রাত ন-টায় ছেড়ে গেছে। পরের ট্রেন সেই ভোর সাড়ে পাঁচটার আগে নয়।

কনকনে ঠান্ডার রাত। এরই মধ্যে জংশন স্টেশন একেবারে ঝিম মেরে গেছে। তা ছাড়া, তেমন কিছু বড়ো জংশনও নয়। লোকজনের ভিড় এমনিতে কম। চায়ের দোকানি ঘুম ঘুম গলায় পরামর্শ দিল, 'পাঁচ লম্বর পেলাটফরমে কেকরাডিহির টেরেন রেডি আছে। চোলিয়ে যান। আরামসে শুত করুন।'

শুনে তো লাফিয়ে উঠলুম আনন্দে। ওভারব্রিজ হয়ে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দেখি সত্যি তাই। ইঞ্জিনবিহীন একটা ট্রেন কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্ল্যাটফর্মে জনমানুষটি নেই। মাথার ওপর ছাউনি বলতেও কিছু নেই। একফালি চাঁদ নজরে পড়ল, শীতে তার চেহারাও খুব করুণ।

কিন্তু যে কামরার দরজা খুলতে যাই, সেটাই ভেতর থেকে আটকানো। জানালাগুলোও বন্ধ। বুঝলুম ভেতরে বুদ্ধিমান লোকগুলো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রচুর লোক জমে উঠেছে। দরজা খুলে তা বরবাদ করার ইচ্ছে নেই কারুর। অবশ্য চোর-ডাকাতের ভয়ও একটা কারণ হতে পারে। দরজা টানাটানি করে কোথাও কোনো সাড়া পেলুম না।

হন্যে হয়ে শেষদিকটায় গিয়ে শেষ চেষ্টা করলুম। তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। চ্যাঁচামেচি করে বললুম, 'দরজায় বোমা মেরে উড়িয়ে দেব বলে দিচ্ছি। আমার কাছে বোমা আছে কিন্তু!'

এই শাসানিতেই যেন কাজ হল। একটা জানলা একটু খুলে গেল। তারপর ভারী গলায় কে বলল, 'কী আছে বললেন?'

কথাটা চেপে গিয়ে বললুম, 'আহা, দরজাটা খুলুন না। ঠান্ডায় জমে গেলুম যে!'

ভেতরের লোকটি বলল, 'বোমা না কী বলছিলেন যেন?'

‘আরে না, না!’ হাসবার চেষ্টা করে বললুম, ‘ওটা কথার কথা! দয়া করে দরজাটা খুলে দিন।’

‘মাথা খারাপ মশাই? বোমাওয়ালা লোককে ঢুকিয়ে শেষে বিপদে পড়ি আর কি! বোমা মারতে হয়, অন্য কামরায় গিয়ে মারুন। আমি ঝামেলা ভালোবাসি না।’

লোকটা জানলার পাল্লা নামিয়ে দিল দমাস শব্দে। অদ্ভুত লোক তো! রাগে-দুঃখে অস্থির হয়ে কী করব ভাবছি, সেই সময় গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখলুম। এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় গুনগুনিয়ে গান গেয়ে কেউ আমারই মতো এক বগি থেকে আরেক বগি পর্যন্ত ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছেন বুঝি। মিটমিটে আলোয় লোকটির চেহারা নজরে এল। ঢ্যাঙা, হনুমান টুপিপরা লোক। গায়ে আস্ত কম্বল জড়ানো। লম্বা বিরাট একটা নাক ঠেলে বেরিয়েছে মুখ থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল আমাকে দেখে। তারপর খিখি করে হাসল। ‘ঢোকার ছিদ্র পেলেন না বুঝি? মশাই, এ লাইনের ব্যাপারই এরকম। সেজন্য সুচ হয়ে ঢুকতে হয়। তারপর দরকার হলে ফাল হয়ে বেরোন না কেন?’

কথার মানে কিছু বুঝলুম না। পাগল-টাগল নয়তো? আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বলল, ‘আপনি দেখছি একেবারে কচি খোকা! বুঝলেন না কথাটা?’

ঠান্ডার রাত। জনহীন প্ল্যাটফর্মে পাগলকে ঘাটানো উচিত হবে না। বললুম, ‘বুঝলুম বই কী!’

‘কচু বুঝেছেন! এই দেখুন, সুচ হয়ে কেমন করে ঢুকতে হয়।’ বলে লোকটার সামনেকার একটা জানলা খামচে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ওপরে ওঠাল।

তারপর আমাকে হকচকিয়ে দিল বলা যায়। জানলায় গরাদ আছে। অথচ কী করে সে তার অতবড়ো শরীরটা নিয়ে ভেতরে গলিয়ে গেল কে জানে! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কিন্তু তারপরেই ভেতরে গণ্ডগোল বেধে গেছে। আগের লোকটা চেঁচিয়ে উঠেছে খ্যানখেনে গলায়, ‘এ কী মশাই! এ কী করছেন? একী! একী! আরে...’

এবং কামরার দরজা প্রচণ্ড শব্দে খুলে গেল। সম্ভবত আগের লোকটাই বোঁচকাবুঁচকি বিছানাপত্র নিয়ে একলাফে নীচে এসে পড়ল। তারপর দুদ্দাড় শব্দ করে ওভারব্রিজের সিঁড়ির দিকে দৌড়োল।

দেখলুম, একটা বালিশ ছিটকে পড়েছে প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু আর ফিরেও তাকাল না এদিকে। এবার সুচ-হওয়া লোকটিকে দেখতে পেলুম দরজায়। খিক খিক করে হেসে বলল, ‘বেজায় ভয় পেয়ে গেছে। যাক গে, ভালোই হল। আসুন, আসুন। এক্ষুনি আবার কেউ এসে হাজির হবে। আর শুনুন, ওই বালিশটা কুড়িয়ে নিয়ে আসুন। আরামে শুতে পারবেন।’

বালিশটা কুড়িয়ে নিলুম। ঠিকই বলেছে। বালিশটা শোওয়ার পক্ষে আরামদায়কই হবে। এর মালিক যে আর এদিকে এ রাতে পা বাড়াবে না, সেটা বোঝাই যায়। ব্যাপারটা যাই হোক, ভারি হাস্যকর তো বটেই।

কামরার ভেতরটা ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। লোকটা দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে ছিটকিনি নামিয়ে আটকে দিল। দেশলাই জ্বেলে একটা খালি বার্থে বসে পড়লুম। লম্বানেকো লোকটা বসল পাশের বার্থে! তারপর আগের মতো খিক খিক করে হেসে বলল, ‘খুব জব্দ হয়েছে। একা পুরো একটা কামরা দখল করে বসেছিল ব্যাটাচ্ছেলে!’

আমিও একচোট হেসে বললুম, 'ডাকাত ভেবেই পালিয়েছে, বুঝলেন।'

'উঁহু ডাকাত ভাবেনি। অন্য কিছু ভেবে থাকবে।'

'কিন্তু আপনি গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকলেন কী করে বলুন তো?'

'কিচ্ছু কঠিন নয়। সে আপনিও পারেন। তবে তার আগে আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে।'

আগ্রহ দেখিয়ে বললুম, 'কী কষ্ট?'

লোকটা অন্ধকারে অদ্ভুত শব্দে হাই তুলে বলল, 'যাকগে ওসব কথা। বললেও কি আপনি সে কষ্ট করবেন?'

'কেন করব না? অমন সরু ফাঁক গলিয়ে ঘরে ঢোকাটা যে ম্যাজিক মশাই। আমার ধারণা, আপনি একজন ম্যাজিশিয়ান।'

'তা বলতে পারেন। তবে আমার এখন ঘুম পাচ্ছে।'

অন্ধকারে নড়াচড়ার শব্দ হল। বুঝলুম ম্যাজিশিয়ান লোকটা শুয়ে পড়ল। বালিশটা পেয়ে আমার ভালোই হয়েছে। আমিও শুয়ে পড়লুম। কিন্তু অন্ধকারটা অসহ্য লাগছিল। দম আটকে যাবার দাখিল। তা ছাড়া, বদ্ধ জায়গায় শোবারও অভ্যাস নেই। তাই একটু পরে উঠে পড়লুম। মাথার কাছের জানলাটা যেই ওঠাতে গেছি, লোকটা হাঁ হাঁ করে উঠল। 'করেন কী, করেন কী। সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনোর মতো লোকের অভাব নেই বুঝতে পারছেন না? অসুবিধেটা কীসের?'

'দেখুন, বদ্ধ ঘরে আমার দম আটকে যায়। বরং একটু ফাঁক করে...'

কথা কেড়ে লোকটা খাপ্পা মেজাজে বলল, 'ধ্যাত মশাই! বললুম না? আবার কে এসে ঢুকবে, তখন আমারই ঝামেলা হবে। আপনার আর কী! বন্ধ করুন বলছি।'

অগত্যা ফের শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুমের দফারফা হয়ে গেছে। বদ্ধ ঘরের অন্ধকারে অস্বস্তি, তার ওপর প্রচণ্ড হিমকাঠ পিঠের তলায়। সঙ্গে গরম চাদরও নেই। প্যান্ট-কোট হিমে বরফ হয়ে গেছে। পাশের লোকটার গায়ে কম্বল। তাই আরামে ঘুমোচ্ছে। নাকও ডাকছে!

কতক্ষণ পরে চুপিচুপি উঠে বসলুম। হাত বাড়িয়ে মাথার কাছের জানলার পাল্লাটা প্রায় নিঃশব্দে ঠেলে ইঞ্চি-দুই ফাঁক করে রাখলুম। তারপর শুয়ে পড়লুম ফের। এবার বদ্ধ ঘরের সেই অস্বস্তিটা কেটে গেল।

হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কখন। হঠাৎ কী একটা দুদ্দাড় শব্দে উঠে বসলুম দুড়মুড় করে। কামরা আগের মতো ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। জানলার সেই ফাঁকটা আর নেই। কিন্তু ভেতরে কোথায় একটা ধস্তাধস্তি বেধেছে যেন। 'কে, কে' বলে চেঁচিয়ে উঠে দেশলাই হাতড়াতে থাকলুম। খুঁজে পাওয়া গেল না। ওদিকের দরজাটা দমাস করে খুলে গেল। বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। কে যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল। তারপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমার পাশের বার্থে কেউ এসে বসল। বললুম, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'কিচ্ছু না। আপনি শুয়ে পড়ুন। কেকরাডিহি লাইনে এমন হয়েই থাকে।'

কণ্ঠস্বর শুনে একটু চমকে উঠলুম। পাশের বার্থের লোকটার গলার স্বর ছিল একটু খ্যানখেনে। এটা কেমন গুরুগম্ভীর যেন। দেশলাইটা খুঁজে পাওয়া গেল এতক্ষণে। সিগারেট ধরানোর ছলে কাঠি জ্বেলে সেই মিটমিটে আলোয় যাকে দেখলুম, সে অন্য

লোক। তবে তার গায়ের কম্বলটা আগের লোকেরই মনে হচ্ছে। এ লোকটার নাক বেজায় চ্যাপটা। তা ছাড়া, মুখে একরাশ গোঁফ-দাড়ি। মাথার টুপিটাও অন্যরকম। গম্ভীর স্বরে বলল, 'কী দেখছেন?'

অবাক হয়ে বললুম, 'আগের ভদ্রলোক কোথায় গেলেন বলুন তো?'

'কেন? আমাকে কি সঙ্গী হিসেবে পছন্দ হচ্ছে না?'

'না না-মানে, বলছিলুম কী, আপনিও কি জানলার ফাঁক গলিয়ে ঢুকেছেন?'

'ঠিক তাই। বুঝলেন না? যা ঠান্ডা পড়েছে!'

'তা পড়েছে। কিন্তু আপনিও দেখছি একজন ম্যাজিশিয়ান।'

'তা বলতেও পারেন।'

'আগের ভদ্রলোক কোথায় গেলেন?'

হ্যা হ্যা করে হেসে নতুন সঙ্গী বলল, 'বেজায় ভয় পেয়ে পালিয়েছে। ব্যাটাচ্ছেলে কাতুকুতুতে ওস্তাদ। কিন্তু আমি কী করি জানেন তো? কামড়ে দিই। আপনি?'

'আমি? আমি কিছুই পারি না।' বলে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। সিগারেটের আগুনে ঘড়ির কাঁটা দেখে নিলুম। দুটো পাঁচ। আর ঘণ্টা তিনেক এসব উপদ্রব সহ্য করে কাটাতে পারলে আর চিন্তা নেই। ঘুম আর এসে কাজ নেই।

পাশের নতুন সঙ্গীর কিন্তু নড়াচড়ার শব্দ নেই। শুয়ে পড়লে টের পেতুম।

তাই একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ওই যে বলল কামড়ে দেওয়ার স্বভাব আছে। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে দেবে না তো? ভাব করার জন্যে বললুম, 'কী? শুতে ইচ্ছে করছে না?'

প্রকাণ্ড হাই তোলার শব্দ করে বলল, 'নাঃ। আপনি ঘুমোন।'

'ঘুম আসছে কই? বদ্ধ ঘরে আমার দম আটকে যায়। সম্ভবত, জানলা খুললে আপনারও আপত্তি হবে। কাজেই...'

'না, না। আপত্তির কারণটা বুঝলেন না? আবার কেউ ঢুকে গণ্ডগোল বাধাবে যে।'

'আগের ভদ্রলোক বলছিলেন, জানলার গরাদ গলিয়ে ঢোকা শিখতে হলে নাকি একটু কষ্ট করতে হবে। কিন্তু কষ্টটা কী, সেটা চেপে গেলেন। আপনি বলতে পারেন ব্যাপারটা কী?'

'খুব পারি। তবে আপনি ভয় পাবেন যে!'

'মোটেও না। দেখুন না, আমি কি ভয় পেয়েছি?'

হ্যা হ্যা করে হাসল সে। 'যাক ওসব কথা। আপনার সিগারেট খাওয়া দেখে লোভ হচ্ছে। একটা সিগারেট দিন, টানি।'

সিগারেট দিয়ে দেশলাই কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দিতে গিয়ে আবার চমকে উঠলুম। আরে, এ তো সেই গোঁফ-দাড়িওলা লোকটা নয়। কুমড়োর মতো মুখ, চকচকে টাক-এ আবার কখন এল?

কিন্তু তক্ষুনি গণ্ডগোল বেধে গেল। পাশ থেকে কে চ্যাঁচামেচি করে বলল, 'এই মশাই। আমার সিগারেট আপনি টানছেন যে। জিজ্ঞেস করুন তো ওঁকে, কে সিগারেট চাইল।'

ফস করে আবার কাঠি জ্বাললুম দেখি, গোঁফ-দাড়িওয়ালা লোকটি কুমড়োমুখো লোকটির পাশে বসে আছে। তার মুখে-চোখে রাগ ঠিকরে বেরোচ্ছে। ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, 'কী মুশকিল। আপনি আবার কীভাবে ঢুকলেন?'

নতুন লোকটি অদ্ভুত হেসে বলল, 'আমি আগে থেকেই ছিলুম। অনেকক্ষণ থেকে সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছিলুম। সাহস করে আসতে পারছিলুম না। এ ভদ্রলোকের যে কামড়ে দেওয়া অভ্যেস।'

গোঁফ-দাড়ি হেঁড়ে গলায় বলল, 'এবার যদি কামড়ে দিই।'

'সিগারেটের ছ্যাঁকা দেব। আসুন না কামড়াতে।'

বিবাদ মিটিয়ে দিতে বললুম, 'আহা, ঠান্ডার রাতে কামড়াকামড়ি ভালো কাজ নয়। নিন, আপনিও একটা সিগারেট নিন।'

আমি আবার পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। চোখ দুটো পাশের বার্থের দিকে। দুটো সিগারেট জ্বলজ্বল করে জ্বলছে অন্ধকারে। এবার কেন কে জানে, ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে যাচ্ছিল। তারপর কখন সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছি।

হইহট্টগোলে সেই ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখি কামরা জুড়ে একদঙ্গল লোক। বোঁচকাবুঁচকিও কম নেই। এখন আলো জ্বলছে। জানলাগুলো হাট করে খোলা। এই রে! সর্বনাশ হয়েছে তাহলে। গরাদ গলিয়েই পিলপিল করে এরা বুঝি ঢুকে পড়েছে। ধুড়মুড় করে উঠে বসলুম। অমনি খালি জায়গা পেয়ে একদল লোক হইহই করে এসে বসে পড়ল। দু-জনকে সিগারেট দিয়ে সামলেছি, এতজনকে কীভাবে সামলাব ভেবে খুব ভয় পেয়ে গেলুম।

কিন্তু তারপর চোখ গেল দরজার দিকে। দরজা খোলা। অতএব এরা তারা নয়। তাদের তন্নতন্ন করে খুঁজে পেলুম না। তারা কোথায় গেল, গোঁফ-দাড়ি এবং কুমড়ো-অর্থাৎ সেই অন্ধকারের ম্যাজিশিয়ানরা?

আমার মাথার তলা থেকে বালিশটা উধাও। যাক গে, একটা অভিজ্ঞতা হল তাহলে। টিকিটের ঘণ্টা দিচ্ছিল। পাঁচটা বাজে।

প্রতাপগড়ের মানুষখেকো

আগে জানলে এ বুড়োর পাল্লায় কিছুতেই পড়তুম না। ঢের ঢের বুড়ো মানুষ দেখেছি, গ্রীষ্মকালে তাঁরা নাতির হাত ধরে পার্কে গিয়ে বসে থাকেন এবং শীতের সময় ঘরের কোনে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে কাগজ পড়েন। দু-চার জন বুড়োমানুষ অবশ্যি নেতা হয়ে দেশ শাসনও করেন। খবরের কাগজের খবর জোগাড় করতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে চেনাজানাও হয়েছে অল্পস্বল্প। কিন্তু তাঁরা কেউ এঁর মতো পাহাড়-জঙ্গল বুড়ো ঘোড়ার দাপটে ছোটাছুটি করে বেড়ান না-স্রেফ দু-খানা ঠ্যাঙের জোরেই! কিংবা প্রজাপতি বা পাখির পেছনে বাচ্চা ছেলের মতো হন্যে হয়ে ঘোরেন না তাঁরা।

এ বুড়োর কাণ্ডকারখানাই অদ্ভুত। নইলে এই জানুয়ারির হাড়কাঁপানো শীতে কেউ প্রতাপগড়ের জঙ্গলে ক্যামেরা নিয়ে রাতবিরেতে টোটো করে ঘুরবে কোন সাহসে? বিশেষ করে যে-জঙ্গলে সম্প্রতি একটা মানুষখেকো বাঘের দৌরাত্ম্য চলছে!

জঙ্গলে রাতবিরেতে ক্যামেরার কথা শুনে কেউ যদি ভাবে, নিশ্চয় ফ্লাশ বালবের সাহায্যে জন্তুজানোয়ারের ছবি তোলা হচ্ছে-তাহলে সে মস্ত ভুল করবে। ক্যামেরাটাও বিষম বিদঘুটে। ভূতুড়ে বলতেও আমার আপত্তি নেই। কারণ, ওতে ফ্লাশ বালবের দরকার হয় না। অথচ অন্ধকারে লেন্সের সামনে কম পক্ষে বিশ-পঁচিশ মিটার দূরত্বে ১৮০ ডিগ্রির মধ্যে যা কিছু থাকে, সবেরই ছবি উঠে যায়। শাটার টেপার জন্যে কারও বসে থাকার দরকার নেই। ওটার ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা এত সূক্ষ্ম আর স্পর্শকাতর যে, শুধু দরকার লেন্সের সামনে ওই দূরত্বের মধ্যে মাটিতে একটুখানি কাঁপন। কোনো জন্তু মাটিতে হাঁটলেই কিছু-না-কিছু কাঁপন জাগে। সেই যথেষ্ট। শাটার ক্লিক করবে।

প্রতাপগড় জঙ্গলের বাংলোয় রাত দশটায় উনি যখন ফিরে এলেন ক্যামেরার ফাঁদ পেতে, আমি তখন ফায়ারপ্লেসের সামনে ইজিচেয়ারে বসে কড়া কফি খাচ্ছি আর পরদিন সকালে কেটে পড়ার মতলব ভাঁজছি। কী শীত, কী শীত! বিহারের শীতের নামডাক আছে জানতাম। কিন্তু প্রতাপগড় এলাকা যে উত্তর মেরুরই ছোটো ভাই, সেটা জানতে বাকি ছিল।

‘হ্যালো ডার্লিং!’ যথারীতি সম্ভাষণ করে উনি টুপি ও ওভারকোট খুললেন এবং আমার পাশে বসে মৃদু হেসে বললেন, ‘জয়ন্ত কি আমার ওপর রাগ করেছ?’

ফ্লাস্ক থেকে এক মগ কফি ঢেলে ওঁর হাতে দিয়ে গম্ভীর মুখে বললুম, ‘আর ক-দিন থাকবেন ভাবছেন?’

আমার কাঁধে একটা হাত রেখে অন্য হাতে কফির মগ ধরে উনি হঠাৎ চাপা স্বরে বললেন, ‘ডার্লিং! আশা করছি, কাল সকালের মধ্যে তোমার চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠার মতো এক অত্যদ্ভুত ছবি তোমায় দেখাতে পারব। অতএব ধৈর্যসহকারে অন্তত আর একটা দিন অপেক্ষা করো। এবং জয়ন্ত, এমনও হতে পারে, তুমি এবার প্রতাপগড় থেকে তোমার দৈনিক সত্যসেবকের জন্য একটি রোমাঞ্চকর সংবাদও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে!’

ওঁর লোভ দেখানো কথায় একটুও না গলে বললাম, ‘কীসের ছবি দেখাবেন আর? গত রাতে তো ঝরনার জল খেতে আসা এক পাল হরিণের ছবি উঠেছিল আপনার ক্যামেরায়। কাল বড়োজোর দেখব হয়তো একটা রোগা বাঘ!’

‘ঠিক বলেছ ডার্লিং?’ বুড়ো সাদা দাড়ি খামচে ধরে হাসলেন। তারপর অভ্যাসমতো টাকে সেই হাতটা বুলিয়ে কী একটা ফেলে দিলেন। দেখলুম লাল রঙের একটা পোকা। অনেক সময় টাকে মাকড়সার জাল বা পাখির বিষ্ঠাও দেখেছি। বুড়ো পোকাটার গতিবিধিতে নজর রেখে বললেন, ‘বাঘের ছবিই দেখাব। তবে এটা যে-সে বাঘ নয়, সেই কুখ্যাত মানুষখেকো বাঘ। সরকার যাকে মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।’

বিরক্ত হয়ে বললুম, ‘ধরুন, তাই না হয় হল! মানুষখেকো বাঘটার ছবি আপনার ক্যামেরায় উঠল। কিন্তু সেটা অত্যদ্ভুতই-বা হবে কেন এবং দৈনিক সত্যসেবকই-বা ও খবর ছাপবে কেন? তা ছাড়া ওটাই মানুষখেকো তার প্রমাণ কী?’

রহস্যময় হেসে বুড়ো বললেন, ‘ধৈর্য ধরো বৎস! এ বৃদ্ধের প্রতি কিঞ্চিৎ বিশ্বাস রাখো। কেমন?’

এবার একটু চমক জাগল। বললুম, ‘যদি জেনেই বসে আছেন যে, সেই মানুষখেকো বাঘটাই আপনার ক্যামেরার সামনে এসে হাজির হবে, তাহলে ওই শিকারি ভদ্রলোকদের বললেন না কেন? ওঁরা তো বাঘটাকে মারার জন্যে হন্যে হচ্ছেন। আজ বিকেলে আপনার সামনেই ওঁরা দু-জনে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় মোষের বাচ্চা বেঁধে রেখে গাছের ওপর মাচান করে বসে থাকবেন সারারাত। খামোকা ওঁরা কষ্ট পাবেন ঠান্ডায়।’

আমার কথার জবাব দেবার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করেছেন, এমন সময় চৌকিদার দরজায় উঁকি মেরে একটু কেশে বলল, ‘হুজুর কর্নেলসাব। খানা তৈয়ার হ্যায়। হুকুম হোগা তো আভি লায়ে গা।’

‘জরুর’ বলে হুজুর কর্নেলসাব অর্থাৎ আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ওরফে ‘বুড়ো ঘুঘু’ অভ্যাসমতো বুকে ক্রশ এঁকে যথার্থ রসিকের মতো খাদ্য গ্রহণে প্রস্তুত হলেন।

বাংলোটা একেবারে জঙ্গলের মধ্যে। তাই সতর্কতার জন্য বারান্দা জুড়ে গ্রিল এবং এই শীতে গোটাটা তেরপলে ঢাকা রয়েছে। বারান্দার একদিকে কিচেন। চৌকিদার কিচেনের সামনে খাটিয়া পেতে ঘুমোয়। সম্প্রতি মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব হওয়াতে সে আরও সতর্কতার দরুন পাশে একটা টর্চ আর বল্লমও রাখে। কর্নেলবুড়ো মানুষখেকোর ভয় তুচ্ছ

করে এত রাত অবধি জঙ্গলে ঘোরেন এবং নিরাপদে ফিরে আসেন। বারান্দার গ্রিলের একটা অংশ খুলে সে হুজুর কর্নেলসাবকে ভেতরে আসতে দেয় এবং সঙ্গেসঙ্গে ফের সেই ফাঁকটা অর্থাৎ দরজা বন্ধ করে তালা এঁটে সন্দিগ্ধদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। আমার ধারণা, সে ভূত দেখছে, না মানুষ, তার দৃষ্টিতে এরকম একটা চাঞ্চল্য থাকে। কর্নেলের ওপর তার ভক্তি ক্রমশ বেড়ে গেছে।

জেলি-মাখানো মোটা মোটা চাপাটির সঙ্গে বুনো মুরগির মাংস বেশ জমিয়ে খাওয়া গেল। খেতে খেতে কর্নেল আমার সেই কথাটার জবাব দিলেন। 'ঠিকই জয়ন্ত! মি. সেন এবং মি. দত্তকে আমার বলা উচিত ছিল, আপনারা ঝরনার ভাটিতে টোপ না বেঁধে আরও একটু উজানে এসে বাঁধুন। কারণ আমার ধারণা, বাঘটা ওখানেই টিলার ওপর একটা গুহায় থাকে। তার পায়ের দাগও খুঁটিয়ে দেখেছি। জঙ্গলবিদ্যায় আমারও কিঞ্চিৎ জ্ঞানগম্যি আছে।'

'তাহলে বললেন না কেন?'

কর্নেল হাসলেন। 'যেচে পড়ে বলাটা সংগত মনে করিনি। তা ছাড়া লক্ষ করেছ নিশ্চয়, বিশেষ করে মি. দত্ত কেমন যেন অভদ্র প্রকৃতির লোক। এসেই আমাদের এখানে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন না? মি. সেনও কেমন আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, দু-দুটো মানুষ-টোপ থাকতে আর মোষের বাচ্চা কিনতে খামোকা পয়সা খরচ কেন? ব্যাপারটা আমার গায়ে লেগেছে জয়ন্ত!'

ওঁর দুঃখ দেখে ঠাট্টা করে বললুম, 'আহা! ওঁরা তো কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নামক প্রখ্যাত বুড়ো ঘুঘুকে চেনেন না! চিনলে নিশ্চয় সমীহ করে কথা বলতেন। তা ছাড়া যে জঙ্গলে মানুষখেকো বাঘ রয়েছে, সেখানে যারা বেড়াতে এসেছে শখের বশে, তারা নিছক টোপ হতেই এসেছে বই কী!'

কর্নেল কিন্তু হাসলেন না। গোমড়ামুখে গেলাসের কনকনে ঠান্ডা জলটা পুরো গিলে ফেললেন।

শেষ রাতে কী একটা গণ্ডগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে কয়েক সেকেন্ড ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে কর্নেল ব্যস্তভাবে ডাকছেন, 'জয়ন্ত! জয়ন্ত!' বাইরে চৌকিদার দুর্বোধ্য ভাষায় চ্যাঁচামেচি করছে। আর কেউ হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে।

কম্বল ছেড়ে বেরোনো সহজ কথা নয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সহজাত বোধ কাজ করে। হুড়মুড় করে উঠে পড়লুম। তারপর দেখি, কর্নেল লণ্ঠন হাতে এগিয়ে দরজা খুললেন। তাঁর পিছন পিছন দৌড়ে গেলুম। বারান্দায় বেরিয়ে এক ভয়ংকর দৃশ্য চোখে পড়ল। মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে আছেন সেই শিকারি মি. দত্ত এবং দু-হাতে মুখ ঢেকে ছেলেমানুষের মতো কাঁদছেন। তাঁর পোশাকে চাপ চাপ টাটকা রক্ত লেগে রয়েছে। পাশে দুটো রাইফেল পড়ে রয়েছে। আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চৌকিদার বেচারা জড়ানো গলায় ক্রমাগত কী বলছে, বোঝা যাচ্ছে না।

কর্নেল মি. দত্তের কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'মি. দত্ত, কী হয়েছে?'

বার কতক ঝাঁকুনি দেওয়ার পর মি. দত্ত শান্ত হলেন। তারপর ফ্যাঁচ করে নাক ঝেড়ে বললেন, 'ও হো হো হো! আমি কী করব? কী করব আমি? আমার সারা জীবনের সঙ্গী আমার প্রাণের বন্ধু অমল... ঃও!'

কর্নেল বললেন, 'প্লিজ মি. দত্ত! শান্ত হোন, শান্ত হোন। কী হয়েছে বলুন তো?'

মেজাজি মি. দত্ত বিকৃত মুখে বললেন, 'বুঝতে পারছেন না মশাই কী হয়েছে? অমলকে বাঘে মেরে ফেলেছে। ও হো হো! কেমন করে ওর স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের সামনে এ মুখ দেখাব?'

এটাই অনুমান করেছি ততক্ষণে। কর্নেল ওঁর কাঁধ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'সর্বনাশ! মি. সেনকে মানুষখেকো বাঘটা মেরে ফেলেছে! কিন্তু কীভাবে ব্যাপারটা ঘটল বলুন তো মি. দত্ত? আপনারা কি একই মাচানে ছিলেন না?'

দত্তসাহেব রুমালে চোখ-নাক মুছে বললেন, 'একই মাচানে তো ছিলুম। কখন বাঘটা চুপিচুপি গাছে উঠেছিল টের পাইনি। আমার একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। হঠাৎ অমলের আর্তনাদে জেগে গেলুম। টর্চ জ্বালতেই দেখি, ঃও! সে এক বীভৎস দৃশ্য। বাঘটা অমলের গলা কামড়ে ধরে ঝাঁপ দিল।'

কর্নেল বললেন, 'আপনি নিশ্চয় গুলি করেননি? ওঁর রাইফেলটাও তো নিয়ে এসেছেন দেখছি।'

দত্তসায়েব শ্বাস টেনে বললেন, 'আমার গায়ে ধাক্কা লেগেছিল। টর্চ আর রাইফেল নীচে পড়ে গিয়েছিল তক্ষুনি। ঃও! ও হো হো হো। অমল!'

'তারপর? তারপর?' আমি দম-আটকানো গলায় প্রশ্ন করলুম।

মি. দত্ত বললেন, 'তারপর কীভাবে যে পালিয়ে এসেছি আমিই জানি। এই দেখুন, কত জায়গায় ছড়ে গেছে। আর এই দেখুন কত রক্ত। অমলের রক্ত! ও হো হো হো।'

কর্নেল একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় বাঘটা শিকার নিয়ে সরে পড়েছে। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।...'

বাকি রাত আর ঘুমোনো গেল না। পাশের ঘরে দত্তসায়েব সমানে বিড়বিড় করে শোকপ্রকাশ করছেন শোনা যাচ্ছিল। কর্নেল ও আমি ফায়ারপ্লেসের কাছে বসে রইলুম। কর্নেলবুড়ো একেবারে চুপচাপ। কোনো প্রশ্ন করেও জবাব পেলুম না। অভ্যাসমতো দাড়ি বা টাকে হাত বুলোচ্ছেন, কখনো চোখ বুজে বুকে ক্রস আঁকছেন।

জঙ্গল ও পাহাড় জুড়ে ঘন কুয়াশা। রোদ বাড়লে সেটা কাটল। তখন কর্নেল আমাকে নিয়ে বেরোলেন। দত্তসায়েবকে দেখলুম লনে রোদে বসে আছেন। হাতে রাইফেল। হিংস্র চেহারা। লাল চোখ। কর্নেল ডাকলেন, 'আসুন মি. দত্ত। দেখি, আপনার বন্ধুর ডেডবডি খুঁজে পাই নাকি।'

দত্তসাহেব উঠলেন। 'ওই শয়তানটাকে খতম না করে আর আমি কলকাতা ফিরছি না; এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

যেতে যেতে কর্নেল বললেন, 'প্রথমে আমাদের মাচানের ওখানে যাওয়াই উচিত।'

মি. দত্ত শুধু বললেন, 'হুঁ।'

বাংলো থেকে ঝোপজঙ্গলে ভরা ঢাল বেয়ে নেমে আমরা ছোট্ট একটা সোঁতার ধারে পৌঁছোলুম, যেটা একটু দূরে ঝরনা থেকে বয়ে এসেছে। পাথরের ওপর দিয়ে ঝিরঝিরে স্বচ্ছ জল বইছে। ধারে ধারে কিছুটা যাওয়ার পর মি. দত্ত বললেন, 'ওই যে ওখানে।'

চারপাশে ঘন গাছপালা, মধ্যিখানে এক টুকরো ফাঁকা ঘাসজমি। একটা বাচ্চা মোষ মনের সুখে এখন ঘাস খাচ্ছে। বুঝলুম, ওটাই টোপ। জমিটায় পৌঁছেই আমরা থমকে

দাঁড়ালুম। মাচানের ঠিক নীচেই একটা ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তারপর বিকট চিৎকার করে মি. দত্ত ছুটে গিয়ে মৃতদেহটার কাছে হাঁটু মুড়ে বসলেন এবং রাতের মতোই বুকফাটা কান্না জুড়ে দিলেন।

কর্নেল ও আমি এগিয়ে গেলুম। শিকারি মি. সেনের গলায় গভীর ক্ষতচিহ্ন এবং বুকের ওপরটা তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে ফালা ফালা। পুরু পুলওভার ফেঁড়েফুঁড়ে গেছে। জমাট কালচে রক্তের ছোপ সবখানে। কর্নেল মুখ তুলে মাচানের দিকে তাকালেন। তারপর বেমক্কা গাছে চড়তে শুরু করলেন। গাছটার গুড়ি ও ডালে রক্তের ছোপ দেখতে পাচ্ছিলুম।

একটু পরেই কর্নেল মাচান থেকে নেমে এসে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন মি. দত্ত। বাঘটা ওঁকে আচমকা মাচানের ওপরেই আক্রমণ করেছিল। উনি আত্মরক্ষার ফুরসত পাননি। তো ইয়ে ডেডবডিটা...'

দত্তসায়েব শান্তভাবে বললেন, 'চৌকিদারকে বলেছি ক-জন লোক ডেকে আনতে। জিপে করে কলকাতা নিয়ে যাব। কিন্তু জানি না, অমলের স্ত্রীর সামনে দাঁড়াব কোন মুখে। ঃও।'

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে মাচানের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ ঘুরে বললেন, 'দেখুন মি. দত্ত, আমার মনে হচ্ছে, আপনার বন্ধু মি. সেনকে যে বাঘটা মেরে ফেলেছে, সেটা মানুষখেকো নয়।'

মি. দত্ত ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আপনি কি শিকারি? কীভাবে বুঝলেন যে মানুষখেকো নয়? মানুষখেকো না হলে ওভাবে কোনো বাঘ চুপিচুপি গাছে উঠে শিকারির ওপর হামলা করে না।'

কর্নেল বললেন, 'তা ঠিক। তবে এ জঙ্গলে আরও বাঘ থাকাও তো সম্ভব।'

ধমকের সুরে দত্তসায়েব বললেন, 'যা জানেন না, তা নিয়ে বাজে বকবেন না।'

কর্নেল ধমক খেয়ে কাঁচুমাচু মুখে সরে এলেন। 'চলো জয়ন্ত, ডেডবডি তো পাওয়া গেছে। আমরা নিজের কাজে যাই।'

ঝরনার ধারে এসে বললুম, 'লোকটা অভদ্র। গোঁয়ার। একটা হামবাগ!'

কর্নেল হেসে বললেন, 'শিকারিদের একটু রাগ হওয়া স্বাভাবিক। যাক গে, জয়ন্ত। তুমি বাংলোয় গিয়ে বিশ্রাম করো গে। এ বুড়োর পিছনে ছোটাছুটি করা তোমার পোষায় না জানি।'

'সে আর বলতে? কিন্তু আপনি যাবেনটা কোথায়?'

'আপাতত ক্যামেরাটা নিয়ে আসি।' বলে কর্নেল হনহন করে এগিয়ে গেলেন। আমি বাংলোয় ফিরলুম।...

কর্নেল ফিরলেন একেবারে দুপুর গড়িয়ে। তারপর খেয়েদেয়ে ফিলম ডেভেলাপ করতে বাথরুমে ঢুকলেন। ওটাই ওঁর ডার্করুম। রাতে ঘুম হয়নি। তাই আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। সেই ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকাডাকিতে। 'জয়ন্ত, জয়ন্ত! শিগগির সব গুছিয়ে নাও। আমরা এক্ষুনি রওনা দেব। জিপ এসে গেছে।'

বললুম, 'সে কী। অরণ্যপিপাসা এরই মধ্যে মিটে গেল? না কি মানুষখেকো বাঘের আতঙ্ক? আর জিপ কোথায় পেলেন? আমরা এই অবেলায় যাবই-বা কোন চুলোয়?'

বুড়ো ঘুঘু রহস্যময় হেসে বললেন, 'ওয়েট ওয়েট ডার্লিং। সব প্রশ্নের জবাবে আপাতত আমার রাতের ফসল তোমাকে উপহার দিতে চাই, নাও।'

হাত বাড়িয়ে যা পেলুম, তা একটা ছোট্ট ফটোগ্রাফ। কিন্তু দেখামাত্র চমকে উঠলুম। একী! এ যে দেখছি, মি. দত্ত হাঁটু দুমড়ে পাথরের খাঁজে হাত পুরে কী একটা করছেন। অবাক হয়ে বললুম, 'এর মানে? কাল রাতে তো ওঁরা দু-জনে মাচানে ছিলেন।-মানে মি. দত্ত এবং মি. সেন-অথচ মি. দত্ত দেখছি একা এখানে কী যেন করছেন।'

কর্নেল বিদঘুটে ভঙ্গিতে ফের হাসলেন। 'রেডি হয়ে নাও ঝটপট। তোমায় যা দেখাব বলেছিলুম, তা দেখালুম। বাকিটা প্রতাপগড় টাউনশিপে গিয়ে দেখাব।'

'কিন্তু আপনি মানুষখেকো বাঘটা দেখাবেন বলেছিলেন।'

'তাই তো দেখালুম।' বলে বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবর নিজেই আমার কম্বল বেডিংপত্তর গোছাতে শুরু করলেন। আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি। কিছুক্ষণ পরে জিপে ওঠার সময় কর্নেল বললেন, 'আসলে যে বুড়ো এবং রোগা বাঘটা তল্লাটে পাঁচটা মানুষ মেরে খেয়েছে, সে তার পাহাড়ি গুহায় স্বাভাবিকভাবে মরে পড়ে আছে। তাকে গতকাল আবিষ্কার করে এসেছিলুম। কবে কোনো শিকারির গুলি খেয়ে বাঘটার অবস্থা এমনিতে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। যাক গে, উঠে পড়ো বৎস, যথাস্থানে পৌঁছে সব টের পাবে।'

প্রতাপগড় টাউনশিপে পৌঁছোতে প্রায় সন্ধ্যা হল। অবাক হয়ে দেখি, জিপ থানায় ঢুকছে। বুক কাঁপল। তাহলে কি মি. সেন বাঘের হাতে মারা পড়েননি? নিছক খুনখারাপির ঘটনা?

হুঁ, ঠিক তাই। লাল চোখে হিংস্র মুখভঙ্গিতে বসে আছেন মি. দত্ত। তাঁর হাতে হাতকড়া। টেবিলের চারপাশ ঘিরে কয়েক জন পুলিশ অফিসার রয়েছেন। আমাদের দেখে একজন পুলিশ অফিসার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হ্যাল্লো কর্নেল।'

কর্নেল কোটের পকেট থেকে এক গাদা ছবি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার অত্যদ্ভুত ক্যামেরার রাতের ফসল মি. শর্মা। একটা ছবিতে দেখবেন দত্তসায়েব দুটো বাঘনখ লুকিয়ে রাখছেন। সময়ও ফিলমে সাংঘাতিকভাবে লেখা হয়ে যায়। রাত দুটো তিরিশ মিনিট। এই দেখুন!'

মি. শর্মা একগাল হেসে বললেন, 'আপনার নির্দেশমতো জায়গায় মার্ডার উইপন দুটো উদ্ধার করা হয়েছে। ডেডবডি মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসতে দেরি নেই।' বলে উনি ড্রয়ার থেকে কাগজে মোড়া দুটো বাঘের থাবার মতো নখওয়ালা সাংঘাতিক অস্ত্র বের করলেন। রক্তের ছোপ কালো হয়ে আছে।

মি. দত্ত মুখ নীচু করে বসে আছেন পাথরের মতো।

অনেক রাতে সার্কিট হাউসের একটা ঘরে কর্নেলের মুখোমুখি হলুম। 'দত্তসায়েব বন্ধুকে খুন করলেন কেন?'

কর্নেল জবাব দিলেন, 'কলকাতার প্রখ্যাত হোসিয়ারি দত্ত অ্যান্ড সেনের নাম শোননি জয়ন্ত? সেই যে বাঘমার্কা গেঞ্জি ইত্যাদি যাদের। যেটুকু অনুমান করছি, তাতে মনে হয় দত্তসায়েব ভেতর ভেতর পার্টনার বন্ধু সেনসায়েবকে ঠকিয়ে একা মালিক হবার চক্রান্ত করেছিলেন। কারণ ওঁদের চাপা গলায় আগের রাতে কী সব তর্ক করতে শুনেছিলুম। যাই হোক সেই চক্রান্তের চরম অবস্থা এই হত্যাকাণ্ড। বুঝে দেখো জয়ন্ত, কী চমৎকার ফন্দি এঁটেছিলেন মি. দত্ত। মানুষখেকো বাঘ শিকার করতে এসে তার পাল্লায় একজনের মারা

পড়াটা কত স্বাভাবিক দেখাত। শুধু বাদ সাধল এই বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ এবং তার অত্যদ্ভুত ক্যামেরা। তবে ডার্লিং জয়ন্ত, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি-যদি তুমি এই বৃদ্ধকে নির্দয়ভাবে পরিত্যাগ না করে যাও, তাহলে কয়েক দিনের মধ্যে তোমায় সত্যিকার বাঘ দেখাবই দেখাব।'

দাড়ি ও টাকওয়ালা 'বুড়ো ঘুঘু' কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নিজের বিশাল বুকে খাঁটি পাদরির মতো একবার ক্রস আঁকলেন। তারপর অস্ফুট স্বরে আওড়ালেন, 'আমেন! আমেন!'

কুমড়োরহস্য

স্টেশন তখনও অন্তত আধা কিলোমিটার দূরে, ট্যাক্সিটা বিগড়ে গেল। ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। ট্যাক্সির সামনে ও পিছনে গাদাগাদি করে প্রায় এক ডজন যাত্রী ঠাসা ছিল। এ-মুল্লুকে নাকি এটাই রেওয়াজ। তবে শীতের দাপটে অবস্থাটা খুব একটা অসহনীয় মনে হচ্ছিল না। তা ট্যাক্সিওয়ালা দশ কিলোমিটার পথ আসতে ইতিমধ্যে তিন বার ভাড়া বাড়িয়েছে। এবার কলকবজা বিগড়ে যাওয়া ব্যাপারটাকে চতুর্থ দফা বাড়াবার ফন্দি ভেবেই আমরা যাত্রীরা ঝটপট নেমে এলুম। এবং যাঁদের ঠ্যাংগুলো লম্বা, তাঁরা সবার আগে দেখতে দেখতে উধাও হয়ে গেলেন।

একটু পরে দেখি, আমি আর ট্যাক্সিওয়ালা ছাড়া আর জনপ্রাণীটি নেই। ট্যাক্সিওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো ফন্দিফিকির বা ধূর্তামির চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছিলুম না। লোকটা করুণমুখে ইঞ্জিনের কলকবজার দিকে তাকিয়ে আছে। বললুম, 'কী দাদা, কী বুঝছেন?'

লোকটা হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'নেহি সাব। আপ পাঁয়দল চলা যাইয়ে।'

হুঁ, ভেবেছে আমি ওর হাড়জিরজিরে গাড়িটা মূর্ছাভাঙার অপেক্ষায় আছি। আসলে এতক্ষণ ঠাসাঠাসিতে আমার শরীরে আগাগোড়া ঝিম ধরে গেছে। পা দুটোতে কোনো সাড়া নেই। তাই সেই ঝিমুনি কাটিয়ে নিচ্ছি। এবং সেটা ওকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই রাস্তার ওপরে পা দুটো ঘোড়ার মতো ঠুকতে ঠুকতে কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। কাছেই একটা ব্রিজ রয়েছে। নদীটা বেশ চওড়া। তবে আদ্ধেকের বেশি বালিতে ভরা, বাকিটায় কালো জল। স্রোত বইছে বলে মনে হচ্ছিল না।

বিকেল হয়ে গেছে। শীতের দিন ঝটপট ফুরিয়ে যায়। হিসেব করে দেখলুম, ট্রেনের এখনও মিনিট কুড়ি দেরি। স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে গেলেও ট্রেন ধরা যাবে। সঙ্গে একটা কিটব্যাগ ছাড়া কোনো বোঝা নেই। তা ছাড়া জায়গাটা কেন যেন খুব ভালো লাগছিল। একধারে ছোটো-বড়ো পাহাড়। তার উপত্যকা শীতের শস্যে সবুজ হয়ে আছে। অন্যধারেও পাহাড় আছে। আর আছে ঝোপঝাড় আর মাঝে মাঝে ঘন জঙ্গল। সামনে ওই স্টেশনের কাছে যা একটা বসতি-তা ছাড়া কাছাকাছি কোনো বসতির চিহ্ন চোখে পড়ছিল না।

মনে হল, জায়গাটা ভ্রমণবিলাসীদের পক্ষে মোটামুটি পছন্দসই!

হঠাৎ আমার চোখ গেল ডাইনে নদীর পাড়ে জঙ্গলের দিকটায়। ঝোপের মধ্যে কী একটা বসে আছে যেন। বাঘ-ভাল্লুক নাকি? বলা যায় না, এই জঙ্গলে জনহীন জায়গায় বিশেষ করে শীতকালে জন্তুজানোয়ার বেরিয়ে পড়তেও পারে।

ধূসর রঙের প্রাণীটি আমার দিকে পিঠ রেখে ওত পেতে আছে। একবার ভাবছি ট্যাক্সিওয়ালাকে ডেকে সাবধান করে দিই। আবার ভাবছি, আমার ডাকাডাকি শুনে যদি দাঁত-নখ বাগিয়ে তেড়ে আসে? অবশ্য রাস্তাটা যথেষ্ট উঁচু এবং আন্দাজ দেড়শো মিটার দূরত্বে রয়েছে ওটা।

কিন্তু আমাকে হকচকিয়ে দিয়ে ওটা উঠে দাঁড়াল এবং তক্ষুনি বুঝলুম চোখের ভুল হয়েছে। ওটা ধূসর রঙের কোট-প্যান্টপরা একজন মানুষই বটে। হাতে কী একটা রয়েছে। গা ছমছম করে উঠল এবার। অন্যরকম ভয়ে। হাতে কী ওটা? পিস্তল? কাউকে খুন করার জন্যে ওত পেতে আছে লোকটা। কিন্তু কোট-প্যান্ট এবং দস্তুর মতো সায়েবি টুপিপরা কোনো লোক কাউকে খুন করার জন্যে ওভাবে ওত পেতেছে, এটা কিছুতেই যুক্তিসংগত মনে হল না।

অথচ ওর গতিবিধি সন্দেহজনক। সন্দেহ আরও বাড়ল যখন দেখলুম, লোকটা হাতের কালোরঙের জিনিসটা তুলে গুলি ছোড়ার ভঙ্গিতে একটু কুঁজো হল এবং ওইভাবে পা টিপে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোতে থাকল।

তারপর দেখি, সে দৌড়োতে শুরু করেছে। গুরুতর দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে এবার। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছি, গুলির শব্দ আর মানুষের আর্তনাদ শুনব। ওর হাতের জিনিসটা যদি বন্দুক হত, তাহলে শিকারিই ভাবতুম। পিস্তল দিয়ে কি কেউ পাখি বা জন্তুজানোয়ার শিকার করে?

দৌড়ে সে যেখানে ঢুকল সেখানে কিছু উঁচু উঁচু গাছ রয়েছে। ছায়ায় অস্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পাচ্ছি। তারপর সে অন্তত এক মিনিটের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ট্যাক্সিওয়ালা ব্যাপারটা দেখেছে নাকি জানার জন্যে ওদিকে ঘুরলুম। না, ও এখনও ইঞ্জিনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

আবার যখন সেই লোকটাকে দেখতে পেলুম, তখন সে নদীর পাড়ে হাঁটু দুমড়ে বসেছে এবং পিস্তল তাক করে রেখেছে। আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। দৌড়ে গিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে ব্যাপারটা দ্রুত জানিয়ে দিলুম। দু-জন মানুষ এখানে থাকতে একটা খুনখারাপি হবে! যে ট্যাক্সিওয়ালা তিন-তিন বার যাত্রীদের চাপ দিয়ে ভাড়া বাড়িয়েছে, তার বিবেকও এবার নড়ে উঠল। 'এইসা?'

বলে সে তার ট্যাক্সি থেকে একটা লোহার রড বের করল। তারপর চোখ কটমট করে আমাকে ডাক দিল। আমারও একটা কিছু হাতে নেওয়া দরকার। অগত্যা ওর ইঞ্জিনের মধ্যে রাখা একটা রেঞ্চ তুলে নিয়েই রওনা দিলুম। উত্তেজনায় মাথার ঠিক নেই।

ট্যাক্সিওয়ালা উঁচু রাস্তা থেকে নামতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় চাপাস্বরে কী বলতে বলতে ঝোপঝাড় ভেঙে এগোতে থাকল। আমি ওর পিছু পিছু চলেছি। দু-জনেই সতর্ক, আচমকা ধরে ফেলব ওকে।

আমাদের দিকে পিঠ রেখে লোকটা এখনও তেমনি বসে আছে। টুপিপরা মাথাটা সামনে ঝুঁকছে, হাতের পিস্তল একেবারে নাকের ওপর তুলে তাক করে রেখেছে। সম্ভবত

হতভাগ্য মানুষটি অর্থাৎ যাকে ও খুন করবে, সে নীচে নদীতে নিশ্চিন্তে কিছু করছে-টরছে। কিছু টের পাচ্ছে না। খুনে লোকটির হাতের পিস্তল আছে বলেই আমরা এত সাবধান হয়েছি। পা টিপে টিপে এগিয়ে কয়েক মিটার দূরে থেকে ট্যাক্সিওয়ালা রড তুলল এবং আমিও রেঞ্চটা বাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'খুন করলে! খুন করলে! পাকড়ো পাকড়ো!' ভুলেই গেলুম যে, ওর হাতে পিস্তল আছে।

কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে গুপ্তঘাতক ঘুরে ব্যাপারটা দেখেই হুড়মুড় করে নদীতে ঝাঁপ দিল। ট্যাক্সিওয়ালা রড নাচিয়ে পাড় থেকে শাসাতে শুরু করল। 'পিস্তল ফেঁক দো! নেহি তো ডান্ডা মারেগা হাম!'

আমি তখন হতভম্ব হয়ে গেছি। কী বলব, ভেবে পাচ্ছি না। নাকি এখনও লিটনগঞ্জের সেই সরকারি অতিথিশালায় শুয়ে একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখছি?

কালো এবং প্রচণ্ড ঠান্ডা জলে বুক অবধি ডুবিয়ে হতভাগ্য গুপ্তঘাতক এখন ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। তার টুপিটা খুলে পড়ে কাগজের নৌকোর মতো ভেসে যাচ্ছে অল্প অল্প স্রোতে, এবং তার ফলে মাথাজোড়া যে টাকটি এই গোলাপি রোদ্দুরে চিকমিক করছে, সেটি অতি প্রসিদ্ধ এবং আমার সুপরিচিত। তার সান্টা ক্লজ সদৃশ্য সাদা অনবদ্য গোঁফ-দাঁড়িতে এখন বিস্তর জল-কাদা লেগেছে।

এবং তার হাতের সেই পিস্তলটা পরিণত হয়েছে বাইনোকুলারে। এবং তা হয়েছে বলেই আমাদের বোকামির শাস্তি পাইনি। কিন্তু ততক্ষণে আমার পেটে হাসি ঘুলিয়ে উঠেছে। হায় বুড়ো ঘুঘু। এ কী দশা তোমার! ট্যাক্সিওয়ালা লোহার রডটা ফের তুলতেই করুণ আওয়াজ এল, 'জয়ন্ত! ওকে একটু বুঝিয়ে বলো যে, এটা পিস্তল-টিস্তল নয়, সামান্য একটা দূরবিন।'

এতক্ষণে আমি হাসতে পারলুম। হো-হো করে হেসে উঠলুম। ট্যাক্সিওয়ালা অবাক হয়ে বলল, 'ক্যা জি? কোই জান পহচান আদমি? কৌন হ্যায় উও?'

বললুম, 'থোড়া গলতি হুয়া দাদা! মাফ কিজিয়ে। উও দেখিয়ে আপকা ট্যাক্সিমে বাচ্চালোক ক্যা গড়বড় কর রাহা।'

সত্যি সত্যি কাচ্চাবাচ্চারা ওই জনহীন রাস্তায় ওর ট্যাক্সিতে হামলা করেনি, কিন্তু উপায় নেই। ওই নিমজ্জিত বৃদ্ধ ভদ্রলোককে উদ্ধার করতে হবে। শীতের বিকেলে নদীর জল ওঁর পক্ষে নিশ্চয় আরামদায়ক হচ্ছে না। যাই হোক, আমার মিথ্যে কথায় কাজ হল, ট্যাক্সিওয়ালা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ওর হাতে সেই ছোট্ট রেঞ্চটা গুঁজে দিতেই সে জঙ্গল ভেঙে রাস্তায় তার ট্যাক্সির দিকে দৌড় দিল।

নিমজ্জিত বৃদ্ধের দিকে ঘুরে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললুম, 'জলটা কি খুব ঠান্ডা?'

উনি করুণ হেসে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'ধন্যবাদ! আমি এবার উঠতে পারব। তবে দয়া করে তুমি আমার টুপিটা উদ্ধার করো।'

হাসতে হাসতে একটা গাছের ডাল ভেঙে ধীরে ধীরে ভাসমান টুপিটা উদ্ধার করে দেখি, উনি পাড়ে উঠেছেন এবং কী আশ্চর্য, আবার চোখে বাইনোকুলার রেখে পা টিপে টিপে এগোচ্ছেন! ভিজে পোশাক থেকে জল ঝরছে সমানে। কিন্তু এতক্ষণে সব রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয় গেছে। বিরক্ত হয়ে ওঁর প্রচলিত নাম বা বদনাম ধরে ডেকে ফেললুম, 'হাই ওলড ঘুঘু! নিমুনিয়া হবে যে!'

উনি কানই দিলেন না। দৌড়ে গিয়ে ওঁর কাঁধ খামচে ধরলুম। তখন হতাশ ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন। 'মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান! তুমি জান না, কী সাংঘাতিক ক্ষতি করেছ আমার! অনেক কষ্টের পর বিরল প্রজাতির একটা উড-ডাকের দেখা পেয়েছিলুম। আর কি তাকে খুঁজে পাব?'

ওঁর কথায় এবার অনুতাপ জাগল। বললুম, 'এই দুর্ঘটনার জন্য আমি যথেষ্ট লজ্জিত এবং দুঃখিত। ক্ষমা করুন এবং চলুন, যেখানে উঠেছেন, সেখানে গিয়ে পোশাক বদলাবেন।'

'এক মিনিট, জয়ন্ত! আমি প্রজাপতি ধরা জালটা নিয়ে আসি।'

বলে উনি সামনের দিকে পা বাড়ালেন। সেদিকে তাকিয়ে দেখি গাছপালার ফাঁকে একটা কাঠের বেড়া দেখা যাচ্ছে। বুড়ো দেখতে দেখতে কী কৌশলে সেই বেড়ার ফাঁক গলিয়ে অদৃশ্য হলেন। তখন ব্যাপারটা ভালো করে দেখার জন্য বেড়ার দিকে এগিয়ে গেলুম।

একটা কৃষিফার্ম বলে মনে হল। নদীর ধারে চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে কেউ চাষবাস করেছে। অঢেল শীতের ফসল ফলে রয়েছে। তরকারিও লাগানো আছে। বুড়ো এখন হামাগুড়ি দিয়ে কুমড়ো খেতের দিকে এগোচ্ছেন। দুর্লভ প্রজাতির কতগুলো প্রজাপতি ওঁর জালে ধরা পড়েছে জানি না, তবে আমার চোখ পড়ল কুমড়োগুলোর দিকে। কিন্তু ওগুলো কি সত্যি কুমড়ো, না পাথর? চতুর্দিকে অজস্র ছোটো-বড়ো পাথর পড়ে আছে। অনেকরকম গড়ন, নানান রঙের। কিন্তু কুমড়ো খেতের ওগুলোর মসৃণ নিটোল গড়ন আর সোনালি রং দেখেই বুঝতে পারলুম, পাথর নয়। অতএব কুমড়ো ছাড়া আর কী!

আমার বৃদ্ধ বন্ধু ওখানে হাঁটু মুড়ে সাবধানে জাল গুটোচ্ছিলেন। হঠাৎ কোত্থেকে বাজখাঁই গলায় কে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই! অ্যাই! অ্যাই!' তারপর দেখি, গামবুটপরা, নাদুসনুদুস চেহারার এক ভদ্রলোক হাতে খুরপি নিয়ে দৌড়ে আসছেন। এই রে! এবার আর বুড়োকে বাঁচানো যাবে না। আমি বেড়ার ফাঁক গলিয়ে ঢোকার জন্যে সাধ্যসাধনা করছি তার মধ্যে শুনি, উভয় পক্ষই হা-হা-হা-হা করে হেসে উঠলেন।

'জয়ন্ত! এসো। আলাপ করিয়ে দিই।'

ডাক শুনে বেড়া গলিয়ে ঢুকে পড়লুম। খামারের মালিক অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। বেড়ার ফাঁকটা বেড়ে গেছে সম্ভবত, সেদিকেই ওঁর নজর।...

খামারের মালিকের পরিচয় পেয়ে আমি অবাক। ভদ্রলোক আসলে একজন কৃষিবিজ্ঞানী। নাম ড. রঘুনাথ গিনতিওয়ালা। সংক্ষেপে ড. গিনতি। অনেককাল পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন। ভালো বাংলা বলেন। এই খামার তাঁর ল্যাবরেটরি। গাছগাছড়া নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। তা ছাড়া এক ঋতুর ফসল কীভাবে অন্য ঋতুতে ফলানো যায়, তা নিয়েও মাথা ঘামান। আমার কৌতূহল ওঁর ফলানো কুমড়ো সম্পর্কে। প্রশ্ন শুনে হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনারা বাঙালিরা কুমড়োর ছক্কা খেতে খুব ভালোবাসেন। ওদিকে লিটনগঞ্জের কলকারখানা এলাকায় অজস্র বাঙালি আছেন। বলতে পারেন, তাঁদের মুখ চেয়েই আমি এই উৎকৃষ্ট জাতের কুমড়ো ফলিয়েছি। ওখানকার অফিস ক্যান্টিনগুলোতে তরিতরকারি জোগায় একটা এজেন্সি। তারা আমার খেতের কুমড়ো ট্রাকবোঝাই করে কিনে নিয়ে যায়। আপনার বন্ধু কর্নেলসাহেবকেই জিজ্ঞাসা করুন, সত্যি না মিথ্যে।'

কর্নেলসাহেব অর্থাৎ 'বড়ো ঘুঘু' বলে পরিচিত কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এই খামারবাড়ির পাশের ঘর থেকে ভিজে পোশাক ছেড়ে ড. গিনতির বেঁটে পাজামা-পাঞ্জাবি এবং আস্ত কম্বল জড়িয়ে এতক্ষণে এলেন। ফায়ারপ্লেসের সামনে আরাম করে বসে বললেন, 'জয়ন্ত ড. গিনতির কুমড়োগুলো কিন্তু অকালকুষ্মাণ্ড!'

ড. গিনতি হো-হো করে হেসে উঠলেন, 'কী বললেন? অকালকুষ্মাণ্ড!'

কর্নেল বললেন, 'তা ছাড়া আর কী বলব? সচরাচর কুমড়ো পরিণত আকার পেতে এবং পাকাপোক্ত হতে অনেক দিন লেগে যায়। আপনার এই কুমড়ো মাত্র তিন মাসেই প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে। ভেতরটা লাল টুকটুকে।'

ড. গিনতি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যেন। বললেন, 'না না। লাল বলা ঠিক নয়, হলদে। আপনি তো ভেতরটা দেখার সুযোগ পাননি এখনও। বরং কাল সকালে আপনার ফরেস্ট বাংলোয় খানিকটা পাঠিয়ে দেব। তখন-'

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, 'সরি! ভেতরটা তো এখনও দেখিইনি। তবে যেন মনে হচ্ছে, ভেতরটা লাল হওয়াই উচিত।'

'কেন বলুন তো?'

'বুঝলেন ড. গিনতি, আমার ইদানীং উদ্ভিদবিজ্ঞানের দিকেও ঝোঁক চেপেছে। সেদিন একটি পত্রিকায় দেখছিলুম, অবিকল এই জাতের কুমড়ো পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ফলে। প্রশান্ত মহাসাগরের ওই সব দ্বীপে দু-শো বছর আগে কুমড়ো কী তা কেউ জানতই না। ১৭৬৯ সালে বিখ্যাত অভিযাত্রী টমাস কুক প্রথম তাহিতি দ্বীপে বিলিতি কুমড়োর কিছু বীজ পুঁতে এসেছিলেন। তার প্রায় একশো বছর পরে বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন গিয়ে দেখেন, মাটির গুণে বিশাল আকারের কুমড়ো ফলেছে। তা এখনও দ্বীপের লোকেরা ভয়ে কুমড়ো ছোঁয় না। ওখানকার একটা দ্বীপের নাম ইস্টার দ্বীপ। তাদের ধারণা সেখানকার লোকেরা যে পক্ষীদেবতার পুজো করে, এ বুঝি তারই ডিম! বুঝুন অবস্থা!'

আমি ও ড. গিনতি হেসে উঠলুম। এই সময় কফি এল। আরাম করে কফিতে চুমুক দিলুম। কর্নেলবুড়ো কোনো ব্যাপারে একবার মুখ খুলল তো থামতে চান না। আবার

পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ফিরেছেন। গতিক দেখে ড. গিনতি আমার দিকে চেয়ে ইশারা করে বললেন, 'ইয়ে, এবার জয়ন্তবাবু ব্যাপারটা শোনা যাক। বলুন জয়ন্তবাবু, কী দেখে এলেন লিটনগঞ্জে?'

কর্নেল চিমটেয় অগ্নিকুণ্ড থেকে এক টুকরো অঙ্গার তুলে চুরুট ধরাতে ব্যস্ত হলেন। আমি বললুম, 'ব্যাপার সত্যি সাংঘাতিক। হেভি ওয়াটার প্ল্যান্টের প্রায় অর্ধেকটা বিস্ফোরণে গুঁড়ো হয়ে গেছে। সরকারি গোয়েন্দারা এখনও তদন্ত করছেন। কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। কিন্তু আঁচ করা যাচ্ছে না যে, অত কড়াকড়ি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও কীভাবে অন্তর্ঘাত ঘটল।'

ড. গিনতি শিউরে উঠলেন। 'বলেন কী! অন্তর্ঘাত? তাহলে ফিরে গিয়ে আপনাদের পত্রিকায় কড়া করে লিখবেন জয়ন্তবাবু।'

কর্নেল তাঁর দিকে ঘুরে দুষ্টু হেসে বললেন, 'রিপোর্টার জয়ন্তর খুব সুনাম আছে, ড. গিনতি। ওর কলমের জোরে সরকারি অফিসের চেয়ারগুলো কেঁপে ওঠে শুনেছি।'

পালটা খোঁচা মেরে বললুম, 'আর আপনার? আপনারও তো বুড়ো ঘুঘু বলে যথেষ্ট নাম আছে।'

কর্নেল আচমকা কাশতে শুরু করলেন। সর্বনাশ! জলে নাকানিচুবানি খাওয়ার ফলাফল। ড. গিনতি আমাকে কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, উদবিগ্ন হয়ে গেলেন। কিন্তু না, কর্নেল সামলে নিয়েছেন। বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখাবার ক্ষমতা আছে ওঁর। রুমালে নাক মুছে বললেন, 'এবার ওঠা যাক। বাংলোয় ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'

ড. গিনতি বললেন, 'সঙ্গে লোক দেব। আলো দেব। কিছু ভাববেন না। তা জয়ন্তবাবু, ওই হেভিওয়াটার প্ল্যান্ট ব্যাপারটা কী বলুন তো? বুঝতেই পারছেন, আমি নিছক কৃষিবিদ্যার চর্চা করি।'

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। 'এবার উঠি ড. গিনতি! আপনার আতিথ্য এবং সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কাল সকালে আপনার এই কাপড়চোপড় আর কম্বল ফেরত পাঠাব। এসো জয়ন্ত!'

বলে উনি সটান বেরিয়ে গেলেন। বাইরে এতক্ষণে চাঁদ উঠেছে। কিন্তু কুয়াশাও ঘন হয়ে জমেছে। আর কনকনে ঠান্ডার কথা না তোলাই ভালো। মনে হচ্ছিল, কর্নেল বুড়োর পাল্লায় পড়াটা ঠিক হয়নি। সোজা ভারুন্ডি স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলে ভালো করতুম।

এই জঙ্গলের পথে হাড়-কাঁপানো শীতে ফরেস্ট বাংলোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে এবার বাঘ-ভাল্লুকের ভয় হচ্ছিল। শুনলুম ভারুন্ডি জঙ্গলে বুনো হাতিরও উৎপাত আছে। তবে ড. গিনতির লোকটির হাতে আলো আছে।

ফরেস্ট বাংলোয় আরাম করে বসে কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত, সবার সামনে আমাকে বুড়ো ঘুঘু বলাটা তোমার বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়েছে। না-আমি রাগ করিনি। কিন্তু কথাটা তোমার তলিয়ে দেখা উচিত। তুমি কি এলিয়ট রোডে আমার ফ্ল্যাটের নতুন নেমপ্লেটটা লক্ষ করনি?'

একটু হেসে বললুম, 'করেছি। লেখা আছে: কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, প্রকৃতিবিদ। বুড়ো ঘুঘুর বাসা বলে পরিচিত ফ্ল্যাটের মধ্যে এখন কাচের জার ভরতি! তাতে প্রজাপতি-পোকামাকড়েরা ডিম পাড়ছে। হরেক পাখপাখালির মমি সাজানো রয়েছে! দুর্লভ এবং বিরল প্রজাপতির নমুনা। কিন্তু হে বৃদ্ধ, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তা ছাড়া অভ্যাস

যায় না মলে। দশ কিলোমিটার দূরে লিটনগঞ্জে হেভিওয়াটার প্ল্যান্টের রহস্যময় দুর্ঘটনা আর ভারুন্ডি ফরেস্ট বাংলোয় এক প্রাক্তন গোয়েন্দার অবস্থিতি কি নেহাত কাকতালীয় ব্যাপার? দুয়ের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই? আমি মোটেও বিশ্বাস করি না।'

কর্নেল জোরে মাথা দুলিয়ে বললেন, 'একেবারে কাকতালীয়। আমাকে সরকার ওসব ব্যাপারে কোনো অনুরোধ করেননি। আমি এসেছি উড-ডাকের খবর পেয়ে। খবরের কাগজের লোক হলেও ওসব খবরে তোমার মাথাব্যথা থাকে না। নইলে সম্প্রতি ভারুন্ডির জঙ্গলে উড-ডাকের আবির্ভাবের খবর তোমার চোখে পড়ত। যাক গে, এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। তোমার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে। আমি চৌকিদারকে দেখি। ততক্ষণ তুমি ফায়ারপ্লেসের অগ্নিকুণ্ডটার দায়িত্ব নাও। কাঠ গুঁজে দিতে ভুলো না যেন।'

উনি বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমি বসে আছি তো আছিই। আর ওঁর পাত্তা নেই। বাংলো গোরস্থানের মতো স্তব্ধ। একা বসে থাকতে গা ছমছম করছে। প্রায় দু-ঘণ্টা পরে কর্নেল ফিরলেন। বললুম, 'এত দেরি যে?'

কর্নেল বললেন, 'রাতের কাজটুকুও সেরে এলুম। আশা করি, আমার সেই অত্যদ্ভুত ক্যামেরার কথা তুমি ভোলনি।'

হ্যাঁ, অত্যদ্ভুত ক্যামেরাই বটে। প্রতাপগড় জঙ্গলে ওটা পেতে রাখতে দেখেছিলুম সেবার। জন্তুদের জল খেতে যাওয়ার পথে গাছের ডালে বেঁধে রেখেছিলেন। একটা তার নীচে মাটিতে পোঁতা ছিল! ক্যামেরার লেন্সের সামনে দিয়ে পঞ্চাশ গজ অবধি মাটিতে কেউ হেঁটে গেলেই অতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক সিস্টেমে সেই স্পন্দন ধরা পড়বে এবং আপনা আপনি শাটারটা ক্লিক করবে। ফ্ল্যাশ বালব জ্বলবে এবং ছবি উঠে যাবে। কর্নেলের মতে, জন্তুদের স্বাভাবিক চেহারার ছবি এভাবেই তো তোলা সহজ।'

বললুম, 'কোথায় ক্যামেরা পেতে এলেন?'

চাপা হেসে কর্নেল বললেন, 'ড. গিনতির কুমড়ো খেতে। কারণ, তখন ওখানে কয়েকটা অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখেছিলুম। ওটা কী প্রাণী দেখা দরকার।'

বুড়োর বাতিকের কোনো তুলনা নেই। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন একমাত্র ভাবনা, সকাল হলেই আমাকে কেটে পড়তে হবে। লিটনগঞ্জে হেভিওয়াটার প্ল্যান্টের রিপোর্ট কীভাবে লিখব, তাই ভাবতে থাকলুম। কর্নেলও অবশ্য আর মুখ খুললেন না। কেমন গম্ভীর হয়ে চুরুট টানতে থাকলেন।

খেয়ে-দেয়ে শুতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল। ক্লান্তির ফলে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। সেই ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে। দেখি, সকাল হয়ে গেছে। কর্নেল অভ্যাসমতো কখন এই প্রচণ্ড শীতের ভোরেও বাইরে ঘুরে এসেছেন। গায়ে ওভারকোট, মাথায় হনুমান টুপি, হাতে ছড়ি। বললেন, 'গুড মর্নিং! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে। এখন উঠে পড়ো এবং দ্রুত চোখ-মুখ ধুয়ে এসো!'

বললুম, 'দ্রুত কেন? কোথাও বেরোবেন বুঝি?'

'বেরোব। অবশ্য তাতে তোমার লাভই হবে। কথা দিচ্ছি।'

'লাভের দরকার নেই। আমি সোজা গিয়ে ট্রেন ধরব।' বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলুম।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে দেখি কর্নেল বিছানায় ফটোর গুচ্ছের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'জয়ন্ত, আমার রাতের ফসল। দেখে যাও, তোমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে।'

একটা ফটো তুলে নিয়ে সত্যি সত্যি চক্ষু চড়কগাছ আমার। এ কী দৃশ্য! কুমড়ো খেতে একটা বিশাল কুমড়োর ওপর ঝুঁকে ড. গিনতি কী যেন করছেন, এক হাতে খুদে টর্চ রয়েছে। বললুম, 'কী ব্যাপার?'

কর্নেল হাসলেন। 'ড. গিনতি নিশ্চয় রাতদুপুরে নিজের কুমড়ো নিজে চুরি করছেন না?'

'তাহলে কী করছেন? নিশ্চয় কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-টরিক্ষা করছেন।'

'ঠিক তাই। অসাধারণ ওঁর গবেষণা।' কর্নেল তারিফ করে বললেন। 'খুব অধ্যবসায়ী লোকও বলব, জয়ন্ত। যাকগে। সেই অদ্ভুত পায়ের ছাপের রহস্যটা রহস্যই থেকে গেল। সম্ভবত জন্তুটা ওঁকে দেখে আর ওখানে পা বাড়ায়নি।'

চৌকিদার কফি দিয়ে গেল। কফি খাওয়ার পর কর্নেল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'জয়ন্ত, দেরি হয়ে যাচ্ছে।' বলে আমাকে আপত্তির সুযোগ না দিয়ে হাত ধরে টানতে টানতে বেরোলেন। কুয়াশার ফাঁকে হালকা রোদ ফুটেছে। কিন্তু ঠান্ডার কথা না তোলাই ভালো। বাংলো থেকে উতরাই রাস্তায় নেমে গেলুম কিছুদূর। তারপর সমতলে আরও কিছুটা এগিয়ে চমকে উঠলুম। গাছপালার আড়ালে একটা জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিপে কারা বসে আছে। কর্নেল তাদের ইশারা করে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে ঝোপে ঢুকলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'এবার হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হবে জয়ন্ত। একটু কষ্ট করো।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'স্বচক্ষে দেখবে চলো।'

পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে, উপায় কী! ঝোপঝাড় ও পাথরের আড়ালে এগোচ্ছি। ঠান্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে। গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শুনছি। কতক্ষণ পরে কর্নেল একটু উঁচু হয়ে চোখে বাইনোকুলার রেখে বললেন, 'এসে গেছে! দেখবে নাকি জয়ন্ত? দেখোই না!'

বাইনোকুলারে চোখ রাখতেই ড. গিনতির খামারবাড়ির গেট নজরে পড়ল। একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকের গায়ে যা লেখা আছে, স্পষ্ট পড়তে পারছি উম্মর সিং ক্যাটারিং কোম্পানি। ট্রাকে তরিতরকারি বোঝাই হচ্ছে। ড. গিনতি এবং তাঁর লোকেরা তদারক করছেন। আমি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না। এই স্বাভাবিক ব্যাপারে এত লুকোচুরি বা ওত পেতে বেড়ানোর কারণ কী?

হঠাৎ কর্নেল বলে উঠলেন, 'চলে এসো জয়ন্ত। পাখি ফাঁদে পড়েছে।'

তারপর আমার প্রায় বাঘের লেজে-বাঁধা শেয়ালের অবস্থা হল। খামারবাড়ির গেটে পৌঁছে ফের চমকে উঠলুম। ট্রাক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকধারী এক দঙ্গল পুলিশ। ড. গিনতি দু-হাত তুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন! কর্নেলকে দেখে কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, 'দেখেছেন, দেখেছেন কর্নেল, কী জঘন্য অত্যাচার!'

কর্নেল গম্ভীরমুখে কোনো কথা না বলে ট্রাকের কাছে গেলেন এবং কাঠবেড়ালির মতো উঠে পড়লেন। তারপর হেঁট হয়ে একটা বিশাল কুমড়ো তুলে বললেন, 'আসুন মি. শর্মা। খুব সাবধানে ধরবেন কিন্তু। এর মধ্যে সাংঘাতিক এক্সপ্লোসিভ আছে। বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।'

একজন পুলিশ অফিসার হাত বাড়িয়ে কুমড়োটা নিয়ে সাবধানে ধরে রইলেন। কর্নেল নেমে এসে তাঁর হাত থেকে কুমড়োটা নিলেন। তারপর মাটিতে রেখে বোঁটার কাছে চাপ দিলেন। একটা লম্বা-চওড়া ফালি উঠে এল। উঁকি মেরে দেখি, ভেতরে একটা ধূসর রঙের

মস্ত গোল জিনিস ভরা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি খুলে গেল। থরথর করে কাঁপতে থাকলুম।

কর্নেল বললেন, 'তাহলে বুঝতে পারছ জয়ন্ত, তোমার কাজের জন্যে কেমন একখানা স্টোরি পেয়ে গেলে। আশা করি, এবার এও বুঝেছ যে, লিটনগঞ্জের হেভিওয়াটার প্ল্যান্টের দ্বিতীয় টাওয়ারকেও ধ্বংস করার ব্যবস্থা হচ্ছিল। ক্যান্টিনে এই বিশেষ চিহ্নিত কুমড়োটি যেত এবং সেখান থেকে পাচার হত টাওয়ারের মধ্যে। যাকগে, আমার কাজ শেষ। বাকি যা কিছু, মি. শর্মার হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। এসো জয়ন্ত, আমরা বাংলোয় ফিরি। তোমার ট্রেন সেই এগারোটায়। ততক্ষণে তুমি এই অকালকুষ্মাণ্ডের রহস্যময় কাহিনির একটা খসড়া করে নিতে পারবে। তবে মনে রেখো, কুমড়োরহস্য আমি দৈবাৎ টের পেয়েছিলুম। প্রজাপতি-ধরা জাল পাততে গিয়েই!'

আসতে আসতে শুনলুম, পেছনে ড. গিনতি গর্জে বলছেন, 'নেমকহারাম। আমার পাজামা-পাঞ্জাবি-কম্বলটা পর্যন্ত এখনও ফেরত দিল না।'

জুতোরহস্য

ভদ্রলোক দরজার পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'জুতোপায়ে ঢুকতে পারি স্যার?'

'নিশ্চয় পারেন। তবে খুলে রেখে এলেও আপনার নতুন জুতো চুরি যাবে না, সে গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।'

'অ্যাই! তাহলে যথাস্থানেই এসেছি।' বলে ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারপর সোফায় বসে পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। 'আমার ভাগনে গোকুল, স্যার, আপনি চেনেন ওকে-বাবুগঞ্জ ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার। আপনার ঠিকানা দিয়ে বলল, এর কিনারা করতে আপনিই পারবেন।'

'জুতো চুরির?'

'আজ্ঞে।'

'ক-জোড়া চুরি গেছে এ পর্যন্ত?'

'তিন জোড়া।' ভদ্রলোক করুণমুখে বললেন, 'এ বাজারে এক জোড়া চামড়ার জুতোর দাম চিন্তা করুন স্যার। এক সপ্তায় তিন-তিন জোড়া জুতো লোপাট। গত রোববার থেকে শুরু। রোববার সন্ধ্যে বেলায়। তারপর বিস্যুতবার ঠিক সেই সন্ধ্যে বেলায় আবার লোপাট। শুক্কুরবার ফের কিনলুম। ফের সেদিনই সন্ধ্যে বেলা লোপাট হয়ে গেল। এ কেমন চোর স্যার? সবার জুতো ঠিকঠাক পড়ে থাকে, আর আমার জুতোই ব্যাটাচ্ছেলে নিয়ে পালায়? নতুন জুতো তো আরও কত লোকে পরে যায়। তাদের জুতো ভুলেও ছোঁয় না। খালি আমার জুতো!'

'ঠাকুরবাড়ির দরজা থেকে?'

'ঠিক ধরেছেন স্যার। রাজাদের ঠাকুরবাড়ি। কবে ওঁরা কলকাতায় চলে এসেছেন। দালান-কোঠা সবই ধসে পড়েছে। শুধু ঠাকুরবাড়িটাই কোনোরকমে টিকে ছিল। পোড়ো খাঁ-খাঁ অবস্থা। দেবতার নামে জমি আছে। কিন্তু পুজোআচ্ছা বন্ধ ছিল। সেবায়েত থাকলে

কী হবে? পায়ে বাত। চলাফেরা করতে পারে না। নিজের ঘরে শুয়েই নমো নমো। বুঝলেন তো স্যার?'

'বুঝলুম। তারপর কোনো সাধুসন্ন্যাসীর আবির্ভাব হল ঠাকুরবাড়িতে?'

'অ্যাই!' ভদ্রলোক নড়ে বসলেন। 'গোকুল যা বলছিল ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে।'

'তিনি আসার পর রোজ সন্ধ্যে থেকে শাস্ত্রপাঠ-কথকতা-কীর্তনের আসর বসছিল?'

'আজ্ঞে।' ভদ্রলোক আবার নড়ে বসলেন। 'গোকুল যা বলছিল...'

'আপনার নাম কী?'

'পাঁচুগোপাল সিংহ।'

'আপনার বাবার নাম?'

'আজ্ঞে যদুগোপাল সিংহ। তিনি আমার ছোটোবেলায়...'

'আপনার ঠাকুরদার নাম?'

'জয়গোপাল সিংহ।'

'তিনি কী করতেন?'

'তিনি রাজবাড়ির খাজাঞ্চি ছিলেন।'

'খাজাঞ্চি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। খাজাঞ্চি মানে ক্যাশিয়ার স্যার! আজকাল খাজাঞ্চি বললে...'

'আপনার বাবা কী করতেন?'

'রাজবাড়ির সেরেস্তাদার-মানে অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন।'

'আপনি কী করেন?'

'রেলে টিকিট চেকার ছিলুম। গত মাসে রিটায়ার করে পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠেছি। বিয়ে-টিয়ে করিনি। আমার বিধবা দিদি-গোকুলের মা স্যার! দিদিই আমাদের বাড়িতে থাকত। আমি আসার পর সে গোকুলের সরকারি কোয়ার্টারে চলে গেছে। অত করে বললুম। থাকল না। বলে কী, আর এ বাড়িতে ভূতের অত্যাচার সইতে পারব না।'

'ভূতের অত্যাচার?'

'আজ্ঞে!' ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, 'রাতবিরেতে কীসব অদ্ভুত শব্দ। কুকুর চ্যাঁচালেই থেমে যেত। তবে প্রথম প্রথম গা করিনি। শেষে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করালুম। তাতেও কাজ হল না। এমন সময়-'

'সাধুবাবার আবির্ভাব। কাজেই তাঁর শরণাপন্ন হলেন?'

'হলুম। কিন্তু সাধুবাবার কৃপায় ভূতের অত্যাচার যদি-বা বন্ধ হল, হঠাৎ এই আরেক উপদ্রব শুরু হয়ে গেল। জুতো চুরি! তিন-তিন জোড়া জুতো স্যার।'

'সাধুবাবা কোনো আশকারা করতে পারলেন না?'

ভদ্রলোকের মুখে এতক্ষণে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। 'আশকারা করতে গিয়েই সাংঘাতিক সব কাণ্ড স্যার। কাল শনিবার সকালে ঠাকুরবাড়ির যে ঘরটায় সাধুবাবা থাকতেন, সেই ঘরের বারান্দায় চাপ চাপ রক্ত দেখা গেল। সারা বাবুগঞ্জ হুলুস্থুলু। পুলিশ

এল। রক্তের ছাপ পেছনকার দরজার ঘাটেও পাওয়া গেল। নীচে গঙ্গা। পুলিশ বলল, বডি গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। আমি এর মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিলুম না। শেষে গোপনে গোকুলকে সব বললুম। তখন গোকুল-'

'আপনার বাড়িতে আর কে থাকে?'

'কেউ না স্যার! আমি একা থাকি। স্বপাক খাই। বরাবর নিজের কাজ নিজে করার অভ্যাস আছে।'

'আপনি যে রোজ সন্ধ্যেয় বাড়ি থেকে সাধুবাবার আসরে যেতেন-'

'কাছেই স্যার। খুব কাছে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনার কি মনে হত না বাড়িতে চোর ঢুকতে পারে?'

ভদ্রলোক হাসার চেষ্টা করে বললেন, 'ভুলো, স্যার! ভুলোর চ্যাঁচানি যে একবার শুনেছে, সে-ই কানে আঙুল গুঁজে পালাবে।'

'ভুলো কোনো কুকুরের নাম?'

'আজ্ঞে। ঠিক ধরেছেন। গোকুল যা-যা বলছিল-'

'ভুলোকে আপনি কোথায় পেলেন?'

'দিদির পোষা দিশি কুকুর। দিদি চলে গেলেও ভুলো চলে যায়নি।'

'তাহলে ভুলো এখন আপনার বাড়ি পাহারা দিচ্ছে?'

'অ্যাঁ?' ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। 'তাই তো! ওর কথা কাল থেকে আমার খেয়ালই নেই। ভুলোকে আমি কাল থেকে দেখেছি, না দেখিনি? হুঁ, দেখিনি। কী আশ্চর্য! ভুলো কি তাহলে দিদির কাছে চলে গেছে? অকৃতজ্ঞের কাণ্ড দেখেছেন?'

'আপনি ফিরে গিয়ে ওর খোঁজ নিন। দেরি করবেন না।'

পাঁচুগোপালবাবু তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আর একটি কথাও না বলে হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।...

এতক্ষণ চুপচাপ বসে এইসব কথা শুনছিলুম। এবার দেখলুম আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিদ এবং রহস্যভেদী কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চোখ বুজে সাদা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন। চওড়া টাক বড্ড বেশি চকচক করছে। একটু হেসে বললুম, 'আশ্চর্য কর্নেল! আপনি অন্ধকারে ঢিল ছোড়েন এবং দিব্যি সেই ঢিল লক্ষ্যভেদও করে।'

কর্নেল চোখ খুলে জোরে মাথা দোলালেন। 'অন্ধকারে? নাহ জয়ন্ত। আমি আলোতেই ঢিল ছুড়েছি।'

'জুতো চুরির কথা আপনি জানতেন তাহলে?'

'নাহ। ভদ্রলোককে আমি কস্মিনকালেও চিনি না। তবে গঙ্গার ধারে ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার গোকুলবাবুকে চিনি। গত এপ্রিলে বাবুগঞ্জে উনি আমাকে কয়েকটা অর্কিডের খোঁজ দিয়েছিলেন।' কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটা যত্ন করে ধরিয়ে বললেন, 'জুতোর ব্যাপারটা তুমিও আঁচ করতে পারতে, যদি ওঁর কথাগুলো লক্ষ করতে। তাক বুঝে প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর বেরিয়ে আসে।'

'কিন্তু সাধুবাবার ব্যাপারটা?'

‘ডার্লিং! বরাবর দেখে আসছি, কাগজের লোক হয়েও তুমি কাগজ খুঁটিয়ে পড় না। তোমাদের ‘দৈনিক সত্যসেবক’ পত্রিকাতেই বাবুগঞ্জের সাধুবাবা নিখোঁজ এবং রক্তের খবরটা বেরিয়েছে।’

‘বেশ। কিন্তু কুকুরের ব্যাপারটা?’

‘পাঁচুগোপালবাবুর মুখেই শুনেছ, কুকুর চ্যাঁচালে ভূতুড়ে শব্দ থেমে যেত। কাজেই একটা কুকুর থাকার চান্স ছিল।’

‘তাহলে ভূত আসলে জুতো চুরি করতেই আসত।’

‘বাহ্।’ কর্নেল হাসলেন। ‘ক্রমশ তোমার বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে।’

‘রীতিমতো রহস্যজনক ঘটনা। কুকুরটাও নিপাত্তা হয়ে গেল সাধুবাবার মতো?’

‘এবং তিন জোড়া জুতোও নিপাত্তা হয়ে গেছে।’

‘কিন্তু কুকুরের জন্য ভদ্রলোক প্রায় গুলতির বেগে বেরিয়ে গেলেন কেন বলুন তো?’

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। আবার চোখ বুজে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন এবং চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে ওঁকে আপনমনে বিড়বিড় করতে শুনলুম, ‘খাজাঞ্চি! আগের দিনের রাজা খেতাবধারী বড়ো জমিদারদের খাজাঞ্চিখানা থাকত। ট্রেজারি! খাজাঞ্চি ঠিক ক্যাশিয়ার নয়, ট্রেজারার। সে আসলে খুব সম্মানজনক পদ। তবে খুব আস্থাভাজন লোক হওয়া চাই। আস্থা! খুব গুরুত্বপূর্ণ এই শব্দটা-আস্থা।’

ষষ্ঠীচরণ আর এক প্রস্থ কফি রেখে গেল। বললুম, ‘কর্নেল! কফি!’

‘হ্যাঁ। কফি খেয়েই আমরা বেরোব।’ কর্নেল চোখ খুলে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। তারপর মিটিমিটি হেসে বললেন, ‘আমরাও গুলতির বেগে বেরিয়ে যাব। বাসে মাত্র ঘণ্টা তিনেকের জার্নি। পৌঁছেই লাঞ্চ খাওয়া যাবে।’

বাবুগঞ্জ গঙ্গার ধারে বেশ জমকালো শহর। টেলিফোন এক্সচেঞ্জও আছে। সরকারি ডাকবাংলো শহরের শেষ প্রান্তে। গাছপালা-ঘেরা নিঝুম নিরিবিলি পরিবেশ। কেয়ারটেকার গোকুলবাবু যেন জানতেন কর্নেল তাঁর মামাবাবুর কাছে খবর পেয়েই ছুটে আসবেন। তাই সুস্বাদু ইলিশ সহযোগে চমৎকার একখানা মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। খাওয়ার পর উনি ইনিয়েবিনিয়ে রাজমন্দিরে এক সাধুবাবার আকস্মিক আবির্ভাব এবং রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বর্ণনা করলেন। শেষে বললেন, ‘মামাবাবুর মাথায় ছিট আছে। মা এতকাল দাদামশাইয়ের ভিটে আগলে রেখেছিলেন। এত বলেও আমার কোয়ার্টারে আনতে পারিনি। তারপর মামাবাবু রিটায়ার করে বাড়ি ফিরলেন। অমনই নাকি ভূতের উপদ্রব শুরু হল। আসলে ভূত-টুত, জুতো চুরি বোগাস। মামাবাবুর পাগলামিতে অতিষ্ঠ হয়েই মা অগত্যা আমার কাছে চলে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ আগে মামাবাবু আপনার কাছ থেকে ফিরে আবার এক পাগলামি করতে এসেছিলেন। খামোকা ঝগড়াঝাঁটি!’

কর্নেল বললেন, ‘ভুলোর জন্যে?’

‘আপনি শুনেছেন?’ গোকুলবাবু হাসলেন। ‘ভুলো মায়ের পোষা দিশি কুকুর। কিন্তু আমি থাকি সরকারি কোয়ার্টারের দোতলায়। ভুলো বিলিতি হলে কথা ছিল। তা ছাড়া যা বিচ্ছিরি চ্যাঁচায়। মামাবাবুর ধারণা, ভুলো মায়ের কাছে পালিয়ে এসেছে। এলেও এই

এরিয়ায় ঢুকবে কেমন করে? এক এরিয়ার কুকুর অন্য এরিয়ায় গেলে কুকুরগুলো তাকে ঢুকতে দেবে?'

চলে যাওয়ার আগে গোকুলবাবু জানিয়ে গেলেন, তাঁর মামাবাবুর জুতো চুরির ব্যাপারটা নয়, সাধুবাবার হত্যা রহস্যের ব্যাপারে তাঁর খটকা লেগেছিল। সেইজন্যই ওঁকে কর্নেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

বাসজার্নির ধকল এবং লাঞ্চের পর ভাতঘুমের অভ্যাস আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। কর্নেলের ডাকে উঠে বসলুম। গঙ্গার ওপারে সূর্য সবে অদৃশ্য হয়েছে। দিনের আলো কমে গেছে। চারদিকে পাখিরা তুমুল চ্যাঁচামেচি করছে। কর্নেল পিঠ থেকে কিটব্যাগ খুলে টেবিলে রেখেছিলেন। জিজ্ঞেস করলুম, 'প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছিলেন, না কি অকির্ডের খোঁজে?'

'নাহ। জুতোর খোঁজে।'

হেসে ফেললুম। 'আপনি কি ভেবেছিলেন চোর আপনাকে পাঁচুগোপালবাবুর জুতো ফেরত দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে?'

'কতকটা তা-ই।' কর্নেল তুম্বো মুখে বললেন। 'তবে এভাবে ফেরত দেবে ভাবিনি।'

অবাক হয়ে বললুম, 'কীভাবে?'

'জুতো মেরে।' কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বিষণ্ণভাবে বললেন, 'হ্যাঁ। জুতো মারা আর কাকে বলে? ছ-পাটি ছেঁড়া পামশু আমাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারা। একপাটি আমার টাকে পড়তে যাচ্ছিল। মাথা না সরালে পেরেকে রক্তারক্তি হয়ে যেত। সোল ওপড়ালে সব জুতোরই পেরেক বেরিয়ে থাকে। যেই একটা নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে মুখ তুলেছি, অমনই টুপিটা পড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জুতো ছুড়েছে!'

'বলেন কী! কোথায়?'

'রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপের ভেতর। চিন্তা করো জয়ন্ত, সোল-ওপড়ানো পেরেক-বেরোনো জুতো।'

'সোল-ওপড়ানো জুতো?' আরও অবাক হয়ে বললুম, 'তাহলে কি পাঁচুগোপালবাবুর জুতোর ভেতর কিছু লুকোনো ছিল?'

'পর পর তিন জোড়া জুতো চুরি যাওয়ার কথা শুনেই সেটা তোমার মাথায় আসা উচিত ছিল। বিশেষ করে সেকালের এক জমিদারবাড়ির ট্রেজারারের পৌত্রের জুতো।'

এই সময় উর্দিপরা একটা লোক ট্রেতে কফি নিয়ে এল। সে সেলাম দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কর্নেল ডাকলেন, 'রামহরি!' সে কাছে এলে কর্নেল বললেন, 'তুমি তো এখানকার লোক। রাজমন্দিরের সেবায়েত ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে কে কে আছে এখন?'

রামহরি বলল, 'ঠাকুরমশাইয়ের তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে নেই! এখন শুধু গিন্নিঠাকরুন আছেন। ঠাকুরমশাই তো বাতের অসুখে বিছানায় পড়ে আছেন।'

'ঠাকুরমশাইয়ের কোনো ভাই বা জ্ঞাতি নেই?'

'এক ভাই ছিল। বনিবনা হত না। ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল। সে প্রায় তিন-চার বছর আগের কথা স্যার। শুনেছি সে জেলখানায় আছে। চুরি-ডাকাতি করে

বেড়াত। সেই নিয়েই তো দাদার সঙ্গে ঝগড়া।'

'ঠিক আছে। তুমি এসো রামহরি।'

রামহরি চলে গেলে কর্নেল চুপচাপ কফি খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'চলো। ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি যাই।'

বিদ্যুতের আলোয় বাবুগঞ্জ ঝলমল করছিল। বড়ো রাস্তায় পৌঁছে কর্নেল একটা সাইকেলরিকশো নিলেন। সন্ধ্যেরাতেও প্রচণ্ড ভিড়। রিকশোওয়ালা অনেক ঘিঞ্জি গলি পেরিয়ে একখানে থেমে বলল, 'আর যাওয়া যাবে না স্যার। পায়ে হেঁটে চলে যান। আমি বলেই এলুম। অন্য কেউ কিছুতেই আসবে না।'

কর্নেল বললেন, 'কেন হে? ভূতের ভয়ে নাকি?'

রিকশোওয়ালা কপালে-বুকে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'ঠাট্টাতামাশার কথা নয় স্যার! এই তল্লাটে দিনদুপুরে কেউ পা বাড়ায় না আজকাল। যাচ্ছেন যান। তবে সাবধানে যাবেন।'

সে রিকশো ঘুরিয়ে উধাও হয়ে গেল। এদিকটায় বিদ্যুৎ নেই। কর্নেল টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেলেন। ওঁকে অনুসরণ করলুম। ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল। একফালি আঁকাবাঁকা পথ। সামনে মিটমিটে আলো জ্বলছিল। কর্নেলের টর্চের আলোয় একটা জরাজীর্ণ এক-তলা বাড়ি দেখা গেল। কাছে গিয়ে উনি ডাকলেন, 'ঠাকুরমশাই আছেন নাকি?'

দরজা খুলে এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে কর্নেলকে দেখে যেন চমকে উঠলেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

কর্নেল বললেন, 'কলকাতা থেকে আসছি। একটা কথা বলেই চলে যাব।'

'উনি তো অসুস্থ।'

'নাহ্। কথাটা আপনার সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে? কী কথা?'

'আপনি কি ঠাকুরবাড়িতে সাধুবাবার আসরে যেতেন?'

ভদ্রমহিলা আবার চমকে উঠেই সামলে নিলেন। 'কেন সে-কথা জিজ্ঞেস করছেন বাবা? আপনারা কি পুলিশের লোক? আমরা কোনো সাতে-পাঁচে থাকি না।'

'আমার কথার জবাব দিলে খুশি হব। ঠিক জবাব না পেলে কিন্তু ঝামেলায় পড়বেন।'

কর্নেলের কথার ভঙ্গিতে ভয় পেয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, 'আমরা তো কারও কোনো ক্ষতি করিনি বাবা!'

'আপনি কি সাধুবাবার আসরে যেতেন?'

ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রী আস্তে বললেন, 'একদিন গিয়েছিলুম।'

'শুক্রবার সন্ধ্যেয়?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'কতক্ষণ ছিলেন আসরে?'

'যতক্ষণ ভাগবত পাঠ হল, ততক্ষণ ছিলুম।'

‘সবাই চলে গেলে আপনি কি চুপিচুপি সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?’

ভদ্রমহিলা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, ‘হ্যাঁ। তা-‘

‘আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন কেন?’

ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রী চুপ করে থাকলেন।

‘বলুন। তা না হলে ঝামেলায় পড়বেন কিন্তু।’

এই সময় ঘরের ভেতর থেকে খ্যানখেনে গলায় কে বলে উঠল, ‘বলে দাও না, এত ভয় কীসের? ভূতো নিজের পাপের শাস্তি পেয়েছে। একদিন-না-একদিন সে খুন হতই। যা হয়েছে পুলিশকে বলে দাও সব কথা।’

কর্নেল একটু হেসে বললেন, ‘সাধুবাবাকে আপনি চিনতে পেরেছিলেন। তাই না? সেইজন্যই চুপিচুপি তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কী বলেছিলেন আপনি তখন আপনার ভূতোঠাকুরপোকে?’

ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন। ‘ওকে বললুম, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি আর কিছুদিন থাকলে আরও অনেকে চিনে ফেলবে। তুমি শিগগির পালিয়ে যাও ঠাকুরপো! হঠাৎ সেই রাত্তিরে ঠাকুরপো খুন হয়ে গেল। চাপ চাপ রক্ত!’

কর্নেল বললেন, ‘আপনার ঠাকুরপো ভূতনাথের নামে পুলিশের হুলিয়া জারি করা আছে। এলাকায় কয়েকটা ডাকাতির মামলা ঝুলছে তার নামে।’

‘জানি। সেইজন্যই তো-‘

‘হ্যাঁ। তাই তাকে চিরদিনের জন্য বেঁচে যাওয়ার একটা ফন্দি দিয়েছিলেন। আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি।’

কথাটা বলেই কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। আমি হতবাক হয়ে ওঁকে অনুসরণ করলুম।...

বাংলোয় ফিরে দেখি, পাঁচুগোপালবাবু অপেক্ষা করছেন। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। কর্নেলকে দেখে উত্তেজিতভাবে বললেন, ‘অনেক খুঁজে পেয়ে গেছি স্যার! আপনি যা বলেছিলেন, ঠিক তা-ই।’

কর্নেল বললেন, ‘জুতো?’

‘আজ্ঞে।’ বলে পাঁচুগোপালবাবু ব্যাগে হাত ঢোকালেন।

‘এখানে নয়। আমার ঘরে চলুন।’

ঘরে ঢুকে পাঁচুগোপালবাবু ব্যাগ থেকে দু-পাটি পামশু বের করলেন। জীর্ণ বেরঙা ছেঁড়া বেঢপ জুতো। বললেন, ‘ঠাকুরদার সিন্দুকের তলায় লুকোনো ছিল স্যার। ঠাকুরদার জুতোই মনে হচ্ছে। ইস! কী বিচ্ছিরি গন্ধ।’

কর্নেল জুতোজোড়া নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে টেবিলে রাখলেন। বললেন, ‘এবার আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। রাজবাড়ির ওদিকটায় এতক্ষণে ঘন অন্ধকার। আপনি সেখানে গিয়ে এই গানটা গাইবেন-‘

‘গা-গান? আমি স্যার গান গাইতে পারি না যে!’

‘চেষ্টা করবেন। নিন, মুখস্থ করুন :

চলে আয় ওরে ভূতো

পায়ে দিবি রাঙা জুতো।’

পাঁচুগোপালবাবু অনিচ্ছা অনিচ্ছা করে আওড়ালেন। তারপর করুণমুখ করে বললেন, ‘কে-কেন গান গাইতে হবে স্যার? আমার তো মাথায় কিছু ঢুকছে না!’

‘আপনার জুতোচোর ভূতটাকে ধরতে হবে না? তিন-তিন জোড়া জুতো চুরি করেছে সে। তাকে ধরা উচিত নয় কি?’

এই সময় একজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললেন, ‘বডি পাওয়া গেছে কর্নেলসায়েব! শকুনে প্রায় সাবাড় করেছে। তবে স্কেলিটনটা আছে। বেশি দূরে ভেসে যায়নি। মাত্র দু-কিলোমিটার দূরে একটা খাড়িতে ভাসছিল। মুণ্ডু-কাটা বডি।’

পাঁচুগোপালবাবু লাফিয়ে উঠলেন, ‘সাধুবাবার বডি?’

কর্নেল বললেন, ‘নাহ। আপনার ভুলোর।’

পাঁচুগোপালবাবু আর্তনাদ করলেন, ‘হায়, হায়। ভুলোকে কে মারল?’

‘ভূতো।’ বলে কর্নেল উঠলেন। ‘আপনার ঠাকুরদার জুতোজোড়া নিন। চলুন, ভূতোকে ফাঁদে ফেলা যাক।’

পুলিশ-জিপ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। অফিসার কর্নেলের সঙ্গে চুপিচুপি পরামর্শ করে চলে গেলেন। কর্নেল পাঁচুগোপালবাবুকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললেন।

ঘুরঘুট্টে অন্ধকার এলাকা। এবার কর্নেল টর্চ জ্বালছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে একটা কালো ঢিবির পাশে গুঁড়ি মেরে বসলেন। তারপর পাঁচুগোপালবাবুকে চাপাস্বরে বললেন, ‘সামনে দাঁড়িয়ে জোরে গানটা শুরু করুন।’

ভদ্রলোক কেশে গলা সাফ করে হেঁড়ে গলায় সুর ধরে আওড়ালেন :

‘চলে আয় ওরে ভূতো

পায়ে দিবি রাঙা জুতো।’

বারকতক গাওয়ার পরে কালো ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল ওঁর সামনে। খোনা গলায় বলে উঠল, ‘এঁনেছিস? দেঁ! দেঁ!’

পাঁচুগোপালবাবু চেঁচিয়ে উঠেছিলেন আতঙ্কে। ‘ওরে বাবা! এ যে দেখছি সত্যিই ভূ-ভূ-ভূত!’

অমনিই এদিক-ওদিক থেকে টর্চের আলো জ্বলে উঠল। একটা সাধুবাবার চেহারার লোক পালানোর জন্য লাফ দিতেই কর্নেল গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন। দু-জন কনস্টেবলকে দেখলুম লোকটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। কর্নেল তাঁর দাড়ি-জটা উপড়ে নিয়ে বললেন, ‘ছদ্মবেশী সাধুবাবাকে চিনতে পারছেন না পাঁচুগোপালবাবু? রাজমন্দিরের সেবায়েত ঘনশ্যামবাবুর ছোটো ভাই ভূতনাথ। আপনার ভুলোর মুণ্ডু কেটে রক্ত ছড়িয়ে আত্মগোপন করেছিল। আপনার ঠাকুরদার দু-পাটি জুতোর সোলের ভেতর লুকিয়ে রাখা দশটা সোনার মোহরের খবর বহুদিন আগে ভূতনাথ পেয়েছিল আপনার দিদির কাছে। আপনার দিদি কথায় কথায় মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন ওকে। পরে বুদ্ধি করে বলেছিলেন, সেই মোহর আপনার জুতোর সোলে লুকোনো আছে। তখন আপনি

রেলের চাকরি করেন। ট্রেনে ট্রেনে ঘোরেন। ভূতনাথ তাই সুযোগ পায়নি। আপনি রিটায়ার করে বাড়ি ফেরার পর তাই সে আপনার জুতো চুরির ধান্দা করেছিল। যাই হোক, চলুন। বাংলোয় ফেরা যাক।'

অলৌকিক আধুলিরহস্য

ইদানীং রোজ ভোর বেলা জগিং শুরু করেছি। আমাদের এই ছোটো শহরে অত সকালে রাস্তাঘাট একেবারে নিরিবিলি হয়ে থাকে। তাতে শীতকাল। খেলার মাঠ পেরিয়ে নদীর ধার অবধি গিয়ে বাড়ি ফিরতে এক কিলোমিটার দৌড় হয়ে যায়। গা ঘেমে উঠে।

আমার ভাগনে শ্রীমান ডন টের পেয়ে একদিন বলল, 'চোরটাকে ধরতে পেরেছিলে মামা?'

'চোর? কোথায় চোর?' আকাশ থেকে পড়লুম। 'আমি তো জগিং করছিলুম, হতভাগা! চোর কোথায় দেখলি?'

ডন আকাশ থেকে পড়ল। 'জগিং! ও মামা, জগিং মানে কী? তুমি তো দৌড়োচ্ছিলে।'

গম্ভীর হয়ে বললুম, 'জগিং মানে দৌড়-ব্যায়াম। এতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে। খিদে বাড়ে। জম্পেশ রকমের ঘুম হয়।'

ডন খুশি হয়ে বলল, 'আমিও জগিং করব, মামা।'

'বেশ তো। ভোর ছ-টায় ঘুম থেকে উঠে করিস। তোর তো সাতটার আগে ঘুমই ভাঙে না।'

পরদিন অবশ্য ওকে বিছানা থেকে টেনেই ওঠাতে হল। কিন্তু অতটুকু ছেলে। খেলার মাঠ অবধি গিয়ে 'ধুস' বলে নেতিয়ে বসল! আমি হাসতে হাসতে ধুকুর-ধুকুর দৌড়ে নদীর ধারে রোজকার টার্গেট পোড়োমন্দির চক্কর দিলুম। তারপর খেলার মাঠে এসে দেখি, ডন। ফের পুরোদমে শুরু করেছে। মনে মনে বললুম, 'ভালো! বাহাদুর ছেলে!'

তারপর টের পেলুম ব্যাপারটা। ডন আসলে পাড়ার সেই বদরাগী নেড়ি কুকুরটাকে উচিত শিক্ষা দিতে চলেছে। তার হাতে আধলা ইট। কুকুরটা লেজ গুটিয়ে ঝিলের ধারে রামু ধোপার গাধার পেটের তলা দিয়ে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতে বুঝি গাধাটা অপমানিত বোধ করে চার ঠ্যাং তুলে লাফ দিল। তখন শ্রীমান বেগতিক দেখে থমকে দাঁড়াল। কাছে গিয়ে বললুম, 'খুব হয়েছে। তোমার দ্বারা জগিং

হবে না। বাড়ি এসো।'

ডন ফিক করে হেসে বলল, 'তখন অমন বসে পড়লুম কেন বলো তো মামা?'

'দৌড়োতে পারছিলে না বলে।'

ডন বলল, 'যাঃ! সেজন্যে নাকি! একটা আধুলি পড়ে ছিল যে ওখানে।'

সে আধুলিটা দেখাল। চকচকে নতুন আধুলি। বললুম, 'কার পড়ে-টড়ে গেছে আর কি? ওটা দিয়ে যদি ফের ঘুড়ি কেনার মতলব করিস, গাঁট্টা লাগাব বলে দিচ্ছি। গাছে ঘুড়ি আটকাবে আর আমাকে গাছে চড়তে হবে-কক্ষনো না।'

ডন মনমরা হয়ে বলল, 'তাহলে কী করব বলো না মামা?'

'বরং কোনো ভিখিরিকে দান করে দিস। পুণ্যি হবে।'

বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলুম শীতের রোদে রাস্তার মোড়ে সেই অন্ধ ভিখিরিটা বসে আছে-রোজই থাকে। ডনকে ইশারা করলে সে গম্ভীর মুখে আধুলিটা ভিখিরির মগে ঠকাস করে ফেলে দিয়ে এল। বোঝা যাচ্ছিল, আধুলিটা নিয়ে তার কোনো মতলব ছিল।

সন্ধ্যায় এক কাপ চা নিয়ে আরাম করে বসে একটা গোয়েন্দা গল্পের পাতায় চোখ রেখেছি, ডন এসে বলল, 'মামা, ও মামা! দেখো দেখো-সেই আধুলিটা না?'

ডনের হাতে একটা আধুলি ছিল। সেটা কুড়িয়ে-পাওয়া আধুলিটার মতোই নতুন এবং চকচকে বটে। বললুম, 'সেই আধুলিটা, কী বলছিস? এটা তুই তো ঠকাস করে ভিখিরির মগে ফেললি সকালে?

ডন চোখ বড়ো করে বলল, 'অবাক, মামা, অবাক! পিসিমা একটা টাকা দিয়েছিল আমাকে, জান তো? টাকাটা নিয়ে গেলুম হাবুবাবুর দোকানে খাতা কিনতে। এই দেখো খাতাটা।'

সে খাতাটা দেখাল। বিশ্বাস করে বললুম, 'আধুলিটা বুঝি হাবুবাবু দিলেন?'

ডন চাপা গলায় বলল, 'দিলেন তো! ও মামা, এটা সেই আধুলিটা-সত্যি বলছি, দেখো না ভালো করে। ঠিক সেইটে। কুড়িয়ে পেতে কতক্ষণ ধরে দেখছিলুম না? সেই লাল ফুটকিটা পর্যন্ত। দেখতে পাচ্ছ?'

তর্ক করে লাভ নেই ওর সঙ্গে। ঝামেলা বাড়বে। হাত বাড়িয়ে বললুম, 'ওটা আমায় দে। তার বদলে তোকে আট আনা দিচ্ছি।'

ডন এক-পা পিছিয়ে বলল, 'উঁহু! এটা দিয়ে আমি ম্যাজিক করব না বুঝি?'

'বেশ, তাই করিস। যা এখন!'

ডন বলল, 'তুমি বিশ্বাস করলে না তো? ঠিক আছে। কাল ভোর বেলা জগিং করবার সময় ফের এটা ভিখিরিকে দেব। দেখবে, ফের ঘুরে আসবে আমার হাতে।'

পরদিন ওকে ঘুম থেকে ওঠাতে হল না। আমাকেই বরং ওই ওঠাল। মামা-ভাগনে মিলে ঠান্ডা হিমে ভোর বেলায় ধুকুর-ধুকুর দৌড় শুরু করলুম। আজ ওর খাতিরে একটু আস্তে। নদীর ধারে পোড়োমন্দির ঘুরে খেলার মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছে লক্ষ করলুম ডনটা একটুও কাবু হয়নি। রহস্যটা কী?

মোড়ের অন্ধ ভিখিরিকে দেখে আধুলিটার কথা মনে পড়ল। বললুম, ‘হ্যাঁরে আধুলিটা ওকে দিবি বলেছিলি যে?’

‘দিচ্ছি।’ বলে ডন ভিখিরির কাছে গেল।

ঠকাস শব্দ এবং ভিখিরির আশীর্বাদ শুনে বুঝলুম, মুদ্রাটি যথাস্থানে গেছে।

এদিন ছিল রবিবার। ডন একদফা পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছিল। এগারোটা নাগাদ তার পায়ের ধপ ধপ আওয়াজ শুনলুম। তারপর এক চিক্কুর-‘মামা! মামা! ম্যাজিক, মামা, ম্যাজিক।’ তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকে সে বলল, ‘বলেছিলুম না! এই এই দেখো।’

ওর হাতে সেই আধুলিটার মতোই চকচকে নতুন আধুলি দেখে হাসতে হাসতে বললুম, ‘চালাকি? কোত্থেকে নতুন একটা আধুলি এনে বলছ সেইটে?’

ডন কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, ‘তোমার দিব্যি, মামা! মা পান কিনতে পাঠিয়েছিল। পানওয়ালা এটা দিল। সে আমার হাতে ওটা গুঁজে দিল। তুমি দেখে রাখো না! এই লাল ফুটকিটা দেখছ-ওইটা দেখেই চিনতে পারছি।’

‘ঠিক আছে। আমার কাছে থাক এটা। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখবখন।’

ডন ছোঁ মেরে আধুলিটা তুলে নিয়ে ছিটকে সরে গেল। রাগী মুখ করে বলল, ‘দিচ্ছি তোমায়! অত করে মা-র কাছে বকুনি খেয়ে এটা ফিরে পেলুম। এ দিয়ে ম্যাজিক করব।’

পরদিন ভোরে জগিং করতে গিয়ে নদীর ধারে পোড়োমন্দির চক্কর দিচ্ছি, হঠাৎ খেয়াল হল শ্রীমান সঙ্গে নেই। ঘুরে দেখি অনেকটা দূরে খেলার মাঠে ছোট্টটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেতেই ভ্যাঁ করে বলল, ‘আধুলিটা হারিয়ে গেছে মামা!’

রাগ করে বললুম, ‘বেশ হয়েছে হতভাগা ছেলে! আধুলি হাতে নিয়ে কেউ দৌড়োয়?’

ডন আমাকে খামচে ধরে থামাল। তারপর চোখ মুছতে মুছতে বলল, ‘খুঁজে দাও না মামা। আমার ম্যাজিক করা হবে না যে।’

ঘাসে শিশির চকচক করছে। সূর্যটা সবে বিছানা থেকে উঠে বসে হাই তুলছে। পিটপিটে চাউনি। তার ওপর উত্তুরে হাওয়ার ঠান্ডাহিম দুষ্টুমি। এমন সময় একটা আধুলি খুঁজে বের করা বড়ো কষ্টসাধ্য কাজ। ডনের খাতিরে তবু অনেক কষ্ট করতে হল। কিন্তু তার পাত্তা পাওয়া গেল না। ডনকে বললুম, ‘ঠিক এখানেই পড়েছে তার মানে কী? অন্য কোথাও ফেলেছিস তাহলে।’

ডন জোরের সঙ্গে বলল, ‘এখানেই।’

কিন্তু প্রচণ্ড খুঁজেও আধুলিটা পাওয়া গেল না। কাজেই আমাদের পায়ের শব্দে রাস্তার মোড়ের অন্ধ ভিখিরি নড়েচড়ে বসলেও তার মগে ঠকাস করে সেই মিঠে শব্দটা বাজল না। বেচারা নিশ্চয় খুব মনমরা হয়ে গেল।

মনমরা হয়ে রইল শ্রীমানও। শরীর খারাপ বলে স্কুলে গেল না। বিকেল নাগাদ ভাবলুম ছেলেটাকে চাঙ্গা করা উচিত। আমার ডাক শুনে ডন চোখ পিটপিট করতে করতে ঘরে ঢুকল। তারপর নিজের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কী?’

ওকে টেনে আদর করে বললুম, 'যা হবার হয়ে গেছে! ও নিয়ে মনখারাপ করে লাভ নেই। চল, বাইরে কিছুক্ষণ ঘুরে আসি। মন ভালো হয়ে যাবে।'

ডন ঘাড় গোঁজ করে বলল, 'যাব-একটা আধুলি দাও, নতুন আধুলি না হলে নেব না কিন্তু।'

'আধুলি?' চিন্তিত হয়ে বললুম। 'আধুলি যদি না থাকে, সিকি হলে চলবে না?'

ডন ঠোঁটের কোনায় কেমন একটু হাসল। 'তোমার টেবিলের ড্রয়ার খুঁজে দেখো না।'

টেবিলের ড্রয়ারে খুচরো পয়সা রাখি, একথা সত্য। ডনের এ-খবর না জানার কথা নয়-এ-বাড়ির কারুরই নয়। খুঁজতে গিয়ে পেয়েও গেলুম একটা আধুলি। এবং চকচকে আনকোরা আধুলিটা। ডনের তর সইল না, খপ করে কেড়ে নিল। তারপর উলটে-পালটে দেখতে দেখতে আচমকা এক চিল-চিক্কুর ছাড়ল, 'মামা, ও মামা! ম্যাজিক, মামা, ম্যাজিক!'

অবাক হয়ে বললুম, 'কী রে?'

'সেই লাল ফুটকিটা।' ডন নাচতে নাচতে বলল। 'আমার আধুলি। আমার আধুলি। দেখো দেখো!'

হাঁ করে তাকিয়ে ছিলুম। ওর হাত থেকে আধুলিটা নিয়ে আরও অবাক হলুম। একী! সত্যি সেই লাল ফুটকিওয়ালা আধুলিটা যে! কোথায় পেলুম এটা-কার, কিছুতেই মনে পড়ল না। কিন্তু জিনিসটা যে অলৌকিক এতে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

আর এ তো ঠিক এই পড়ে-পাওয়া অলৌকিক আধুলি যখন ডনকে ভালোবেসে ফেলেছে, তবে ডন এটা মোড়ের অন্ধ ভিখিরিকে দিক কিংবা হারিয়ে ফেলুক, আবার তার কাছে এ-হাত সে-হাত ঘুরে ফিরে আসবেই। নিজেকে চেনাবার জন্যে কপালে একটা লাল ফুটকি তো থাকবেই। সুতরাং ডন দৌড়ে বেরিয়ে গেলে ওর দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। এমন ভাগনের মামা হওয়াটাও তো কম গর্বের কথা নয়।

ছক্কা মিয়ার টমটম

এ-মুলুকে রাতবিরেতে বাস ফেল করলে ছক্কা মিয়ার টমটম ছাড়া আর উপায় ছিল না। ঝড়-বৃষ্টি হোক, মহাপ্রলয় হোক, রাতের বেলা ভীমপুর গদাইতলা দশ মাইল পিচের সড়কে যদি কষ্ট করে একটু দাঁড়িয়ে থাকা যায়, ছক্কা মিয়ার টমটমের দেখা মিলবেই মিলবে। অন্ধকার ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে প্রথমে ঠাহর হবে এক চিলতে টিমটিমে আলো। তারপর আলোটা এগিয়ে আসবে আর মেঘের ডাকাডাকি যতই থাক, কানে বাজবে অদ্ভুত এক আওয়াজ টং লং...টং লং। বিদ্যুতের আলোয় হঠাৎ চোখে পড়বে কালো এক এক্কাগাড়ি-তেরপলের চৌকো একটা টোপর চাপানো। সামনে কালো এক মূর্তি আর নড়বড় করে দৌড়ানো এক টাট্টু!

মুখে কিছু বলার দরকার নেই। ছক্কা মিয়ার টমটম সওয়ারি দেখামাত্র থেমে যাবে। তখন একলাফে পেছনের তেরপল চাগিয়ে চৌকো টোপরে ঢুকলেই নিশ্চিন্ত। আবার টলতে টলতে চলতে থাকবে ছক্কা মিয়ার টমটম-টং লং... টং লং।

টমটম কথাটা এসেছে ইংরেজি 'ট্যান্ডেম' থেকে-যে-গাড়ির সামনে কয়েক সার ঘোড়া যেত। কিন্তু ভীমপুরের ছক্কা মিয়ার এক্কাগাড়ির ঘোড়া মোটে এক। তবু আদর করে লোকে নাম দিয়েছিল টমটম।

ছক্কা মিয়ার চেহারাটা কিন্তু ভারি বদরাগী। ঢ্যাঙা, টিংটিঙে রোগা, একটু কুঁজো গড়ন। লম্বাটে মুখের বাঁকানো নাকের তলায় পেল্লায় গোঁফ। চামড়ার রং রোদপোড়া তামাটে।

তেমনি তার টাট্টুও। যেমন মনিব, তেমনি ঘোড়া। হাড়-জিরজিরে লম্বাটে গড়ন। ঠ্যাং চতুষ্টয় যেন চারখানি কাঠি। মাথাটা দেখে সময় সময় ঠাহর করা কঠিন, এই প্রাণীটি সিঙ্গি, না প্রকৃত একটি ঘোড়া। হ্রেষাধ্বনি করলেই পিলে চমকে ওঠে। ভীমপুর বাজারের তাবৎ নেড়িকুকুর দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায় লেজ গুটিয়ে।

লোকে আজকাল রাস্তা চলতে বাস-রিকশোই পছন্দ করে। ছক্কা মিয়ার টমটম চড়লে হাড়-মাংস দলা পাকাতে থাকে বলেও না, কালের রেওয়াজ আসলে।

কিন্তু ওই যে বলেছি, রাতবিরেতে বাস ফেল করলে তখন উপায়? ছক্কা মিয়া এটা বোঝে এবং দিনে তার টমটমের বাহনটিকে নিয়ে বনজঙ্গল বা ঝিলে চরিয়ে বেড়ায়।

রাতের বেলা ছোট্ট বাজারের চৌরাস্তায় শিরীষ গাছের তলায় ঘাপটি পেতে বসে থাকে। পাশেই টমটম রেডি।

সেবার পুজোর সময় কলকাতা থেকে ছোটোমামার সঙ্গে আসছি। মাঝপথে একখানে ট্রেন দাঁড়িয়ে রইল তো রইল। আর নড়ার নাম নেই। ব্যাপার কী? না-আগের স্টেশনে মালগাড়ি বেলাইন। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। তারপর যখন ট্রেনের চাকা গড়াল, ছোটোমামা বেজার মুখে বললেন, 'বরাতে আবার হতচ্ছাড়া ছক্কা মিয়ার টমটম আছে। বাপস!'

ওই টমটমে কখনো চাপিনি। তাই কথাটা শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল। বললুম, 'খুব মজা হবে তাই না ছোটোমামা?'

ছোটোমামা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'মজা হবে। বুঝবে ঠ্যালাটাখন।'

ঠ্যালাটা কীসের বুঝলুম না আগেভাগে। দেখলুম, ছোটোমামা ট্রেনের জানলা দিয়ে মুণ্ডু বাড়িয়ে বারবার যেন আকাশ দেখছেন। একটু পরে বললেন, 'খুব ঝড়-বৃষ্টি হবে! কার মুখ দেখে যে বেরিয়েছিলুম। বড়দা অত করে বললেন, তবু থাকলুম না। ছ্যা ছ্যা, আমার কী আক্কেল!'

ভীমপুর স্টেশনে যখন নামলুম, তখনও কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির পাত্তা নেই। রাত একটা বেজে গেছে। বাজার নিশুতি। চৌমাথায় শিরীষতলায় গিয়ে দেখি, ছক্কা মিয়ার টমটম দাঁড়িয়ে আছে। বলা-কওয়া নেই, দরদস্তুর নেই, ছোটোমামা টমটমের পেছন দিকে তেরপল তুলে ঢুকে ডাকলেন, 'হাঁ করে দেখছিস কী? উঠে আয়। এখুনি একগাদা লোক এসে ভালো জায়গা দখল করে ফেলবে যে।'

ভেতরে খড়ের পুরু গাদার ওপর তেরপল পাতা। কেমন একটা বিচ্ছিরি গন্ধ। অন্ধকারও বটে। যেন এক গুহায় ঢুকেছি। সামনে সরে গিয়ে ছোটোমামা পর্দাটা ফাঁকা করে রাখলেন। একটু পরে আরও জনা দুই লোক ভেতরে ঢুকে পড়ল। সে এক ঠাসাঠাসি অবস্থা।

আর তারপরেই আচমকা চিক্কুর ছেড়ে মেঘ ডাকল এবং শনশন করে এসে গেল একটা জোরালো হাওয়া। ছোটোমামা বললেন, 'ওই যা বলেছিলুম। হল তো?'

ছক্কা মিয়া সামনের আসন থেকে ঘোষণা করল, 'আরাম করে বসুন বাবুমশাইরা! এবার রওনা দিই।' তবে ঘোড়াটাও মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চিঁ হিঁ হিঁ ডাক ছেড়ে যখন পা বাড়াল, তখন টের পেলুম কেন ছোটোমামা 'বাপস' বলে মুখখানা তুম্বো করেছিলেন।

সত্যি 'বাপস'। হাড়গোড় মড়মড়িয়ে ভেঙে যাবার দাখিল। বাইরে হাওয়ার হইচই মেঘের হাঁকডাক যত বাড়ছে, ছক্কা মিয়ার ঘোড়াটাও তত যেন তেজি হয়ে উঠছে। একটু পরেই দড়বড়িয়ে বৃষ্টির ফোঁটা টোপরের তেরপলে পড়তে শুরু করল। ছোটোমামা ফাঁকটুকু বন্ধ করে দিলেন। আমি তখন অবাক। ছক্কা মিয়া বাইরে বসে চাবুক হাঁকাচ্ছে। ওর বৃষ্টির ছাট লাগবে না?

রাস্তাটা ঘুরে রেললাইন পেরোলে দু-ধারে বিশাল আদিগন্ত মাঠ। ফাঁকা জায়গায় ঝড়-বৃষ্টিটা মিয়ার টমটমকে বেশ বাগে পেল। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি উলটে গিয়ে রাস্তার ধারের গভীর খালে নাকানিচুবানি খাবে। আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে সেও ভাববার কথা।

কিন্তু আশ্চর্য, টমটম সমান তালে নড়বড়িয়ে টলতে টলতে চলছে। মাঝে মাঝে ঝড়-বৃষ্টির শব্দের ভেতর শোনা যাচ্ছে অদ্ভুত এক শব্দ-টং লং... টং লং... টং লং। কখনো ছক্কা মিয়ার টাট্টুঘোড়া বিকট চিঁ হিঁ করে চেঁচিয়ে উঠছে। তারিফ করে আমার পেছন থেকে এক সওয়ারি বলে উঠলেন, 'পক্ষীরাজের বাচ্চা!'

এতক্ষণে তেরপলের টোপর থেকে ফুটো দিয়ে জল চোঁয়াতে থাকল। সওয়ারিরা নড়েচড়ে বসার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সরবে কোথায়? বেহদ্দ ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছিল জামাকাপড়। একসময় ছোটোমামা বাজখাঁই চেঁচিয়ে বললেন, 'ঃআ! হচ্ছে কী, হচ্ছে কী মশাই? আমার ওপর পড়ছেন কেন?'

'আপনার ওপর আমি পড়লুম, না আপনি আমার ওপর পড়লেন?'

'কী বাজে কথা বলছেন? আমায় ঠান্ডা করে দিয়ে আবার তক্ক? আপনি মানুষ, না বরফ?'

'আমি বরফ? আপনিই তো বরফ। ইস। কী ঠান্ডা! হাড় অবধি জমে গেল দেখছেন না!'

আমার পিছনের সওয়ারি চাপা খিক খিক করে হেসে আমার কানের ওপর বলল, 'ঝগড়া বেধে গেছে। বরাবর যায়, বুঝলেন তো মশাই? ছক্কা মিয়ার টমটমের এই নিয়ম। খিক খিক খিক খিক।'

এমন বিদঘুটে হাসি কখনো শুনিনি। কিন্তু এঁর শ্বাস-প্রশ্বাসও যে বরফের মতো হিম। বললুম, 'ইস। একটু সরে বসুন না। বড্ড ঠান্ডা করে যে।'

লোকটা ভারি অদ্ভুত! সে ওই বিদঘুটে খিক খিক করে হাসতে হাসতে আরও যেন ঠেসে ধরল আমাকে। চেঁচিয়ে উঠলুম, 'ছোটোমামা! ছোটোমামা!'

কিন্তু ছোটোমামার কোনো সাড়া পেলুম না। টোপরের ভেতরটা ঘন অন্ধকার। ফের ডাকলুম, 'ছোটোমামা! কোথায় তুমি?'

লোকটা সেই খিক খিক হাসির মধ্যে বলল, 'আর ছোটোমামা বড়োমামা! মামারা এখন রাস্তায় পড়ে কুস্তি করছে।'

হতভম্ব হয়ে হাত বাড়িয়ে ছোটোমামাকে খুঁজলুম। সুটকেসটা হাতে ঠেকল। কিন্তু ছোটোমামা নেই। তারপর পেছনের দিকে চোখ পড়ল। ওদিককার পর্দাটা যেন ফর্দাফাঁই। বৃষ্টির ছাট এসে ঢুকছে। আমি প্রচণ্ড চেঁচিয়ে বললুম, 'ছক্কা মিয়া! ছক্কা মিয়া! গাড়ি থামাও! গাড়ি থামাও!'

পেছনের সওয়ারি ফের সেই বিদঘুটে হাসি হেসে উঠল। এবার আমি সামনের পর্দা ঠেলে সরিয়ে ছক্কা মিয়ার ভেজা জামা খামচে ধরলুম। 'গাড়ি থামাও গাড়ি থামাও বলছি।'

এতক্ষণে যেন ছক্কা মিয়া আমার কথা শুনতে পেল। ঘুরে বলল, 'কী হয়েছে বাবুমশাই?'

'ছোটোমামা পড়ে গেছেন কোথাও।'

ছক্কা মিয়া বলল, 'বালাই ষাট। পড়বেন কোথায়? ঠিকই আছেন। খুঁজে দেখুন না।'

'নেই। তুমি গাড়ি থামাবে কি না বলো।'

'সামনে একটা মন্দির আছে! সেখানে থামাব।' ছক্কা মিয়া চাবুক নেড়ে ঘোড়াটাকে খুঁচিয়ে দিয়ে বলল, 'যেখানে-সেখানে থামলে ঝড়-বৃষ্টিতে কষ্ট পাবেন বাবুমশাই। বুঝলেন না? ওইখানে থামিয়ে আপনার ছোটোমামাকে খুঁজবেন বরঞ্চ।'

মন্দিরের আটচালার সামনে গাড়ি দাঁড়ানোর সঙ্গেসঙ্গে আমি ছক্কা মিয়ার পাশ দিয়ে লাফ দিলুম। তারপর আটচালায় ঢুকে পড়লুম। বুদ্ধি করে ছোটোমামার সুটকেস আর আমার কিটব্যাগটাও দু-হাতে নিয়েছিলুম।

কিন্তু আটচালায় ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে দেখলুম, ছক্কা মিয়ার টমটম বৃষ্টির মধ্যে আচমকা গড়াতে শুরু করেছে। ঘোড়াটা চিঁ হিঁ হিঁ ডাক ডেকে তেমনি নড়বড়ে পায়ে দৌড়োতে লেগেছে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। মুখে কথাটি পর্যন্ত আর ফুটল না। ভারি অদ্ভুত লোক তো ছক্কা মিয়া!

এখন ঝড়টা প্রায় কমে এসেছে। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। নির্জন আটচালায় দাঁড়িয়ে আছি। প্যান্ট-শার্ট ভিজে চবচব করছে। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা আর কি!

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুতের আলোয় দেখি, কে যেন আসছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'কে কে?'

ছোটোমামার সাড়া এল। 'অন্তু নাকি রে?'

আমি কাঁদো-কাঁদো গলায় বললুম, 'হ্যাঁ! তোমার কী হয়েছিল ছোটোমামা?' ছোটোমামা আটচালায় ঢুকে বললেন, 'কী হবে আবার। যা হবার, তাই হয়েছিল। তবে ব্যাটাকে এবার যা জব্দ করেছি, আর কক্ষনো ছক্কা মিয়ার টমটমে ভুলেও চড়তে আসবে না।'

ছোটোমামা আমার কাছে সুটকেস দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'জানতুম, তুই ঠিকই নেমে পড়ে আমার অপেক্ষা করবি কোথাও।'

'কিন্তু লোকটা কোথায় রইল?'

হাসলেন ছোটোমামা। 'ওকে তুই লোক বলছিস এখনও? ওটা কি লোক নাকি?'

'তবে কে?'

'বুঝলি নে? ওর ঘাড়ে একটা চন্দ্রবিন্দু বসিয়ে দে, তাহলে বুঝবি। যাকগে, এখন রাতবিরেতে ও নিয়ে আলোচনা করতে নেই। ব্যাপারটা কী জানিস অন্তু? রাতবিরেতে অমন দু-একজন সওয়ারি ছক্কা মিয়ার টমটমে উঠে পড়বে। তারপর কী করবে জানিস? অন্ধকারে ঘাড় মটকানোর তাল করবে। যেই টের পেয়েছি আমার পেছনের লোকটার মতলব কী, অমনি ওকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যাটা পড়বার সময় অ্যায়সা হ্যাঁচকা টান মেরেছে যে আমিও ওর সঙ্গে তেরপলের ফাঁক দিয়ে নীচে পড়েছি।'

'তারপর? তারপর ছোটোমামা?'

'তারপর আর কী? ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় কুংফু জুডো যা-সব অ্যাদ্দিন কষ্ট করে শিখেছি, চালিয়ে গেলুম। এক প্যাঁচে ওকে এমন করে ছুড়লুম যে একেবারে বিশ ফুট গভীর খাদে গিয়ে পড়ল। এতক্ষণ কোনো বাজ পড়া ন্যাড়া গাছের ডগায় বসে হিঁপিয়ে হিঁপিয়ে কাঁদছে।' ছোটোমামা হাসতে হাসতে গায়ের জামা খুলে নিংড়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'ঘণ্টা তিনেক কাটাতে পারলেই ফার্স্ট বাস পেয়ে যাব। জামাটা নিংড়ে নে। ব্যাগ থেকে তোয়ালে বের করে মাথা মুছে ফেল। বাপস!'

আমি শুধু ভাবছিলুম, তাহলে আমার পেছনকার সেই সওয়ারিও কি লোক নয়, সেই লোকটিও কি আমার ঘাড় মটকানোর তালে ছিল? অন্য লোকটার মতো?

আমার মুখ দিয়ে ছোটোমামার প্রতিধ্বনি বেরিয়ে গেল, 'বাপস!...'

ছক্কা মিয়ার টমটমে তারপর আর ভুলেও চাপার কথা ভাবতুম না। কিন্তু বছর দশেক পরে, যখন কিনা আমি পুরোপুরি সাবালক, একরাতে ভীমপুর স্টেশনে নেমে শুনলুম, লাস্ট বাস চলে গেছে।

স্টেশনবাজার তখন নিজঝুম। সময়টা শীতের। আকাশে একটুকরো চাঁদও আছে। কিন্তু কুয়াশার ভেতর তার দশা বেজায় করুণ। একটা চায়ের দোকান খোলা ছিল। শীতের রাত বারোটায় চাওয়ালা সবে ঝাঁপ ফেলার জোগাড় করছিল, আমাকে দেখে বুঝি তার দয়া হল। এক কাপ চা খাইয়ে দিল। শেষে বলল, 'বাবুমশাই তাহলে যাবেন কীসে গদাইতলা?'

'কীসে আর যাব? বরং দেখি যদি ওয়েটিং রুমে রাতটা কাটানো যায়।'

চাওয়ালা মুচকি হেসে বলল, 'ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারেন।'

ছক্কা মিয়ার টমটমের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। সেবার ঝড়-বৃষ্টি ছিল কম। ছোটোমামা বড়ো গপ্পে-মানুষ ছিলেন।

হনহন করে চৌমাথায় চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, শিরীষতলায় আগুন জ্বেলে বসে আছে সেই আদি অকৃত্রিম ছক্কা মিয়া। পাশেই তার টমটম তৈরি। ঘোড়াটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে। শীত বাঁচাতে তার পিঠে একটুকরো চটের জামা। বললুম, 'গদাইতলা যাবে নাকি ছক্কা মিয়া?'

ছক্কা মিয়া ইশারায় টমটমে চড়তে বলল।

আজ আর কোনো সওয়ারি এল না দেখে আশ্বস্ত হওয়া গেল। টমটম তেমনি নড়বড় করে চলতে শুরু করল। ঘোড়াটাও বিকট চিঁ হিঁ হিঁ ডাকতে ভুলল না। অবিকল সব আগের মতোই আছে। এমনকী ছক্কা মিয়ার পেল্লায় গোঁফটারও ভোল বদলায়নি। আর সেই অদ্ভুত ঘণ্টার শব্দ, টং লং... টং লং... টং লং।

কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। তেরপলের ঘেরাটোপের ছেঁদা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে উত্যক্ত করছিল। জড়োসড় হয়ে কোনা ঘেঁষে রইলুম। সামনেকার মোটা ছেঁদা দিয়ে বাইরে কুয়াশামাখানো জ্যোৎস্নায় ঝিমধরা মাঠ-ঘাট চোখে পড়ছিল। গাছগুলো আগাপাশতলা কুয়াশার আলোয়ান চাপিয়েছে; আর মাথায় পরেছে কুয়াশার টুপি। টুকরো চাঁদখানা ছেঁড়া ঘুড়ির মতো একটা ন্যাড়া তাল গাছের ঘাড়ে আটকে গেছে দেখতে পাচ্ছিলুম।

মাইলটাক চলার পর রাস্তার ধার থেকে কে বাজখাঁই হাঁক ছাড়ল, 'রোখো, রোখো!' অমনি টমটম থেমে গেল। ঘোড়াটাও স্বভাবমতো সামনে দু-ঠ্যাং তুলে একখানা চিঁ হিঁ ছাড়ল। তারপর ছক্কা মিয়ার গলা শুনলুম। 'দারোগাবাবু নাকি? সেলাম, সেলাম।'

মুখ বাড়িয়ে দেখি, বিশাল এক ওভারকোট-পরা মূর্তি। সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কোনো এক দারোগাবাবু। বললেন, 'রোসো।' সাইকেলখানা তুলে দিলেন। তারপর যখন টোপরের ভেতর ঢুকলেন, মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। ঢুকেই আমাকে টের পেয়ে চমকানো গলায় বলে উঠলেন, 'কে? কে?'

বললুম, 'আমি।'

'আমি? আমি কি মানুষের নাম হয় নাকি?' বলে দারোগাবাবু টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিলেন। নামধাম বলতেই হল। পুলিশের লোক বলে কথা। সব শুনে উনি বললেন, 'আমি আপনাদের গদাইতলা থানার চার্জে। কিন্তু আপনাকে কখনো দেখিনি।'

বেগতিক দেখে বললুম, 'কলকাতায় আছি বহুকাল। তাই দেখেননি। তা আপনার নামটা জানতে পারি স্যার?'

'বঙ্কুবিহারী ধাড়া।'

'আসামি ধরতে বেরিয়েছিলেন বুঝি?' ওঁকে খুশি করার জন্যেই বললুম।

বঙ্কুদারোগা জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'হুম! ব্যাটা এক দাগি বেগুনচোর ভীষণ ভোগাচ্ছে। আজ একটা বেগুন খেতে দু-জন সেপাই নিয়ে ওত পেতেছিলুম। তাড়া খেয়ে সটান একটা তাল গাছের ডগায় উঠে গেল। তাকে আর নামাতে পারলুম না। তখন সেপাই দু-জনকে তাল গাছের গোড়ায় বসিয়ে রেখে এলুম। আসতে আসতে হঠাৎ সাইকেলের বেয়াদপি।'

দাগি বেগুনচোর এই শীতকালে সারারাত তাল গাছের ডগায় বসে আছে! কিন্তু তার জন্য নয়, হতভাগা সেপাই দু-জনের কথা ভেবে আমার উদবেগ হচ্ছিল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আহা'।

'আহা মানে?' আমাকে ফের টর্চ জ্বেলে সন্দিগ্ধ নজরে দেখে বঙ্কুদারোগা বললেন, 'হুম! আপনি মশাই এই মড়া-বওয়া গাড়িতে এত রাতে চাপলেন যে! আপনি জানেন, আজকাল সওয়ারি জোটে না বলে ছক্কা মিয়া মড়া বয়ে নিয়ে যায় গঙ্গার ঘাটে!'

'বলেন কী! তাহলে তো ভয়ের কথা।' অবাক হয়ে বললুম, 'সত্যি ভয়ের কথা। আগে জানলে...' কথা কেড়ে বঙ্কুদারোগা বললেন, 'হয়তো জেনে-শুনেই চেপেছেন। কিছু বলা যায় না।'

'কেন একথা বলছেন?'

'বলছি আপনার চেহারা দেখে। এমন শুঁটকো রোগা চিপসে বাসি মড়ার মতো লোক সচরাচর দেখা যায় না কিনা।'

এবার আমার খুব রাগ হল। 'কী বলতে চান আপনি?'

'রাতবিরেতে আজকাল ছক্কা মিয়ার টমটমে কে জ্যান্ত, কে মড়া বোঝা যায় না মশাই!'

হাত বাড়িয়ে বললুম, 'এই আমার হাত! পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আমি মড়া না জ্যান্ত!'

বঙ্কুদারোগা আমার হাত সরিয়ে দিলেন জোরে। 'বাপস। এ যে বেজায় ঠান্ডা!'

'ঠান্ডা হবে না? শীতের রাতে এই মাঠের মধ্যে হাত কি গরম থাকবে?'

'না মশাই। এমন রাতে বিস্তর সিঁধেল চোরের হাত পাকড়েছি। তারা কেউ এমন ঠান্ডা ছিল না।'

'কী? আমায় সিঁধেল চোর বললেন!'

বঙ্কুদারোগা গলার ভেতর বললেন, 'সিঁধেল চোরের ভূত হতেও পারেন। কিচ্ছু বলা যায় না। তখন আহা বলা শুনেই সন্দেহ জেগেছে।'

আর সহ্য হল না। খাপ্পা হয়ে চ্যাঁচালুম, ‘পুলিশ হোন, আর যাই হোন, আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি মশাই।’

দারোগাবাবু ফের মুখের ওপর টর্চ জ্বেলে বললেন, ‘উঁ হুঁ হুঁ। বড্ড এগিয়ে এসেছেন। সরে বসুন। সরে বসুন বলছি!’

মুখের ওপর টর্চের আলো কারই-বা সহ্য হয়! ‘টর্চ নেভান’ বলে টর্চটা ঠেলে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলুম। টর্চটা নিভে গেল। এবং কোথায় ছিটকে পড়ল। কিন্তু এটাই বোধ হয় ভুল হল। আর বঙ্কুদারোগা বিকট গলায় ‘ভূত! ভূত।’ বলে চিক্কুর ছেড়ে আমাকে এক রামধাক্কা মারলেন। টোপরের একপাশে জরাজীর্ণ তেরপলের ওপর কাত হয়ে পড়লুম। তেরপলটা ফরফর করে ছিঁড়ে গেল এবং টাল সামলাতে না পেরে গড়িয়ে নীচে পড়ে গেলুম। কানের পাশ দিয়ে চাকা গড়িয়ে গেল প্রচণ্ড বেগে। পলকের জন্যে দেখলুম কুয়াশা-ভরা নীলচে জ্যোৎস্নায় কালো টমটম দূরে চলে যাচ্ছে। ভেসে আসছে অদ্ভুত এক শব্দ টং লং... টং লং... টং লং!

ভাগ্যিস, রোডস দফতরের লোকেরা রাস্তা মেরামতের জন্য কিনারায় বালির গাদা রেখেছিল। আঘাত টের পেলুম না। সামনে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। লোকেরা লণ্ঠন লাঠিসোঁটা নিয়ে বেরিয়ে এল। তখন ঘটনাটা তাদের আগাগোড়া বলতে হল।

কিন্তু সব শুনে ওরা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। একজন বলল, ‘কী বলছেন বাবু? ছক্কা মিয়ার টমটম পেলেন কোথায়? কাল ভীমপুরের কাছেই একটা ট্রাকের ধাক্কায় ছক্কা মিয়া আর তার ঘোড়াটা মারা পড়েছে যে! ভাগ্যিস, টমটমে একটা মড়া ছিল শুধু। সঙ্গের লোকেরা বাসে চেপে গঙ্গার ধারে গিয়েছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড দেখুন, মড়াটা একেবারে আস্ত ছিল। তুলে নিয়ে গিয়ে ভালোয় ভালোয় চিতেয় তুলতে পেরেছে।’

বঙ্কুদারোগার ওপর সব রাগ সঙ্গেসঙ্গে ঘুচে গেল। বরং উনি আমাকে বাঁচিয়েই দিয়েছেন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওঁর নিজের ভাগ্যে কী ঘটল কে জানে! আহা বেচারা!

কী ঘটল, তা পরদিন শুনলুম। বঙ্কুবাবু তখন হাসপাতালে। লোকে বলছে, আসামি ধরতে গিয়ে সাইকেল থেকে পড়ে কোমরের হাড় ভেঙেছে। সাইকেলও অক্ষত নেই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তো আমি জানি। তবে যাই হোক, আমার ওপর যেটুকু ফাঁড়া গেছে, তার জন্য দায়ী স্টেশন বাজারের সেই ধড়িবাজ চাওয়ালা। কেমন হেসে বলেছিল, ‘ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারেন।’ সব জেনে-শুনেও কী অদ্ভুত রসিকতা।

অবশ্য এমনও হতে পারে, সে বলেছিল, ‘ছক্কা মিয়ার টমটমেও যেতে পারতেন।’ আমিই হয়তো ভুল শুনেছিলুম। ক্রিয়াপদের গোলমাল স্রেফ!...

জ্যোৎস্নারাতের আপদবিপদ

ছোটোমামার সঙ্গে পাশের গ্রামে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলুম। যাত্রার আসর ভাঙল, তখন অনেক রাত। ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। ছোটোমামা বললেন, 'এত রাতে আর বাস পাওয়া যাবে না। আয়, বরং হাঁটাপথে শর্টকাট করি।'

পিচের রাস্তা থেকে ছোটোমামার পিছন পিছন মাঠে নেমে বললুম, 'পথ কোথায় ছোটোমামা? তুমি যে হাঁটাপথ বলছ?'

ছোটোমামা সবে গুনগুন করে কী গান ধরেছিলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'দিলি তো মুডটা নষ্ট করে! হাঁটাপথ বুঝিসনে? যেখান দিয়ে তুই হাঁটবি, সেটাই হাঁটাপথ। চুপচাপ চলে আয়।'

নির্জন মাঠে হু-হু করে বাতাস বইছে। এদিকে-ওদিকে দু-একটা গাছ কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শনশন শব্দে ডালপালা দুলছে। ছোটোমামার গানের মুডটা ফিরে এসেছে। এবার গলা ছেড়ে গান ধরেছেন। কথাগুলো বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সুরটা চেনা ঠেকছিল। ছোটোমামা তাহলে যাত্রার আসরে শোনা বিবেকের গানই গাইছেন। একটু পরে আমরা একটা দিঘির পাড়ে পৌঁছোলুম! অনেকগুলো তাল গাছ সেখানে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাতাগুলো অদ্ভুত শব্দে নড়ছে। হঠাৎ কে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'কী হে ছোকরা, আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে?'

কেমন খ্যানখেনে গলার স্বর। ছোটোমামা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অদ্ভুত তো! ঘর ছেড়ে দিঘির পাড়ে ঘুমোতে এসেছ। কে হে তুমি?'

'আবার তুমি বলা হচ্ছে? ভারি বেয়াদপ ছোকরা দেখছি।'

ছোটোমামা একটু ভড়কে গিয়ে বললেন, 'আপনি কোথায় ঘুমোচ্ছেন?'

'তাল গাছের ডগায়।'

এতক্ষণে টের পেলুম, সামনে একটা তাল গাছের মাথা থেকে কেউ কথা বলছে। ছোটোমামা হাসতে হাসতে বললেন, 'তাল গাছের ডগা কি ঘুমোনোর জায়গা? ঘুম পেলে বাড়ি গিয়ে ঘুমোন।'

'এটাই তো আমার বাড়ি।'

‘তার মানে?’

‘মানে আবার কী? যাও, বিরক্ত কোরো না। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।’

বিকট হাই তোলার শব্দ শোনা গেল। আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ছোটোমামা গোঁ ধরে বললেন, ‘এর একটা এসপার-ওসপার না করে যাব না। তাল গাছের ডগায় কেউ ঘুমোতে আসে বলে তো শুনিনি। গাছের তলায় অবশ্যি অনেক মানুষকে ঘুমোতে দেখেছি। ও মশাই, শুনছেন?’

‘জ্বালাতন! শোনো হে ছোকরা, এখনই কেটে না পড়লে বিপদ হবে বলে দিচ্ছি।’

ছোটোমামার হাত ধরে টেনে বললুম, ‘আমার বড্ড ভয় করছে। চলো ছোটোমামা।’

ছোটোমামা রেগে গিয়ে বললেন, ‘তুই বড্ড ভীতু ছেলে দেখছি। ব্যাপারটা তোর গোলমেলে মনে হচ্ছে না? তাল গাছের ডগায় কেউ ঘুমোতে আসে? লোকটা নিশ্চয় চোর। পুলিশের ভয়ে ওখানে লুকিয়ে আছে!’

এবার ওপর থেকে হুংকার শোনা গেল। ‘কী বললে! কী বললে? আমি চোর? আমি পুলিশের দারোগা বঙ্কুবিহারী ধাড়া। আমাকে চোর বলা হচ্ছে? রোসো, দেখাচ্ছি মজা।’

তাল গাছের ডগায় পাতাগুলো প্রচণ্ড নড়তে থাকল। এবার ছোটোমামা হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন। চাপা স্বরে বললেন, ‘দরকার হলে দৌড়োতে হবে। রেডি হয়ে থাক।’

দৌড়োনোর দরকার হল না। বঙ্কুবিহারী ধাড়ার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না আর। কিছুটা চলার পর ছোটোমামা বললেন, ‘ব্যাপারটা বড্ড রহস্যজনক। বুঝলি পুঁটু? আমার ধারণা, দারোগাবাবু কোনো চোরকে ধরার জন্যে ওখানে লুকিয়ে আছেন।’

ছোটোমামার কথা শেষ হওয়ামাত্র কে চাপা স্বরে বলে উঠল, ‘কোথায় লুকিয়ে আছেন দারোগাবাবু?’

চমকে উঠে দেখি, সামনে একটু তফাতে কেউ সদ্য উঠে দাঁড়াল। জ্যোৎস্নায় চেহারাটা আবছা কালো। ছোটোমামা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘কে, কে?’

‘আজ্ঞে আমি।’

‘আমি মানে কী? তোমার নাম?’

‘নাম শুনে কী হবে? দারোগাবাবু কোথায় লুকিয়ে আছেন বলুন।’

ছোটোমামা কিছু বলার আগে আমি বলে দিলুম, ‘দিঘির পাড়ে একটা তাল গাছের ডগায়।’

অমনি ছায়া-কালো লোকটা বলে উঠল, ‘ওরে বাবা! আমি তো ওখানেই ঘুমোতে যাচ্ছিলুম। সর্বনাশ!’

বলেই সে উধাও হয়ে গেল। ছোটোমামা হেসে ফেললেন। ‘এই লোকটাই চোর। বুঝলি তো পুঁটু? একে ধরার জন্যই দারোগাবাবু ওখানে ওত পেতেছেন।’

বললুম, ‘কিন্তু উনি তো ঘুমোচ্ছেন বললেন! নিজের বাড়িও বললেন!’

‘ধুর বোকা! পুলিশের কথা ওইরকমই। আসল কথাটা বললে চলে? চোর সাবধান হয়ে যাবে না?’

‘কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোর সাবধান হয়ে গেল তো?’

ছোটোমামা গুম হয়ে বললেন, 'আমার কী দোষ? চোর যে এখানে লুকিয়ে আছে, জানতুম নাকি?'

আবার দু-জনে হাঁটতে থাকলুম। ছোটোমামার গানের মুডটা চলে গেছে মনে হচ্ছিল। চুপচাপ হাঁটছেন আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। বরাবর দেখেছি, ছোটোমামার সঙ্গে রাতবিরেতে বেরোলে বড্ড গোলমেলে কাণ্ড হয়। আমার গা ছমছম করছিল। ছোটোমামাকে এদিক-ওদিক তাকাতে এবং কখনো হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে কান করে কিছু শুনতে দেখছিলুম। জিজ্ঞেস করলে জবাব দিচ্ছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে ফের উনি থমকে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'শোন পুঁটু! কথাটা মনে আছে তো? দরকার হলে দৌড়োনোর জন্যে রেডি থাকতে হবে?'

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'আবার দৌড়োতে হবে কেন ছোটোমামা?'

'কিছু বলা যায় না! সামনে কালোমতো যে গাছটা দেখছিস, ওটা জটাবাবার থান। একবার এমনি রাত্তিরে ওখানে জটাবাবার পাল্লায় পড়েছিলুম। ওঃ। সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড।'

আরও ভয় পেয়ে বললুম, 'তাহলে ওখান দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না ছোটোমামা।'

ছোটোমামা পা বাড়িয়ে বললেন, 'আয় না দেখি কী হয়। সেবার আমি একা ছিলুম। এবার দু-জনে আছি। জটাবাবা আমাদের ঘাঁটাতে সাহস পাবে না।'

'জটাবাবা কে, ছোটোমামা?'

'একটা বুড়োমতন লোক। মাথায় প্রচুর জটা।'

'সে ওখানে কী করে?'

'বললুম না ওখানে ওর থান আছে? দিনের বেলা লোকেরা এসে ওখানে মানত করে। ঢাকঢোল বাজিয়ে জটাবাবার পুজোও দেয়। তবে দিনের বেলা জটাবাবা কাকেও দেখা দেয় না।'

'দিনের বেলা জটাবাবা কোথায় থাকে?'

ছোটোমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'চুপচাপ আয় তো। জটাবাবা শুনতে পেলে কেলেঙ্কারি।'

গাছটা প্রকাণ্ড। তলায় ঘন ছায়া। বাতাসে ডালপালা কেমন অদ্ভুত শব্দ করছিল। ছোটোমামা আবার একটুখানি দাঁড়িয়ে গাছটাকে দেখে নিলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'রেডি, স্টেডি, গো!'

ছোটোমামার পিছন পিছন গাছটার তলায় যেই গেছি, আমার মাথায় কী একটা ঠেকল। চমকে উঠে হাত তুলে দেখি, একটা পা। বারণ ভুলে চেঁচিয়ে উঠলুম। 'ছোটোমামা! ছোটোমামা!'

'ধ্যাত্তেরি! চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? বললুম চুপচাপ চলে আয়।'

'একটা পা! বড্ড ঠান্ডা, ছোটোমামা।'

'চলে আয় না হতভাগা!'

'আমাকে যেতে দিচ্ছে না যে!' কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললুম। বরফের মতো ঠান্ডা একটা পা আমার গলা আঁকড়ে ধরে আছে। দু-হাতে ছাড়ানোর চেষ্টা করছিলুম। দম আটকে

যাচ্ছিল।

ছোটোমামা কাছে এসে বললেন, 'কই, কোথায় পা?'

'আমার গলায়।'

ছোটোমামা সেই ঠান্ডা ঝুলন্ত পা ধরে টানাটানি শুরু করলেন। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। খুব জোরে পায়ে চিমটি কেটে দিলুম। অমনি পা-টা গলা থেকে সরে গেল আর কে ওপর থেকে আর্তনাদ করে উঠল, 'উহুহুহু! গেছি, গেছি! কী বিচ্ছু ছেলে রে বাবা!'

আমিও সাহস পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, 'ছোটোমামা! টানো! দু-জনে টেনে নামাই জটাবাবাকে।'

ছোটোমামাও ততক্ষণে সাহসী হয়ে উঠেছেন। দু-জনে ঠান্ডা পা ধরে টানতে থাকলুম। জটাবাবা ঠ্যাং ঝুলিয়ে ডালে বসে থাকার বিপদ টের পেল এতক্ষণে। কাকুতিমিনতি করে বলতে থাকল, 'ঘাট হয়েছে বাবারা! ছেড়ে দে। উহুহুহু, বড্ড ব্যথা করছে রে!'

ছোটোমামা পা ছেড়ে দিলেন। আমিও ছেড়ে দিলুম। তারপর ছোটোমামা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বললেন, 'কী জটাবাবা? সেবার তো আমাকে একা পেয়ে খুব ভয় দেখিয়েছিলে। এবার আর ভয় পাচ্ছি না। কই, নেমে এসো। দেখি তোমার কত বুজরুকি।'

গাছের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে। ওপরের ডালে জটাবাবাকে আবছা দেখা যাচ্ছিল। পায়ে হাত বুলিয়ে 'আহা-উহু' করছে। মাথার প্রকাণ্ড জটা, পুঁটুলির মতো দেখাচ্ছে। ছোটোমামার চ্যালেঞ্জ শুনে কোনো জবাব দিল না! চিমটিটা খুব জোর হয়ে গেছে-তাহলে।

বললুম, 'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। চলুন ছোটোমামা!'

ছোটোমামা বীরদর্পে হাঁটতে থাকলেন। বললেন, 'তোর বুদ্ধি আছে পুঁটু। খুব জব্দ হয়ে গেছে জটাবাবা!'

'জটাবাবার পা অত ঠান্ডা কেন ছোটোমামা?'

'ঠান্ডা হবে না? জটাবাবাকে তুই জ্যান্ত মানুষ ভেবেছিস নাকি?'

চমকে উঠে বললুম, ‘জ্যান্ত মানুষ নয়? তাহলে কী?’

ছোটোমামা চাপাস্বরে বললেন, ‘বাড়ি ফিরে বলবখন। রাতবিরেতে নিরিবিলি জায়গায় ওসব কথা বলতে নেই।’

এবার ছোটোমামার মনে সাহস জেগেছে। তাই যাত্রাদলের বিবেকের সেই গানটা গাইতে শুরু করলেন। কিছুটা চলার পর হঠাৎ গান থামিয়ে বললেন, ‘ভুল হয়ে গেছে। বুঝলি পুঁটু?’

‘কী ভুল ছোটোমামা?’

ডান দিকে আঙুল তুলে ছোটোমামা বললেন, ‘ভুল করে কঙ্কালীতলার ঝিলের ধারে এসে পড়েছি। এখানে কোথায় একটা শ্মশান আছে যেন। বড্ড বিপদে পড়া গেল দেখছি।’

একটু ভেবে নিয়ে ঝিলের ধারে ধারে হাঁটতে শুরু করলেন। ঝিলের জল জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে কিছুটা চলার পর কারা কথা বলছে শোনা গেল। ছোটোমামা বললেন, ‘মনে হচ্ছে, জেলেরা ঝিলে মাছ ধরতে এসেছে। আয় তো! ওদের কাছে রাস্তাটা জেনে নিই।’

ঝোপঝাড়ের পর একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা ঝুপসিকালো গাছ। তার তলায় কারা বসে চাপাস্বরে কথাবার্তা বলছে। কিন্তু যেই আমরা সেখানে গেছি, লোকগুলো ‘ওরে বাবা! এরা আবার কারা’ বলে চ্যাঁচামেচি করে দৌড়ে উধাও হয়ে গেল।

ছোটোমামা বললেন, ‘যা বাব্বা। আমাদের দেখে ওরা ভয় পেল কেন? আমরা মানুষ না ভূত?’

গাছটার তলায় গিয়ে দেখি, কে খাটিয়ায় শুয়ে আছে। ছোটোমামা চাপাস্বরে বললেন, ‘সর্বনাশ! এখানেই তো তাহলে কঙ্কালীতলার শ্মশান। ওরা একটা মড়া পোড়াতে এসেছিল।’

মড়াটা দেখে গা ছমছম করছিল। গলা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। মুখটা একপাশে কাত হয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছোটোমামা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে পা বাড়িয়েছেন, সেই সময় খাটিয়া থেকে মড়াটা বলে উঠল, ‘চিতা সাজানো হয়েছে?’

ছোটোমামা বললেন, ‘ওরে বাবা! এ যে দেখছি জ্যান্ত মড়া। পালিয়ে আয় পুঁটু!’

মড়াটা তড়াক করে উঠে বসে বলল, ‘পালিয়ে যাবেন না, পালিয়ে যাবেন না! একা থাকতে আমার বড্ড ভয় করবে!’

‘পুঁটু! রেডি স্টেডি গো!’ বলে ছোটোমামা দৌড়োতে শুরু করলেন।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছোটোমামার পিছনে ছুটতে শুরু করলুম। কিন্তু বড্ড বিচ্ছিরি ঝোপঝাড়। কোথাও চষা খেতের মাটি গাদা হয়ে আছে। তার ওপর দৌড়োনো কঠিন। বার তিনেক আছাড় খেলুম। ছোটোমামা একবার থেমে পিছনে তাকিয়ে বললেন, ‘সর্বনাশ! মড়াটা ছুটে আসছে যে!’

মড়াটার আর্তনাদ শুনতে পেলুম, ‘দাদা! আমাকে ফেলে যাবেন না!’

আবার আমাদের দৌড়োনো শুরু হল। এবার এসে পৌঁছোলুম গাছপালা ঘেরা একটা বাড়ির কাছে। ছোটোমামা বললেন, ‘আবার ভুল হয়ে গেছে রে পুঁটু! অন্য একটা গ্রামে চলে এসেছি মনে হচ্ছে! আয় তো এদের ডাকি!’

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর দরজা খুলে কে একজন বলল, ‘কাকে চাই?’

ছোটোমামা বললেন, ‘দেখুন, আমরা বড্ড বিপদে পড়েছি। তাই...’

‘বিপদটা কী আগে শুনি?’

‘কঙ্কালীতলার শ্মশানের ওখানে একটা মড়া ছিল। হঠাৎ সে...’

লোকটা ঝটপট বলল, ‘থাকারই কথা। আমাদের ছোটোকর্তার মড়া। তা এখনও চিতেয় ওঠেননি বুঝি?’

ছোটোমামা চাপাস্বরে বললেন, ‘আমাদের ফলো করে আসছিলেন ভদ্রলোক। বলছিলেন, শ্মশানে ওঁর একা থাকতে বড্ড ভয় করবে।’

‘মলোচ্ছাই! আমাদের লোকগুলো কোথায় গেল? তারা ছিল না?’

‘ছিল তো! আমাদের হঠাৎ ওখানে দেখে ওরা কেন যে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল!’

লোকটা খি খি করে হেসে বলল, ‘তা ভয় পাবারই কথা। রাতবিরেতে কাউকে চেনা কঠিন। এই তো আপনাদের দেখেও আমি দিব্যি ভয় পাচ্ছি।’

ছোটোমামা জোরে হাত নেড়ে বললেন, ‘আমরা মানুষ! আমরা মানুষ! আমাদের ভয় পাবেন কেন?’

‘কিছু বলা যায় না মশাই! দিনকাল যা পড়েছে। কে জানে কে কোন রূপ ধরে ঘোরে।’

ছোটোমামা তার দিকে এক-পা এগিয়ে বললেন, ‘আপনি আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন। আমরা মানুষ। এই ছেলেটা আমার ভাগনে। আমি ওর মামা। আমরা যাত্রা দেখে বাড়ি ফিরছিলুম। রাস্তা ভুল করে এই অবস্থা। এই নিন, আমার হাতটা ঠান্ডা না গরম দেখুন। আমরা ভূত হলে হাতটা বরফের মতো ঠান্ডা হবে।’

ছোটোমামা হাত বাড়িয়ে আর এক-পা এগোতেই লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, ‘হাত সরান! হাত সরান! ওরে বাবা! হাত বাড়িয়ে ঘাড়টি ধরে মটকাবার মতলব? বড়োকর্তা! বড়োকর্তা! একবার আসুন তো!’

হেঁড়ে গলায় বাড়ির ভিতর থেকে কেউ বলল, ‘কী হল রে ভূতু?’

লোকটা বলল, ‘কারা এসে গণ্ডগোল বাধাচ্ছে।’

‘দরজা বন্ধ করে দে।’

আমাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ছোটোমামা বললেন, ‘কোনো মানে হয়?’

বললুম, ‘চলুন ছোটোমামা! অন্য কোনো বাড়ির লোক ডেকে জিজ্ঞেস করে নিই।’

দু-জনে হাঁটতে থাকলুম। আশেপাশে আর কোনো বাড়ি নেই। ঝোপজঙ্গল আর উঁচু-নীচু সব গাছ বাতাসে দুলছে। একটু পরে আর একটা বাড়ি দেখতে পেলুম। ছোটোমামার ডাকাডাকিতে বাড়ির ভেতর থেকে কে ঘুম-জড়ানো গলায় সাড়া দিল, ‘কী হয়েছে?’

ছোটোমামা বললেন, ‘দয়া করে একটু বাইরে আসবেন?’

‘না বাইরে যাবার সময় নেই। আমি ঘুমোচ্ছি।’

ছোটোমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘কোথায় ঘুমোচ্ছেন? এই তো দিব্যি কথা বলছেন।’

‘ঘুমোতে ঘুমোতে কথা বলা আমার অভ্যেস।’

‘কী অদ্ভুত! আচ্ছা, ঠিক আছে। ঘুমোতে ঘুমোতে বলুন, আমরা কনকপুর যাব কোন রাস্তায়?’

‘কনকপুর? সে আবার কোথায়?’

‘কনকপুর চেনেন না? বাসরাস্তার ধারে অত বড়ো গ্রাম।’

‘বাসরাস্তার ধারে তো কত বড়ো বড়ো গ্রাম আছে।’

ছোটোমামা হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, ‘ভারি বিপদে পড়া গেল দেখছি। আচ্ছা এ-গ্রামের নাম কী?’

জবাব এল তেমনি ঘুমজড়ানো গলায়, ‘নাম একটা ছিল যেন। মনে পড়ছে না।’

ছোটোমামা খাপ্পা হয়ে বললেন, ‘আপনি দেখছি ভারি অদ্ভুত লোক। নাম ছিল মানে কী?’

এবার জোরালো নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল। ছোটোমামা এবার খুব রেগে গেছেন। দরজায় দমাদ্দম লাথি মারতে শুরু করলেন। কপাট ভেঙে পড়ল মড়মড় করে। আমার ভয় করছিল, ছোটোমামার কাণ্ড দেখে। পাশের বাড়ির লোকেরা জেগে গিয়ে হইচই বাধায় যদি? রাতদুপুরে কারও বাড়ির দরজা ভেঙে ঢোকা কি ঠিক হচ্ছে?

কিন্তু ছোটোমামা একেবারে মরিয়া। ভেতরে পা বাড়িয়ে বললেন, ‘আয় পুঁটু! লোকটাকে ঘুম থেকে জাগানো দরকার। ঘুমের ঘোরে মাথামুণ্ডু কীসব বলছে।’

ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে দেখলুম, একটা লোক উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার নাক ডাকছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারে মানুষ? উঠোনে সাদা হয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে। লোকটার নাক থেকে ঘড়র ঘড়র শব্দ হচ্ছে। ছোটোমামা তার গায়ে ধাক্কা দিয়েই পিছিয়ে এলেন। বললুম, ‘কী হল ছোটোমামা?’

ছোটোমামা চাপাস্বরে বললেন, ‘ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না পুঁটু! লোকটার গা বরফের মতো ঠান্ডা।’

আঁতকে উঠে বললুম, ‘চলে আসুন ছোটোমামা!’

ছোটোমামা ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, ‘পায়ে ব্যথা হয়ে গেছে রে। বরং এক কাজ করি আয়। ওই বারান্দায় দু-জনে শুয়ে পড়ি। ভোর বেলা নিশ্চয় মানুষজনের দেখা পাব। তখন জিজ্ঞেস করে নেব।’

উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে একজন ঘুমন্ত লোক, যার গা নাকি বরফের মতো ঠান্ডা এবং এই বাড়িটাও তার। এখানে ঘুমোনো কি ঠিক হবে? কিন্তু ছোটোমামা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন বারান্দায়। তারপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমারও খুব ঘুম পাচ্ছিল। শুয়ে পড়লুম শান-বাঁধানো বারান্দায়। দু-জনেই ক্লান্ত।

তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি।

ঘুম ভাঙল ছোটোমামার ডাকাডাকিতে। চোখ খুলে উঠে বসলুম। তারপর খুব অবাক হয়ে গেলুম। এ কোথায় শুয়েছিলুম আমরা? ভোরের আলোয় সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। একটা বট গাছের তলায় শুকনো ন্যাড়া মাটিতে মামা-ভাগনে খুব ঘুমিয়েছি। কোথাও ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই। শুধু জঙ্গল।

ছোটোমামা বললেন, 'হাঁ করে কী দেখছিস? রাতবিরেতে বেরোলে একটু গণ্ডগোল হয়েই থাকে। চল, বাড়ি ফিরি।'

হাঁটতে হাঁটতে বললুম, 'রাস্তা চিনতে পারবেন তো ছোটোমামা?'

ছোটোমামা করুণ হেসে বললেন, 'দিনের বেলা আর ভুল হবে না। আমরা কোথায় চলে এসেছিলুম জানিস? কঙ্কালীতলার জঙ্গলে। প্রবলেম হল, রাতবিরেতে কিছু চেনা যায় না। চেনা জায়গাও অচেনা হয়ে যায়।'

হরিপদর বিপদ

হরিপদ খুব বিপদে পড়েছে। সবসময় মুখ ভার। খেতে-শুতে-চলাফেরা করতে সুখ নেই। ঘুমিয়ে স্বস্তি নেই। তার নাকি লেজ গজাচ্ছে।

হ্যাঁ, লেজ। পিঠের দিকে শিরদাঁড়ার নীচে যে তেকোনা হাড়টা আছে, সেখানেই ব্যাপারটা ঘটছে।

সবচেয়ে মুশকিলটা হল, কথাটা কাকেও বলা যাচ্ছে না। এইতে হরিপদ আরও মনমরা হয়ে পড়েছে। বিপদ-আপদ ঘটলে অন্যকে জানালেও খানিকটা সুখ পাওয়া যায়, সে সাহায্য করুক বা না করুক। কিন্তু এমন গুরুতর কথা বলতেই যে লজ্জা করে। তা ছাড়া বললেও কি কেউ তার লেজ গজানোটা ঠেকাতে পারবে?

প্রথমে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল এভাবে।

এক সকালে হঠাৎ হরিপদ টের পেয়েছিল, শিরদাঁড়ার নীচের তেকোনা হাড়টায় কেমন একটা অস্বস্তি, আর চুলকোনি।

সেই যে শুরু হল, চুলকোনি চলতেই থাকল। হরিপদ সারাক্ষণ সেখানে হাত দেয়। শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে পাড়ার ডাক্তারবাবুর কাছে গেল।

ডাক্তারবাবু একটা ওষুধ লাগাতে দিলেন বটে, কিন্তু কাজ হল না। তখন হরিপদ গেল তারককবরেজের কাছে। হরিপদ বরাবর ডাক্তারের চেয়ে কবরেজদেরই বিশ্বাস করে।

কবরেজমশাই আতশকাচ দিয়ে জায়গাটা দেখে গম্ভীর মুখে বললেন, 'হুঁ!'

হরিপদ বলল, 'কী হয়েছে কবরেজমশাই?'

কবরেজমশাই বললেন, 'আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ওই হাড়টাকে বলে পিকচঞ্চু অস্থি। কেন বলে জান? ওটা পিক অর্থাৎ কোকিলের চঞ্চুর মতো। চঞ্চু মানে কী জান?'

হরিপদ মাথা নাড়ল।

'চঞ্চু মানে ঠোঁট। কোকিলের ঠোঁট দেখেছ? দেখনি? তুমি মহামূর্খ।'

হরিপদ মনে মনে রাগ করলেও চুপ করে থাকল। সে তত মূর্খ নয়। গরিব লোকের ছেলে বলে পয়সার অভাবে বেশিদূর পড়াশোনা হয়নি। তবে যেটুকু হয়েছে, তাই-বা মন্দ কী? সে এখন ফার্গুসন কোম্পানির আপিসে ছোটোসায়েবের খাস বেয়ারা। ছোটোসায়েব তাকে খুব স্নেহ করেন। কত বকশিশ দেন।

তারককবরেজ বলেছিলেন, 'দেখো বাপু, তোমার পিকচঞ্চু অস্থিতে যা দেখছি, লক্ষণ বড়ো ভালো নয়। তুমি কি কখনো হনুমান মেরেছিলে?'

হরিপদ অবাক হয়ে বলেছিল, 'হনুমান? না তো!'

'তাহলে নিশ্চয় পাটকেল ছুড়েছিলে।'

হরিপদ ছেলেবেলায় গ্রামে থাকত। তাদের গ্রামে হনুমান ছিল অনেক। সে আর সব ছেলেদের সঙ্গে জুটে হনুমান তাড়াত, ঢিল ছুড়ত বটে।

হরিপদ মাথা চুলকে বলেছিল, 'হনুমানের কথা কেন কবরেজমশাই?'

তারককবরেজ গলার স্বর চাপা করে বলেছিলেন, 'বলছি কি সাধে? তোমার মতো ঠিক একই রোগ হয়েছিল নরহরিউকিলের। সেও হনুমানকে ঢিল ছুড়ে এই বিপদ বাধিয়েছিল। শেষে আদালতে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছিল বেচারিকে।'

হরিপদ ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন, 'কেন, কেন?'

তারকবাবু বলেছিলেন, 'তুমি মূর্খ। লেজ নিয়ে কেউ আদালতে যেতে পারে?'

'লেজ?' হরিপদ ভ্যাবাচ্যাকা একেবারে।

'হ্যাঁ, লেজ! হনুমানের লেজ!' তারককবরেজ বলেছিলেন। 'সাড়ে তিন ফুট লেজ কম কথা নয়। তাকে গুটিয়ে যত ছোটোই করো, পেছনটা ফুলে থাকবে।'

তা তো থাকবেই। কিন্তু নরহরিউকিলের লেজ গজিয়েছিল বলে হরিপদরও গজাবে নাকি? হরিপদ কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, 'আমারও কি লেজ গজাবে নাকি কবরেজমশাই?'

'হুঁ, গজাবে।'

'ওরে বাবা! লেজ নিয়ে ছোটোসায়েবের কাছে যাব কেমন করে?' হরিপদ প্রায় কেঁদে ফেলছিল। 'আর রাস্তায় নামলেই ছেলেপুলেরা পেছনে লাগবে।'

তারককবরেজ ফ্যাঁচ করে হেসে বলেছিলেন, 'তা তো লাগবেই। নরহরিউকিল কি সাধে আদালতে যাওয়া ছেড়েছিল? যাক গে, যা বলছি শোনো। এই লেজ গজানো রোগের একটাই ওষুধ আছে। কিন্তু সে-ওষুধ জোগাড় করা বড়ো ঝকমারি। তেত্রিশ টাকা তেত্রিশ পয়সা খরচ হবে।'

হরিপদ তাতে পিছপা নয়। তিনশো তেত্রিশ বললেও রাজি হত। ওরে বাবা! মানুষের লেজ গজানোর মতো বিপদ আর কী থাকতে পারে?

তেত্রিশ টাকা তেত্রিশ পয়সা দিয়ে এসেছিল হরিপদ। তারপর কথামতো দিন তিনেক পরে গেল কবরেজের কাছে।

তারককবরেজ বললেন, 'বাপস! তোমার লেজ গজানো ঠেকাবার ওষুধ আনতে আমার যা কষ্ট গেল, বলার নয়। হুতুমপুরের নাম শুনেছ? সেখানে বনজঙ্গল ঢুঁড়ে নিয়ে এলুম,

তারপর বটিকা তৈরি করলুম। মলম বানালুম। রোজ রাত্তিরে শোবার সময় একটা করে বড়ি খাবে। আর এই মলমটা মাখাবে পিকচঞ্চু হাড়ে। এক মাস পরে ফের ওষুধ দেব।...'

তারপর দিন সাতেক ওষুধ খেয়েছে এবং মলম লাগিয়েছে হরিপদ। তবু সেইরকম চুলকাচ্ছে। তার ওপর কী একটা ঠেলে বেরোচ্ছেও যেন। তাহলে কি ওষুধে কাজ হচ্ছে না?

আপিসে তাকে দেখে ছোটোসায়েব বলেন, 'কী হরিপদ? অসুখবিসুখ করেছে নাকি?'

হরিপদ আসল কথাটা তো বলতে পারে না। শুধু বলে, 'একটু জ্বর মতো হয়েছে স্যার!'

'তাহলে আপিসে এসেছ কেন? ছুটি নাও।'

শেষ পর্যন্ত ছুটিই নিতে হল হরিপদকে। ততদিনে তার সেই মারাত্মক জিনিসটা ইঞ্চিটাক উঁচু হয়ে ঠেলে বেরিয়েছে। কবরেজের কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাদের গ্রামে একজন কবরেজ আছেন বটে! গ্রামের কবরেজ বলে তারকবাবুর মতো নামডাক নেই। কিন্তু হাজার হলেও হরিপদর গ্রামের মানুষ। যত্ন করে দেখবেন বই কী। হরিপদ সেদিনই গ্রামে চলে গেল।...

হরিপদর এক পিসি ছাড়া গ্রামের বাড়িতে আর কেউ নেই। পিসিকে সে মাসে মাসে টাকা পাঠায়। পিসি তো হরিপদকে দেখে ভারি খুশি। কিন্তু ওর হাবভাব দেখে ভড়কে গেল। বলল, 'ও হরে, তোর কী হয়েছে? তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

হরিপদ হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'ট্রেনে-বাসে এসেছি তো, তাই বড্ড ক্লান্ত। আচ্ছা পিসিমা, গাঁয়ে আজকাল আর হনুমান আসে?'

পিসি বলল, 'হনুমান? কোথায় হনুমান? আর কি সে রামরাজত্ব আছে রে? সব হনুমান কোথায় পালিয়েছে! আর শুধু হনুমান কেন, আজকাল শেয়াল-টেয়ালও আর নেই। এমনকী আগের মতো পাখিও দেখতে পাইনে!'

'কেন, কেন?'

'পাপে। মানুষের পাপে। বুঝলি হরে? মানুষের এত পাপ যে পাখপাখালি জন্তুজানোয়ার সবাই মানুষকে ঘেন্না করে পালিয়ে গেছে!'

হরিপদ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তা যাই বলো পিসিমা, হনুমান পালিয়েছে বলেই না তোমার মাচানে অত লাউ শশা কুমড়ো ফলে রয়েছে। হনুমান থাকলে সব খেয়ে ফেলত না কি?'

অমনি পিসি মুড়ো ঝাঁটা তুলে বলল, 'হুঁ, খেয়ে ফেললেই হল। ঝাঁটা ছুড়ে মারব না মুখে?'

হরিপদ বলল, 'আচ্ছা, ধরো কথার কথা বলছি, যদি আমি-মানে এই হরে হঠাৎ হনুমান হয়ে যাই...।'

এটুকু শুনেই পিসি খিলখিল করে হেসে বলল, 'ওরে, থাম থাম। তুই হনুমান হবি কী রে হরে? বালাই ষাট! তুই কেন মুখপোড়া হনুমান হবি, শুনি?'

হরিপদ বলল, 'ধরো, যদি হই?'

পিসি একটু ভেবে বলল, 'তুই হনুমান হলে একটার বেশি শশা খাসনে কিন্তু! তার বেশি খেলে আমার রাগ হবে।'

'তাই হবে। তা পিসি, আমি যদি মুখ ভেংচাই তোমাকে?'

পিসি ফের খিলখিল করে হাসল, তারপর বলল, 'আমিও ভেংচাব। শুধু কি ভেংচাব? সেই ছড়াটাও গাইব,

এই হনুমান কলা খাবি?

জয়-জগন্নাথ দেখতে যাবি?'

হরিপদ বলল, 'আমি যদি রাতারাতি হনুমান হয়ে যাই, তাহলে কিন্তু ভড়কে যেয়ো না পিসি। গাঁয়ে তো আর হনুমান নেই। কাজেই যদি কোনো হনুমান হঠাৎ দেখতে পাও, জেনো সে তোমার ভাইপো এই হরে। বুঝলে তো?'

পিসি এতক্ষণে একটু অবাক হয়ে বলল, 'তা ও হরে, এসব কথা কেন বলছিস বাবা? বালাই ষাট! তুই হনুমান হতে যাবি কোন দুঃখে?'

হরিপদ আমতা হেসে বলল, 'কিছু বলা যায় না পিসিমা।'

'থাম হতচ্ছাড়া ছেলে! আয় খাবি আয়!'

হরিপদ চুপচাপ বাড়ির উঠোনে বিশাল নিম গাছটার দিকে তাকিয়ে রইল। যদি লেজটা গজিয়ে যায়, সে তো হনুমান হয়ে যাবে। তখন ওই গাছে গিয়ে উঠবে। কিন্তু গাছটায় নাকি ভূত আছে। ছেলেবেলায় সে সেই ভূতটার ভয়ে সন্ধ্যে বেলায় গাছটার দিকে তাকাতেই পারত না। কপালের ফেরে যদি হনুমান হয়ে ওঠে, ভূতটার সঙ্গে ভাব করে নিতেই হবে।

পিসি রান্নাঘরে রান্না করছে। ঠিক দুপুর বেলা। হরিপদ পাশের পুকুরে গেছে স্নান করতে। পুকুরঘাটে ভিড় জমে আছে। হঠাৎ ভিড় থেকে একটা ছোট্ট ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে! ওই দেখ, একটা হনুমান!'

আর সব ছেলে-মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল, 'এই হনুমান কলা খাবি? জয়-জগন্নাথ দেখতে যাবি?'

হইচই পড়ে গেল। গাঁয়ে কতকাল কেউ হনুমান দেখেনি। হঠাৎ পুকুরপাড়ে একটা হনুমান দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'হনুমান এসেছে! হনুমান এসেছে!'

হরিপদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর টের পেল, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, পিঠ টনটন করছে। সে সামনে দু-হাত নামিয়ে ঝুঁকল। তারপর দেখল, সর্বনাশ! তার মানুষের শরীরটা তো আর নেই! সারা গা ধূসর লোমে ঢাকা। আর পিঠের দিকে সেই 'পিকচঞ্চু'তে বিঘত খানেক লেজ গজিয়ে গেছে।

মরিয়া হয়ে হরিপদ চেঁচিয়ে উঠল, 'উপ।'

আরও সর্বনাশ! মানুষের ভাষাটাই যে আর বেরোচ্ছে না। হরিপদ যত কথা বলার চেষ্টা করছে, উপ আঁপ খ্যাঁকোর খ্যাঁক ছাড়া আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

এবার ছেলের পাল ঢিল ছুড়তে শুরু করল। হরিপদ রাগে-দুঃখে মুখ ভেংচাতে ভেংচাতে অশ্বত্থ গাছটায় গিয়ে উঠল।

তাতেও কি রেহাই আছে? কে চেঁচিয়ে বলল, 'ওরে! ভুঁইয়ের কুমড়োগুলো সব শেষ করে ফেলবে যে! বন্দুকটা নিয়ে আয় তো!'

হরিপদ বিপদ টের পেল। আগের যুগ আর নেই। আজকাল মানুষ এত ধর্ম মানে না। হনুমান ফসল নষ্ট করে। কাজেই দরকার হলে বন্দুক ছুড়ে বসবে হয়তো!

ভয় পেয়ে হরিপদ তাদের বাড়ির দিকে দৌড়োল।

কিন্তু যেই পাঁচিলে উঠে হনুমানের ভাষায় বলেছে, 'ও পিসিমা!' অমনি পিসি ভেংচি কেটে এবং মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে সে ছড়া গাইতে শুরু করেছে।

রাগে-দুঃখে হরিপদ ভাবল, নিকুচি করেছে গাঁয়ের লোকের! তার চেয়ে বরং কোনো রকমে যদি কলকাতা চলে যায় ফের, তাহলে অন্তত আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়ে ঢুকতে পারলে আর ভয় নেই। অন্তত পেটের খাওয়াটা জুটবে।

হরিপদ তো মানুষ হয়ে নেই যে বাসে চাপবার চেষ্ট করবে। সাত মাইল নাক বরাবর মাঠ বন-বাদাড় পেরিয়ে সে রেলস্টেশনে পৌঁছোল। প্লাটফর্মে একটা ঝাঁকড়া গাছে পাতার আড়ালে বসে ট্রেনের অপেক্ষা করতে থাকল।

ট্রেনটা এলে সে উপ করে ছাদে চড়ে বসল। তারপর আর কী? আর হাওড়া স্টেশনে পৌঁছোনো ঠেকায় কে?

কিন্তু বিপদ হল ট্রেন থেকে নামার পর।

হাজার হাজার লোক সবসময় স্টেশনে থইথই করছে। তাদের মধ্যে একটা হনুমান গিয়ে ঢুকলে কী হুলস্থুল না হবে! তাড়া খেয়ে হরিপদ সোজা উঠে পড়ল হাওড়া ব্রিজের মাথায়।

কলকাতা শহরে এ-একটা ঘটনার মতো ঘটনা। এতকাল হাওড়া ব্রিজের মাথায় পাগলরা চড়ে ভেংচি কাটে। আজ কিনা একটা হনুমান চড়ে ভেংচি কাটছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক দাঁত বের করে ভেংচি কাটছে আর কাটছে।

খবর পেয়ে খবরের কাগজের লোকেরা এল। ক্যামেরা এল, টিভি-র লোকেরাও এল। হরিপদর ছবি উঠতে থাকল ক্যামেরায়।

কাল প্রথম পাতায় ছাপা হবে কাগজে। টিভিতে দেখানো হবে। এখন খালি হরিপদর সান্ত্বনা, মানুষ হয়ে তো এমন নাম ছড়াত না, ছবিও ছাপা হত না। ভাগ্যিস, লেজ গজিয়ে হনুমান হতে পেরেছে!

কিন্তু তারপর বিপদ এল।

দমকল আর চিড়িয়াখানার লোকেরা এসে গেছে খবর পেয়ে। হরিপদ একেবারে ডগায় গিয়ে কুঁকড়ে বসে আছে।

দমকলের লোকদের কত ফিকির আছে। খপ করে তাকে একটা খাঁচাকলে ঢুকিয়ে ফেলল এবং লম্বা মইয়ের সাহায্যে নামিয়ে আনল। তারপর গাড়ি চালিয়ে সোজা চিড়িয়াখানায় তুলল।

যাক, বাঁচা গেল। নিরাপদে থাকা যাবে। খাওয়া-দাওয়াও মিলবে। লোকেরা খাঁচার কাছে এলে মনের সুখে ভেংচি কাটা যাবে। হরিপদ খুশি।

কিন্তু সুখ তার বরাতে নেই। যেই না তাকে হনুমানের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, অমনি হনুমানগুলো যেন চমকে উঠেছে।

হরিপদ কোনায় বসে পিটপিট করে চমকে রইল। ওদের চোখে কেমন একটা সন্দেহ ফুটে বেরোচ্ছে যেন। সবচেয়ে ধেড়েটা অর্থাৎ পালের গোদা গম্ভীর মুখে হঠাৎ খ্যাঁক করে একটা ধমক দিল।

হরিপদর এখন হনুমানের ভাষা বুঝতে অসুবিধে নেই!

গোদাটা তাকে বলছে, 'এই! তুই কোন ব্যাটারে?'

হরিপদ হনুমানের ভাষায় বলল, 'চিনতে পারছ না দাদা? আমি তোমাদেরই একজন।'

'চালাকি হচ্ছে?' পালের গোদা তেড়ে এল। 'তোর গায়ে যে মানুষ মানুষ গন্ধ! তুই নিশ্চয়ই মানুষের ঘরে বড়ো হয়েছিস! ওরে জাতনাশা! তোকে গোবর খেতে-'

অন্য একটা হনুমান বলল, 'ওর লেজটাও কেমন বিচ্ছিরি! ছ্যা ছ্যা! এ কী লেজ?'

পালের গোদা হুকুম দিল, 'আয় তো সবাই মিলে টেনে ছিঁড়ি। ওর একটা ভালো লেজ দরকার।'

হুকুম পেয়েই সব হনুমান হরিপদর লেজটা ধরে জয় রাম বলে যেমনি হাঁক মেরে দিয়েছে হ্যাঁচকা টান, অমনি লেজটাও গেছে খুলে। আর হরিপদও সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হয়ে উঠেছে।

একদঙ্গল হনুমানের ভেতর একটা মানুষ ঢুকে পড়লে অবস্থা ভারি শোচনীয় হয়। হরিপদকে সবাই মিলে খামচাতে শুরু করল। দু-চারটে খুদে বাচ্চা হনুমান সুড়সুড়িও দিতে থাকল। হনুমানের ভাষায় চ্যাঁচাতে লাগল তারা, 'রাম! রাম! এটা যে মানুষ!'

হরিপদ লাফালাফি জুড়ে দিল এবং চ্যাঁচাতে থাকল, 'ওরে বাবা! ওরে বাবা! বাঁচাও! বাঁচাও!...'

হরিপদ তাকাল। পিসি দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে। বলল, 'ও হরে, স্বপ্ন দেখছিলি? ওঠ, ওঠ। কত বেলা হয়েছে।'

হরিপদ এক লাফে উঠে বসল। স্বপ্ন দেখছিল? তাই বটে। কিন্তু পিঠের দিকে শিরদাঁড়ার নীচে ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়। ওই স্বপ্নটাই-বা সত্যি হতে বাকি থাকে কেন?

ওই তো তার ভবিষ্যৎ। সব স্পষ্ট দেখতে পেল। হরিপদ কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, 'ও পিসি, হারুকবরেজকে একবার খবর দাও না গো! আমার... আমার নাকি লে-লে-লে...'

হরিপদ মাঝে মাঝে তোতলামি করে। পিসি বলল, 'কেন রে? হারুদাকে কেন?' উঠোন থেকে সেই সময় কে ডাকল, 'ও হরে! কলকাতা থেকে এসেছিস শুনলুম, দেখা করতে যাসনি যে বড়ো?'

মেঘ না চাইতেই জল। হারুকবরেজ এসে গেছেন। ঘরে ঢুকতেই হরিপদ লুটিয়ে প্রণাম করল। তারপর বলল, 'ও পিসি, তুমি হারুজ্যাঠার জন্যে চা আনো। ততক্ষণে আমি অসুখটা দেখিয়ে নিই।'

পিসি বেরোলে হরিপদ দরজা বন্ধ করে চাপা গলায় বলল, 'জ্যাঠামশাই, দেখুন তো এটা কী গজাচ্ছে শিরদাঁড়ার নীচে।'

হারুকবরেজ দেখেই ফিক করে হেসে বললেন, 'ব্যাঘ্রস্ফোট!'

ওরে বাবা! হরিপদ আঁতকে উঠল। তারককবরেজ বলেছে যা, তাতে হনুমান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। হারুকবরেজ যা বলছেন, তাতে যে বাঘ হাওয়ার সম্ভাবনা আছে! হরিপদ ভয় পেয়ে বলল, 'বাঘের লেজ? ওরে বাবা! তাহলে তো সোঁদরবনেই গিয়ে ঢুকতে হবে?'

হারুকবরেজ বললেন, 'তোমার মাথা! ব্যাঘ্রস্ফোট মানে পাড়াগাঁয়ে যাকে বলে বাঘা ফোড়া। বুঝলে? তোমার ওটা ফোড়া হয়েছে। ভোগাবে। ঠিক আছে। ওষুধ দিচ্ছি। কালই ফেটে যাবে! ভেবো না। আসলে এ-বছর যা গরম পড়েছিল। ঘরে ঘরে সব্বাইর শুধু ফোড়া হচ্ছে।'

হরিপদ এবার বাঘের মতো লাফ দিয়ে ফের কবরেজের পায়ের ধুলো নিল।

ঘটোৎকচের জাগরণ

সেহরাগড় ফরেস্ট বাংলোয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নাম ড. আর.পি. গুপ্টা। তিনি এক বিস্ময়কর মানুষ।

প্রথমে চোখে পড়েছিল ওঁর অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য। অত লম্বা মানুষ গিনেস রেকর্ড বইতে এখনও উল্লিখিত হননি বলে আমার বৃদ্ধ বন্ধু আক্ষেপ করেছিলেন। তাই শুনে ড. গুপ্টা হাসতে হাসতে বললেন, 'কী দরকার? আসলে কী জানেন, নিজের এই লম্বা হওয়া নিয়ে আমার নিজেরই ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। রাস্তাঘাটে বেরোলে সাড়া পড়ে যায়। যেখানে যাই, পিছনে ভিড়। তার ওপর সমস্যা হল, দরজার মাপ। কোনো বাড়িতে ঢুকতে হলে প্রতিমুহূর্তে আমাকে নিজের উচ্চতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় মনেও থাকে না কথাটা এবং মাথায় ঠোক্কর খাই। এই দেখুন না, কী অবস্থা হয়েছে?'

কপালে অনেক কালো ছোপ দেখে সমস্যাটা হাড়ে হাড়ে টের পেলুম। বললুম, 'আপনার এই দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থটাও যদি বাড়ত, তাহলে লোকেরা আপনাকে ভয়ও পেত।'

ড. গুপ্টা বললেন, 'রক্ষে করুন মশাই। তাহলে লোকেরা আমাকে ঘটোৎকচ বলতে শুরু করত। কী বলেন, কর্নেল?'

কর্নেল চোখ বুজে সাদা দাড়ি টানাটানি করছিলেন। বললেন, 'আচ্ছা ড. গুপ্টা, কবে থেকে আপনি লম্বা হতে শুরু করেছেন?'

ড. গুপ্টা কর্নেলের কথায় অবাক হলেন যেন।

'তা তো লক্ষ করিনি। তবে যতদূর মনে পড়ছে, মাস তিনেক আগে একদিন ভোর বেলা বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠে ঠোক্কর লাগল মাথায়। তখন... মাই গুডনেস!'

উনি আরামকেদারা থেকে সোজা হলেন হঠাৎ। কর্নেল বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'আমার মতো বোকা দেখছি পৃথিবীতেই নেই।' ড. গুপ্টা মুখে হতাশার ভাব ফুটিয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য! সত্যি তো, ব্যাপারটা ভেবে দেখা উচিত ছিল আমার। ওই প্রথম

মাথায় ঠোক্কর খাওয়ার আগের দিন সম্ভবত আমার উচ্চতা প্রায় স্বাভাবিক ছিল।... হ্যাঁ, স্বাভাবিক ছিল। কারণ, তার আগে তো বাথরুম কেন, কোনো ঘরের দরজার সামনে আমাকে মাথা হেঁট করতে হয়নি। কর্নেল, এই ব্যাপারটা আমার লক্ষ করতে ভুল হয়ে গেছে দেখছি।'

কর্নেল ওঁকে যেন আশ্বস্ত করতে চেয়েই বললেন, 'পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞ মানুষই নিজের সম্পর্কে অসচেতন। ও নিয়ে দুঃখ করার কিছু নেই। পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের একটু হেরফের ঘটলে মানুষ বামন কিংবা দৈত্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাদের গায়ে প্রচণ্ড শক্তিও এসে যায়।'

ড. গুন্টা আস্তে বললেন, 'তা ঠিক। কিন্তু আমার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন হয়ে এল। এই বয়সে হঠাৎ আমার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কেন এ-খেল দেখাল বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য আমি অনেকের তুলনায় একটু লম্বা ছিলুম ছেলেবেলা থেকেই। হঠাৎ একটা যেন দুর্ঘটনা ঘটল। আমি রাতারাতি সাত ফুট উঁচু হলুম। অথচ খেয়াল পর্যন্ত করলুম না। কর্নেল, ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে মনে হচ্ছে। আমি যাই।'

উনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজা দিয়ে মাথা যতদূর সম্ভব নীচু করে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল তাকিয়ে রইলেন অবাক হয়ে। আমিও।

ড. গুন্টা উঠেছিলেন পাশের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে সে-ঘরের দরজায় তালাবন্ধ দেখলুম। বললুম, 'কর্নেল, ড. গুন্টা কি বাংলো ছেড়ে চলে গেলেন নাকি!'

কর্নেল আমার কথার জবাব দিলেন না। বললেন, 'চলো জয়ন্ত, সেহরাগড় ফোর্টের ধ্বংসাবশেষ দেখে আসি।'

এই বাংলোটা একেবারে সংরক্ষিত জঙ্গলের ভেতর একটা টিলার গায়ে! নীচে ছোট্ট এক নদী। কাঠের সাঁকো পেরিয়ে বনজঙ্গল শুরু। দুর্গে পৌঁছোতে ঘণ্টা খানেক লাগল।

কিন্তু যা ভেবেছিলুম, তাই ঘটল। প্রকৃতিবিদ দুর্গের ওপর থেকে বাইনোকুলারে কী পাখি দেখতে পেয়ে আমার অস্তিত্ব ভুলে গেলেন এবং ধ্বংসাবশেষের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেওয়ালের ওপর বসে আমি নীচের জঙ্গলের শোভা দেখতে থাকলুম।

কতক্ষণ পরে পিছনে কী একটা শব্দে চমকে উঠে দেখি, ড. গুন্টা একটা প্রকাণ্ড পাথর ধরে টানাটানি করছেন। আমি ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম।

ড. গুন্টা চাপা হুংকার দিয়ে এক ঝটকায় বিশাল পাথরটা দু-হাতে শূন্যে তুললেন। তারপর সেটা নীচে ছুড়ে ফেললেন। নীচে বিকট শব্দ করে পাথরটা পড়ল এবং গড়াতে গড়াতে চলল। ড. গুন্টা হাত ঝাড়তে ঝাড়তে হাসিমুখে তাকালেন আমার দিকে। মুখের চেহারায় কেমন অস্বাভাবিকতা লক্ষ করে আমার অস্বস্তি হল। বললুম, 'ড. গুন্টা, আপনি দেখছি সুপারম্যানও বটে।'

ড. গুন্টা আমার কাছে এগিয়ে এসে সহাস্যে বললেন, 'মি. চৌধুরি, আমার ইচ্ছে করছে আপনাকে তুলে দূরে ছুড়ে ফেলি!'

আঁতকে উঠে বললুম, 'সে কী! না-না। দয়া করে ইচ্ছেটা একটু সামলে রাখুন, মশাই!'

'আমাকে ঘটোৎকচ মনে হচ্ছে না আপনার?'

'হচ্ছে। খুব হচ্ছে। আপনি ঘটোৎকচই বটে।'

ড. গুন্টা ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বললেন, 'খুব ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?'

‘পেয়েছি বই কী। আপনি অমন প্রকাণ্ড পাথরটা যেভাবে ছুড়ে ফেললেন!’

‘আরও শক্তি দেখবেন নাকি?’ বলে ড. গুন্টা দুর্গের উঁচু পাঁচিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দু-হাতে ঠেলতে শুরু করলেন। প্রকাণ্ড পাঁচিলটা সশব্দে ভেঙে পড়ল।

আমি এত ভয় পেয়ে গেছি যে, পালিয়ে যাওয়ার জন্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিরাপদ পথ খুঁজছি। ড. গুন্টা ফটকের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। আগের মতো দু-হাতের ধুলো-ময়লা ঝাড়তে ব্যস্ত। মুখে তৃপ্তির হাসি-কিন্তু কেমন অস্বাভাবিকতাও ফুটে আছে।

হঠাৎ উনি ফের চাপা হুংকার দিয়ে লাফ মারলেন এবং ওই লাফে অন্তত ফুট বিশেক উঁচু ফটকের মাথায় পৌঁছে গেলেন।

অমনি আমি নীচু পাঁচিলের ভাঙা অংশটা পেরিয়ে নামতে শুরু করলুম। এদিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। অজস্র পাথর আর ঝোপজঙ্গলে ভরতি। ভাগ্যিস নীচের গভীর গড়খাইটা শুকনো ছিল। হাঁচড়পাঁচড় করে ওপারে উঠতেই প্রকৃতিবিদের দেখা পেলুম। রুদ্ধশ্বাসে বললুম, ‘ড. গুন্টা সুপারম্যান হয়ে গেছেন। কীসব সাংঘাতিক কাণ্ড শুরু করেছেন, দেখলে বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে যাবে!’

কর্নেল কিন্তু হাসছিলেন। বললেন, ‘এখান থেকে বাইনোকুলারে আগাগোড়া সবটাই আমি দেখেছি, ডার্লিং। তবে ড. গুন্টাকে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।’

‘নেই মানে? আমাকে ছুড়ে ফেলার ইচ্ছে করছে বলেছিলেন!’

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, ‘সেই গল্পটা জান তো? এক পাগল যাচ্ছেতাই পাগলামি শুরু করেছে। একটা লোক যেই বলেছে, ওরে! দেখিস, যেন ঢিল ছুড়িস না-অমনি পাগল বলে উঠল, বাঃ! মনে পড়িয়ে দিয়েছে রে! বলে সে তখন ঢিল ছুড়তে লাগল। ড. গুন্টাকে আমরা হয়তো ওইরকম মনে পড়িয়ে দিয়েছি। যাই হোক, এসো-বাংলোয় ফেরা যাক।’

বিকেলে লনে বসে আছি কর্নেলের সঙ্গে, সেই সময় ড. গুন্টাকে ফিরতে দেখলুম। হাসিমুখে সম্ভাষণ করে বললেন, ‘সেহরাগড় ফরেস্টকে জব্দ করে এলুম, কর্নেল! শ-খানেক শাল গাছ উপড়েছি। একটা বাঘকে ছাতু করে দিয়েছি। একটা দাঁতাল হাতিকে আধমরা করে দিয়েছি। ঠ্যাং ভেঙে পড়ে আছে। আর, ফোর্টের অবস্থাটাও দেখে আসুন গিয়ে। একখানা দেওয়ালও আস্ত নেই।’

কর্নেল বললেন, ‘কিন্তু আপনার খাওয়াদাওয়া? চৌকিদারকে আপনার খাবার টেবিলে রাখতে বলেছিলুম। দেখুন তো!’

ড. গুন্টা বললেন, ‘আরে তাই তো! আমার খিদে পেয়েছে যে! আমি খাব- প্রচুর।’

তারপর ধুপধাপ শব্দে মাটি কাঁপিয়ে দৌড়োলেন। কর্নেল চেঁচিয়ে বললেন, ‘মাথায় ঠোক্কর লাগবে, ড. গুন্টা।’

ড. গুন্টা তক্ষুনি নীচু হয়ে বারান্দায় উঠলেন এবং দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর মিনিট দুই হয়েছে, পর্দা তুলে চৌকিদারকে ডাকতে থাকলেন। চৌকিদার এসে বলল, ‘হুজুর!’

‘এটুকু খানা তুমি আমার জন্যে রেখেছ? আমি কি মাছি না পিঁপড়ে?’

চৌকিদার বেজার মুখে বলল, ‘আর তো কিছু নেই, হুজুর।’

‘চলো দেখি, তোমার কিচেনে কী আছে।’

ড. গুন্টা কিচেনের দিকে গেলেন। চৌকিদারও গুটিসুটি পিছনে পিছনে গেল। কিন্তু একটু পরে সে দৌড়ে এল আমাদের কাছে। 'হুজুর! হুজুর! উনি আদমি না রাক্ষস? বাপরে বাপ! চাল, ময়দা, সবজি, যা ছিল-সব আস্ত গিলে খাচ্ছেন যে! একটা ব্যবস্থা আপনারা করুন, হুজুর!'

ড. গুন্টার হাঁক শোনা গেল, 'চৌকিদার! চৌকিদার!'

চৌকিদার চাপা গলায় বলল, 'দোষ-গলতি মাফ করবেন হুজুর। আমি এখন ওপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করতে চললুম।'

বেচারা চৌকিদার প্রায় লেজ তুলে দৌড়োনোর মতো গেট দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

তারপর কিচেনের দিক থেকে ড. গুন্টা বেরিয়ে এলেন। মুখে একরাশ ময়দা লেগে আছে। বললেন, 'এ কী বিচ্ছিরি খিদে বলুন তো, কর্নেল! ইচ্ছে করছে, আপনাদেরও খেয়ে ফেলি।'

কর্নেল সহাস্যে বললেন, 'জঙ্গলে গিয়ে হরিণ-টরিন ধরে খান না, ড. গুন্টা। কী আর করবেন!'

ড. গুন্টা সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালেন। বললেন, 'আরে, তাই তো বটে!' বলে মাটি কাঁপিয়ে বাংলোর প্রাঙ্গণের ধারে উঁচু বেড়া মড়মড় করে ভেঙে বেরিয়ে গেলেন।

উদবিগ্ন হয়ে বললুম, 'কর্নেল! ব্যাপারটা বড্ড ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে! চলুন, এখান থেকে চলে যাই আমরা। এ যে সত্যি ঘটোৎকচের কাণ্ড বেধে গেল।'

কর্নেল শুধু হাসলেন। আমার কথার কোনো জবাব দিলেন না।

ঘণ্টা দুই পরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাংলোয় বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মশার বড্ড জ্বালাতন। তাই আমরা ঘরে বসে আছি। ড. গুন্টার আর পাত্তা নেই। বলছিলুম, 'এতক্ষণে হয়তো জঙ্গলের সব হরিণ ওঁর পেটে চলে গেল।'

এমন সময় জিপের শব্দ হল বাইরে।

দু-জন ফরেস্ট অফিসার আর একদল গার্ড হন্তদন্ত হয়ে এসে গেলেন। রেঞ্জারসাহেব আমার চেনা। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, ‘কর্নেল! এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। আপনার পাশের ঘরের সেই লম্বা ভদ্রলোক...’

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন, ‘বুঝেছি। জঙ্গলে হরিণের পাল সাবাড় করে বেড়াচ্ছেন।’

রেঞ্জার বললেন, ‘দুঃখের কথা, আমরা ওঁকে গুলি করে মারতে বাধ্য হয়েছি।’

‘সে কী!’

‘গুলি না করে উপায় ছিল না। উনি একজন ফরেস্ট গার্ডকে আছাড় মেরে খুন করেছেন। সে এক বীভৎস দৃশ্য কর্নেল! লোকটা একেবারে নরদানব কিং কং বললেই চলে।’

কর্নেল আস্তে বললেন, ‘ঠিকই করেছেন। তা না হলে এবার ভদ্রলোককে আটকানো কঠিন হত। ক্রমশ ওঁর ভেতরে একটা ভয়ংকর শক্তি জেগে উঠছিল। এরপর জঙ্গল ছেড়ে হয়তো উনি বসতি এলাকায় গিয়ে ঢুকতেন। তারপর আরও বীভৎস ঘটনা ঘটত।’

কথা থামিয়ে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন, ‘চলুন তো, ওঁর ডেডবডিটা দেখে আসি।’

জিপে চেপে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরলুম। মাইল দুই এগিয়ে বাঁ-দিকে এক জায়গায় আগুন জ্বলতে দেখা গেল। রেঞ্জার বললেন, ‘ওই যে, ওখানে। ডেডবডির পাহারায় দু-জনকে বসিয়ে রেখে এসেছি।’

কাঠকুটো জ্বেলে লোক দুটো আসলে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করছিল। আমাদের দেখে সাহস ফিরে পেল। তারা বন দফতরের কর্মী। এক জনের হাতে একটা বন্দুক, অন্য জনের হাতে নিছক বল্লম। মুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছাপ লেগে আছে। একটু তফাতে দলা পাকানো রক্তাক্ত একটা লাশ পড়ে ছিল। রেঞ্জার টর্চের আলোয় সেটা দেখিয়ে বললেন, ‘এটা ফরেস্ট গার্ড মণি সিং-এর ডেডবডি। কী অবস্থা হয়েছে দেখুন।’

কর্নেল বললেন, ‘ড. গুন্টার ডেডবডি কোথায়?’

রেঞ্জার পা বাড়িয়ে বললেন, ‘আসুন, দেখাচ্ছি।’

জায়গাটা খোলামেলা। একটু এগিয়ে টর্চের আলোয় একটা ছোটো নদী দেখা গেল। বালি আর পাথরে ভরতি। রেঞ্জার অবাক হয়ে বললেন, ‘সর্বনাশ! ডেডবডিটা কোথায় গেল। জানোয়ারে টেনে নিয়ে গেল না তো?’

বালির ওপর একটু রক্তের ছাপ চোখে পড়ল। কর্নেল টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে জায়গাটা দেখে বললেন, ‘না। টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু... আশ্চর্য তো!’

‘কী কর্নেল?’

‘মনে হচ্ছে, ড. গুন্টা মারা যাননি। দিব্যি পায়ে হেঁটে চলে গেছেন।’

‘অসম্ভব! গুলি করার পর আমরা ওঁকে পরীক্ষা করে দেখেছিলুম। দেহে প্রাণ ছিল না। দুটো গুলিই হার্টে লেগেছিল।’

যে দুটো লোক পাহারায় ছিল, তাদের এক জন বলল, ‘কী একটা শব্দ শুনেছিলুম, কিছুক্ষণ আগে। টর্চ জ্বেলে কিন্তু কিছু দেখতে পাইনি।’

অন্য লোকটি বলল, ‘আমি ভেবেছিলুম কোনো জানোয়ার।’

রেঞ্জার তাদের খুব বকাবকি করলেন। তারা আমতা-আমতা করছিল। বুঝতে পারছিলুম, ওদের বকাবকি করা বৃথা। বেচারারা ভয়ে আধমরা হয়ে বসেছিল। যদি দেখত, ড. গুন্টার মড়া হেঁটে যাচ্ছে, তাদের ভিরমি খেয়ে পড়ে থাকতে হত।

কর্নেল পায়ের ছাপ অনুসরণ করে নদীর ওপার পর্যন্ত গেলেন। আমরাও ওঁর সঙ্গে গেলুম। কিন্তু তারপর কঠিন পাথুরে মাটিতে আর কোনো ছাপ দেখা গেল না। কর্নেল উদবিগ্ন মুখে বললেন, 'সেহরাগড় টাউনশিপের লোকেদের ভাগ্যে কী আছে কে জানে! আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে।'

ফরেস্ট বাংলোয় ফিরে এ রাতে আর অন্ধকার বনভূমির সৌন্দর্য দেখার মন ছিল না। তা ছাড়া মশার খুব উৎপাত, সেকথা আগেই বলেছি।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাটাচ্ছিলুম। কর্নেলের নাক ডাকছিল যথারীতি।

একসময় হঠাৎ বাইরে কী একটা ধাক্কা দেওয়ার শব্দ হল। অমনি কর্নেলের নাক ডাকাও থেমে গেল। ওঁর ঘুম বরাবর পাতলা। ওদিকে পাশের ঘরে কেউ যেন চুপি চুপি তালা খুলছে। তারপর সাবধানে দরজা খুলল। কর্নেলের নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলুম। তারপর টেবিলবাতিটা জ্বলে উঠল। ফিসফিস করে বললুম, 'কর্নেল! পাশের ঘরে কে যেন ঢুকল।'

কর্নেলও ফিসফিস করে বললেন, 'চুপ!'

উনি বারান্দার দিকের জানলার পর্দা তুলে উঁকি দিলেন। আমিও ওঁর কাছে গিয়ে উঁকি দিলুম। বারান্দায় আলো আছে। একটু পরে শিউরে উঠে দেখি, পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং ড. আর.পি. গুন্টা। হাতে একটা প্রকাণ্ড সুটকেস। পোশাকে ধুলো-ময়লা আর চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে। বারান্দা থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চলে গেলেন।

কর্নেল বললেন, 'যাকগে। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমুনো যাবে।'

বললুম, 'রহস্যটা কিন্তু শেষপর্যন্ত রহস্যই থেকে গেল, কর্নেল।'

কর্নেল একটু হাসলেন, 'তা ঠিক। তবে যা আশঙ্কা করেছিলুম, সম্ভবত তত কিছু ঘটবে না। কারণ ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সেই দানব শেষপর্যন্ত দানবই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ড. গুন্টাকে দেখলুম, দিব্যি ভদ্রলোকের মতো নিজের জিনিসপত্র নিতে এসেছিলেন। তার মানে, সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে ওঁর এবং ঘরের ছেলে ঘরে ফেরাই সাব্যস্ত করেছেন।'

পরদিন আমরা জঙ্গল থেকে সেহরাগড় টাউনশিপ ফিরে গেলুম। তারপর সেখান থেকে বাসে চেপে ফৈজাবাদ। কলকাতা ফেরার ট্রেন রাত বারোটা নাগাদ। একটা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে কর্নেল হঠাৎ বললেন, 'চলো জয়ন্ত, ড. গুন্টার খোঁজখবর নিয়ে আসি।'

অবাক হয়ে বললুম, 'সর্বনাশ! উনি কি ফৈজাবাদের লোক নাকি?'

'বাংলোর খাতায় সেই ঠিকানাই তো জেনেছি।'

'কিন্তু...'

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমার ধারণা, ড. গুন্টা এখন আর নরদানব বা ঘটোৎকচ হয়ে নেই। কাজেই ওঁকে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। হয়তো ভুলটা আমারই।

আমি ওঁকে সচেতন করে দেওয়াতে ওইসব বীভৎস ঘটনা ঘটেছে। তোমাকে সেই পাগলের গল্পটা বলেছিলুম, আশা করি মনে আছে। কোনো কারণে মানুষের মধ্যে অস্বাভাবিকতা এলে তাকে উত্ত্যক্ত করা উচিত নয়।'

রাত এখন প্রায় ন-টা। কিন্তু ফৈজাবাদ ছোট্ট শহর। ড. গুন্টাকে সবাই চেনে-সেটা উনি লম্বা মানুষ বলেই। শেষদিকে একটা টিলার গায়ে একটা পুরোনো গড়নের বাড়ি। টাঙ্গাওয়ালা তার গেটের কাছে নামিয়ে দিল আমাদের। লন পেরিয়ে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল, বাড়িতে যেন জনমানুষ নেই। অস্বাভাবিক স্তব্ধ পরিবেশ। তবে আলো দেখা যাচ্ছিল একটা ঘরে।

দরজার বোতাম টেপার বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলল। সেই অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা মানুষ, চেনা মুখ। অমায়িক হেসে বললেন, 'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

আমি তো অবাক! কর্নেল নমস্কার করে বললেন, 'আপাতত আসছি সেহরাগড় থেকে। আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে, ড. গুন্টা।'

ড. গুন্টা ভুরু কুঁচকে কী স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন, 'সেহরাগড়! সেখানে তো একটা জঙ্গল আছে শুনেছি। যাকগে, ভেতরে আসুন।'

ভেতরে ঢুকে আমরা বসলুম। ড. গুন্টাও বসলেন। ওঁর মুখে বিস্ময় লক্ষ করছিলুম। কর্নেল বললেন, 'ড. গুন্টা, আপনার প্রজেক্ট যে সাকসেসফুল সেই কথাটা বলতে এসেছি-যদিও দেশের আইনে আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন।'

ড. গুন্টা চমকে উঠলেন, 'কী বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনার ফ্যান্টম প্রতিমূর্তি সেহরাগড় জঙ্গলে বীভৎস কাণ্ডকারখানা করেছে, জানেন কি?'

ড. গুন্টা নড়ে বসলেন, 'মাই গুডনেস!'

'হ্যাঁ। এক ডজন হরিণ, একটা বাঘ আর একজন ফরেস্ট গার্ডকে আপনার ফ্যান্টম প্রতিমূর্তি খুন করে ফেলেছে। অসংখ্য গাছ উপড়ে ফেলেছে। সেহরাগড় কেল্লাটা ভাঙচুর করেছে। এমনকী একটা দাঁতাল হাতিকেও মারাত্মক জখম করেছে।'

ড. গুন্টা দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ভাঙা গলায় বললেন, 'কিন্তু আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।'

'কিন্তু আপনি একজন বায়োফিজিসিস্ট। আপনি জানতেন, আপনার ফ্যান্টম প্রজেক্টের পরিণতি সাংঘাতিক হতে পারে।'

ড. গুন্টা উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে বললেন, 'বিশ্বাস করুন, মাস তিনেক আগে হঠাৎ আমার উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার পর কী কী ঘটেছে, এখন একটুও মনে নেই।'

'আইন কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না, ড. গুন্টা।'

ড. গুন্টা হঠাৎ সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর ঝনঝন দুমদাম প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। উদবিগ্ন হয়ে বললুম, 'কী ব্যাপার, কর্নেল?'

কর্নেল হাসলেন, 'ল্যাবরেটরি ভাঙছেন। প্রমাণ লোপের চেষ্টা। যাই হোক, আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়, জয়ন্ত। চলো, আমরা কেটে পড়ি।'

স্টেশনে পৌঁছে বললুম, 'ফ্যান্টম প্রতিমূর্তি ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন তো?'

কর্নেল বললেন, 'প্রতিবস্তুর কথা নিশ্চয়ই শুনেছ। মানুষের ব্যক্তিসত্তার তেমনই কোনো প্রতিরূপ আছে কি না, এ-নিয়ে বায়োফিজিসিস্টরা গবেষণা করেছেন। কতকটা ড. জেকিল এবং মি. হাইডের ব্যাপারটা যেমন। তবে ওই প্রতিরূপ ফ্যান্টম অস্তিত্ব কোনো মানুষের স্বাভাবিক চরিত্রের একেবারে উলটো না হতেও পারে। আমাদের মধ্যে একটা করে প্রতি-মানুষ আছে। সে অসম্ভব শক্তিমান। তাকে দিয়ে যেমন ভালো কাজ করানো যায়, তেমনই খারাপ কাজও করানো যায়। কাজেই ওই ফ্যান্টম-প্রতিমূর্তিকে তুমি ঘটোৎকচ বলতেও পার। ভুলে যেয়ো না, মহাভারতের ঘটোৎকচ একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। তবে অতিমানুষ। তাকে জাগালে ভালো বা মন্দ দুই-ই ঘটতে পারে।'

ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছিল না। তাই বললুম, 'নিকুচি করেছে ফ্যান্টম ব্যাটার। তাকে জাগিয়ে আর কাজ নেই।'

জিমি

ভোঁদড়কে কোথাও উদবেড়াল, আবার কোথাও জলবেড়াল বলা হয়। এর একটা বড়ো কারণ, ভোঁদড় বেড়ালের মতনই মাছ খেতে খুব ভালোবাসে। কিন্তু ভোঁদড় যে পোষ মানে আমি জানতুম না। বনের যেখানে আমার আড্ডা অর্থাৎ কাঠের একটা বাংলোবাড়ি, তার পিছনে পাহাড়ি নদী আছে। ওখানটায় নদী বেঁকেছে। আর বাঁকের মুখে অতল জলের দহ। কোনো স্রোত নেই। ঝকঝকে কালো জল। তলা অব্দি পরিষ্কার দেখা যায়। ওই জলে ছিপ ফেলে মাছ ধরা আমার নেশা ছিল। শরৎকালের এক সকালে ছিপ হাতে গিয়ে দেখি, বিশাল বট গাছের শেকড়ে একটা বড়ো মাছের মুড়ো আটকে রয়েছে। আশেপাশে কয়েক টুকরো কাঁটাও দেখতে পেলুম। শেকড়টা যেখানে জলে নেমেছে, সেখানে চোখ পড়তেই মনে হল কী একটা লুকোবার চেষ্টা করছে। আমার চোখে পুবের সূর্য নদীর তলায় প্রতিফলিত হয়ে জলে ঠিকরে পড়ছিল। তাই তক্ষুনি বুঝতে পারলুম না ওটা কী।

মাছটা যে ভোঁদড়েই মেরেছে, তা বোঝা গেল। হয়তো এখনও খাচ্ছিল, আমি এসে পড়ায় লুকিয়ে গেছে ঝোপে। তাই একটু তফাতে ছিপ ফেলে বসলুম। কিন্তু একটা চোখ রাখলুম সেদিকে। শেকড়ের তলায় যেটা নড়ছিল, সেটা কী, এতক্ষণে বুঝলুম। সেটা একটা পাইথন-যাকে বলে অজগর সাপ। আমি জানতুম, সাপটা বটের তলায় কোনো একটা গর্তেই থাকে। মাঝে মাঝে জলে ওর মাথা দেখতে পেতুম। কিন্তু আমার সাড়া পেলেই লুকিয়ে পড়ত।

এখন দেখি সাপটা সাবধানে এবার শেকড় বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। কী ব্যাপার? ভোঁদড়বাবাজির এঁটো খাবে নাকি? মাছের মুড়োটা আন্দাজ কিলো দুইয়ের কম নয়। সাপটার সকালের খাওয়াটা ভালোই হবে মনে হল। কিন্তু অতবড়ো মাছ যে মেরেছে, সেই চতুর ও শক্তিমান শিকারিকে দেখতেই আমার লোভ হচ্ছিল বেশি।

সাপটা যেভাবে এগোচ্ছিল, আমার হাসি পাচ্ছিল। অত সাবধান হওয়ার কারণ কী? ওই তো পেট ভরাবার মতন চমৎকার সুস্বাদু খাবার। মুখ বাড়ালেই পেয়ে যাবে।

পরক্ষণেই আমাকে চমকে দিয়ে গাছের ওপর থেকে কী একটা ঝাঁপ দিল। তারপর সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হল। ফোঁস ফোঁস-খক ররর... খাঁক খকরর...! ঠাহর করে দেখি, হ্যাঁ-সেই শিকারি ভোঁদড়টাই বটে। ভোজে ভাগ বসানো সে একেবারে বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

রীতিমতো যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন। দু-জনে লড়তে লড়তে কখনো ঝোপের দিকে এগোচ্ছে। আবার পিছিয়ে জলের দিকেও চলে আসছে। আমার ভয় হল, ভোঁদড়টা যদি বোকা হয়, তাহলে অজগরটার ফন্দি টের পাবে না-জলে নেমে আসবে। কিন্তু এখন আমার করার কিছু নেই। হঠাৎ গাছ থেকে আবার কী একটা ঝুপ করে পড়ল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। অতটুকু খুদে একটা বাচ্চা ভোঁদড় বুঝি এতক্ষণ চুপচাপ বসে সব লক্ষ করছিল। এতক্ষণে মায়ের বিপদ আঁচ করে মায়ের পাশে দাঁড়াতে এল। বড়ো ভোঁদড়টা যে মাদি, তা বোঝা যাচ্ছিল। আমার খুব ভালো লেগে গেল ওই বাচ্চাটার এই মাতৃভক্তি এবং মরিয়াপনা। বার বার দু-পাশে লাফিয়ে লাফিয়ে সে সাপটার গায়ে কামড় বসাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সাপটা প্রকাণ্ড লেজ তুলে তাকে পালটা আক্রমণ করতেই সে ভড়কে গেল।

ইতিমধ্যে সাপটা বড়ো ভোঁদড়টাকে প্রায় জলের মধ্যে এনে ফেলেছে। হঠাৎ যেই বড়ো ভোঁদড়টা বোকার মতন সাপের মাথা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল, অমনি গিয়ে জলে পড়ল। সাপটা যেন এই সুযোগই খুঁজছিল। তার লম্বা বিকট মাথাটা বোঁও করে ঘুরে জলে ডুবতে দেখলুম। তারপর জলের গভীরে সে কী আলোড়ন! বাচ্চাটা তখন জলের ধারে প্রায় দু-পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। বেচারার অসহায় অবস্থা দেখে খুব মায়া হল।

সেই সময় সাপটা এতক্ষণে জল থেকে মাথা তুলল। এবার আমার মাথার চুল শিরশির করে উঠল। বড়ো ভোঁদড়টার মুণ্ডু কামড়ে ধরেছে সাপটা। ওই অবস্থায় সে আবার ডুবল। কিছু দূরে যখন মাথা তুলল, দেখি তখনও মাথা কামড়ে ধরে ভোঁদড়টাকে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হল ওপারের পাথরের খাড়ির মধ্যে কোনো গর্তে ঢুকে জন্তুটাকে গিলে খাবে। রাগে-দুঃখে আমি কাঁপতে থাকলুম। কিন্তু বুদ্ধির ভুলে সঙ্গে বন্দুক আনিনি। কী আর করব? পাথর ছুড়ে হয়তো লড়াই থামাতে পারতুম। কিন্তু সারাক্ষণ ব্যাপারটা হাঁ করে শুধু দেখে গেছি। ভাবতেই পারিনি যে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড এ-থেকে ঘটতে পারে।

বেচারা মাতৃহারা খুদে ভোঁদড়টাকে আর দেখতে পেলুম না। মাছধরা রেখে ওকে সে-বেলা খুব খোঁজাখুঁজি করলুম। কিন্তু তার পাত্তাই নেই।

তারপর কয়েকটা দিন ওখানে মাছ ধরতে গেছি। দূর থেকে সাপটাকে অনেক বার মাথা তুলতে দেখেছি, কিন্তু খুদে বেচারার পাত্তা নেই। একদিন মাথায় বুদ্ধি খেলল। একটা ফাঁদ পেতে ওকে ধরা যায় কি না ভাবলুম। আমার মনে হচ্ছিল, কবে না ও বেচারাও রাক্ষুসে অজগরটার পাল্লায় পড়ে যায়। তা ছাড়া অত ছোটো প্রাণী, এখনও কি নিজের গায়ের জোরে শিকার ধরতে শিখেছে? ও হয়তো না খেয়েই মারা যাবে?

একটা ফাঁদের খাঁচা তৈরি করে জলে কিছুটা ডুবিয়ে রাখলুম। খাঁচার ভেতরে রাখলুম একটা মাছ। তারপর দূরে বসে পাহারায় থাকলুম।

সেদিনই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বাচ্চাটা বার তিনেক এল। জলের ধারে ধারে ঘুরঘুর করল। মাঝে মাঝে ভয় পেয়ে চমকে দৌড় দিল ঝোপের দিকে। চার বারের বার সোজা খাঁচার দিকে চলে গেল সে এবং মাছটা ধরতে গিয়েই আটকে গেল ফাঁদে।

এভাবেই 'জিমি' আমার বাড়ির অতিথি হয়ে এল এবং তারপর রীতিমতো ভদ্র সভ্য চমৎকার একটি প্রাণী হয়ে উঠল। স্বাস্থ্যও হয়ে উঠল অপূর্ব।

এক মাস পরে দেখলুম ছেড়ে দিলেও জিমি পালাবার নাম করে না। আমার কুকুর জ্যাকির সঙ্গে ওর দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে যখন জ্যাকিকে নিয়ে শিকারে যাই, জিমির সে কী ছটফটানি! কিন্তু তাকে সঙ্গে নিতে ভয় পাই-ওকে তো জ্যাকির মতন ডাঙার জন্তু শিকারের শিক্ষা দেওয়া হয়নি! বড়ো জোর ছিপে মাছ ধরার সময় ওকে সঙ্গে নেওয়া যায়। তবে নদীর দহে ওকে নিয়ে যাচ্ছি না। শয়তান অজগরটা রয়েছে! ওটাকে অবশ্য মেরে ফেলা যায়। কিন্তু কষ্ট হয়। আহা, বুড়ো হয়ে কতকাল বেঁচে আছে সে। ওর ভয়েই তো এদিকে জেলেরা কেউ মাছ ধরতে আসে না। নয়তো কবে দহের মাছ শেষ হয়ে যেত। ফলে জিমিকে বাঁচানো যেত না। মাছের অভাবে।

তখন বেশ শীত এসে গেছে জাঁকিয়ে। ঘন কুয়াশায় বন সকাল-সন্ধ্যা ধূসর হয়ে থাকে। সন্ধ্যায় আগুন জ্বেলে জ্যাকি আর জিমিকে নিয়ে বসে থাকি। সকাল সকাল শুয়ে পড়ি। সারারাত নিজঝুম বনে শীতেকাতর জন্তুজানোয়ার ডেকে ওঠে। জ্যাকি ও জিমি কম্বলের তলায় শুয়ে নাক ডাকায়।

হঠাৎ একরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। কেন ভাঙল বুঝতে পারলুম না। কিন্তু পরক্ষণেই জ্যাকি খুব গরগর করতে থাকল। টর্চ জ্বেলে দেখি জ্যাকি কোনার দিকে মেঝেয় ঝুঁকে গর্জাচ্ছে। উঠে গেলুম। তারপর আমি তো বোকা বনে তাকিয়ে রইলুম। ওরে দুষ্টু! এত ধুরন্ধর হয়েছ তলায় তলায়! সিঁদ কাটতেও শিখে গেছ!

আমার এই ঘরটা মাটি থেকে সাত ফুট উঁচুতে-মেঝেয় কাঠের পাটাতন। ওই কোনার একজায়গায় কীভাবে ফাটল ধরেছিল এবং পেরেকগুলোও ছিল মরচে-পড়া। তাই সাবধানতার জন্যে একটা ড্রাম রেখেছিলুম ওখানে। জিমি করেছে কী, ড্রামটার তলায় কবে কবে পেরেক ছাড়িয়ে কাঠ সরিয়েছে। একটা কাঠের তক্তা ঝুলে গেছে নীচে। আর সে সেই ফাঁক গলিয়ে কোথায় পালিয়েছে।

রাগে-দুঃখে অস্থির হলুম। কিন্তু এই শীতের রাতে আর কী করা যাবে? জ্যাকিকে খুব ধমক লাগালুম। কেন সে আগে আমাকে জানায়নি? জ্যাকি খুব দুঃখিত মুখে তাকিয়ে থাকল। মনে হল, সেও ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেনি।

কিন্তু গেল কোথায় জিমি এত রাতে? পালাবার হলে তো দিনে যেকোনো সময় পালাতে পারত।

শুয়ে এইসব ভাবছি, হঠাৎ ড্রামটা নড়ে উঠল। টর্চ জ্বেলে দেখি-হ্যাঁ-শ্রীমান ফিরছে। কিন্তু ও কী, জিমি কী একটা টেনে তোলার চেষ্টা করছে তলা থেকে। টর্চের আলোয় ওর নীল চোখে পালটা ধমক দেখলুম-যেন বলছে, আঃ, আলোটা বন্ধ করো তো!

এবার দেখলুম, জিমির যে স্বভাব এতদিন চাপা ছিল, তার বশেই সে নিশুতি রাতে বেরিয়ে পড়েছিল। একটা কিলো দশেক ওজনের মহাশের মাছ মেরে খুদে শিকারিমশায় গর্বিত মুখে ফিরছেন।

জ্যাকিও লেজ নেড়ে খুব আনন্দ প্রকাশ করল। আমি জিমির পিঠে হাত বুলোতে গিয়ে দেখলুম জল ঝরছে। বললুম, 'ওরে, নিমুনি হবে যে! আয় মুছে দি। তারপর ফায়ারপ্লেসে গিয়ে আগুন জ্বালি-সেঁকে নিবি।'

জিমি ড্যামকেয়ার-গোছের মাথা দোলাল। যেন বলল, আরে যাও যাও! রাতবিরেতে জলই তো আমাদের বড়ো আড্ডা। ওসব ভেবো না। বরং, গা মুছতে রাজি আছি। তার বেশি নয়।

তারপর থেকে ওকে নিশিরাতের অভিযানে যেতে আর বাধা দিতুম না। জানতুম বাধা দিলে ও মানবে না। শুধু ভয় হত সেই অজগর সাপটার কথা ভেবে। তার পাল্লায় পড়লে জিমি নিজেকে বাঁচাতে পারবে তো? অবশ্য এখন শীত। সাপটা নিশ্চয় গর্তে ঘুমোতে গেছে।

সারা শীতকালটা জিমি খুব মাছ শিকার করে খাওয়াল। বসন্তের এক রাতে সে বারোটায় বেরিয়ে ফিরল একেবারে রাত তিনটেয়। উদবিগ্ন হয়ে দেখলুম, তার নখে, ঠোঁটে, গায়ে চাপ চাপ রক্ত। শিউরে উঠে বললুম, 'এ কী রে জিমি! কী হয়েছে?'

জ্যাকি খুব গর্জন শুরু করল। জিমিকে কোলে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, রক্ত জিমির নয়। অন্য কারও।

চমকে উঠলুম। এতদিন বসন্তে অজগরটার ঘুম ভেঙেছে নিশ্চয়। তাহলে কি জিমি তাকেই আক্রমণ করে বসেছিল? বললুম, 'জিমি, জিমি! কার সঙ্গে লড়াই করে এলি তুই? এ কার রক্ত?'

জিমির নীল চোখে আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল।

সেই রাতেই বন্দুক হাতে বেরিয়ে পড়লুম টর্চ নিয়ে। সঙ্গে চলল জ্যাকি আর জিমি। নদীর দহের কাছে গেলুম। টর্চের আলো ফেলতেই চমকে উঠলুম। হ্যাঁ, রাক্ষুসে অজগরটা রক্তাক্ত হয়ে মরে পড়ে আছে। এতদিনে জিমি তার মায়ের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে।

কাটামুণ্ডু এবং বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত

বিকেলে রোজকার মতো ঝিলের ধারে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। সঙ্গে আমার প্রিয় কুকুর জিম। পাশের খেলার মাঠে ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। কিছুক্ষণ তাদের খেলা দেখে ঘাসের ওপর বসে জলের শোভাদর্শনে মন দিলুম। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত বলেন, মাঝে মাঝে জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে বুদ্ধি খোলে। পৃথিবীর অনেক ঘোরালো-প্যাঁচালো ব্যাপার একেবারে জল হয়ে যায়!

তবে সেজন্য নয়, আমার এটা নিছক অভ্যাস। শেষবেলায় জলের ওপর নরম গোলাপি রোদ্দুর, জল-মাকড়সার রেস, সবুজ দামে প্রজাপতির ওড়াউড়ি, মাছরাঙার জিমন্যাস্টিক- কত কী দেখার আছে!

জিম বড্ড ছটফটে প্রাণী। যতক্ষণ বসে থাকি, সে খুদে চার ঠ্যাঙে আনাচেকানাচে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। দৈবাৎ ঝিলের দাম থেকে একটা প্রজাপতি ডাঙার দিকে উড়ে এলেই জিম তাকে তাড়া করবে। বেচারা প্রজাপতি। তার আর বাড়ি ফেরা হবে না! সমস্যা হল, জিম এ-সময় কিছুতেই আমার বারণ মানবে না।

আজও তার ওই দুষ্টুমি দেখছি, হঠাৎ পাশের একটা ঝোপ থেকে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত বেরিয়ে এলেন। মুখে মিটিমিটি হাসি। বললেন, 'জল দেখছেন? দেখুন, দেখুন! মশাই, যে বলেছিল জলের আর এক নাম জীবন, তাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত।'

চন্দ্রকান্ত আমার পাশে বসলেন। বললুম, 'ঝোপের ভেতর আশা করি কোনো সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন।'

চন্দ্রকান্ত ফিক করে হাসলেন। 'চেপে যান। নো কোয়েশ্চন!'

'আহা, আমাকে বলতে দোষ কী?' চাপা স্বরে বললুম। 'আমি তো কাউকে ফাঁস করতে যাচ্ছি না!'

অমনি বিজ্ঞানীপ্রবর গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'চুপ! রামু শুনতে পাবে।'

ঘুরে দেখলুম, রামু ধোপা যথারীতি ঝিলের ধারে শুকোতে দেওয়া কাপড় তুলতে এসেছে। তার গাধাটিও তৈরি। জিম কেন কে জানে, রামুর গাধাকে একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না। তাকে ক্রমাগত ধমক দেয়। আজ জিম ধমক দিতে যেই কাছে গেছে, রামুর গাধা পেছনকার ঠ্যাং ছুড়ে পালটা বিকট হুংকার দিল। জিম ভয় পেয়ে পালিয়ে এল। আমার কোলে এসে বসে পড়ল।

বিরক্ত বিজ্ঞানী বললেন, 'দিলে মেজাজটা তেতো করে। একে তো এই শহরটা দিনে দিনে বিচ্ছিরি তেতো হয়ে যাচ্ছে, ওই গাধাটা তাকে আরও তেতো করে দেয়। ছ্যা ছ্যা! নেচারের কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। গাধাকে কখনো ভয়েস দিতে আছে?'

চন্দ্রকান্ত আপনমনে বকবক করতে থাকলেন। একটু পরে ফের বললুম, 'রামু চলে যাচ্ছে। এবার বলুন, কী এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন?'

চন্দ্রকান্ত চোখ টিপে বললেন, 'চেপে যান। বাতাসেরও কান আছে।'

'প্লিজ! আমার কানে কানে বলুন না! বাতাসের কানে বলতে বলছি না।'

চন্দ্রকান্ত আবার ফিক করে হেসে বললেন, 'কালই জানতে পারবেন। হইচই পড়ে যাবে। কিন্তু সাবধান মশাই! স্পিকটি নট। এবার আমার এক্সপেরিমেন্ট সাংঘাতিক ধরনের।'

বলে হঠাৎ উঠে চলে গেলেন।

গেলেন ঝিলের ধারে ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে। এদিকটায় ভাঙা মন্দির আর ঘন জঙ্গল। দিনশেষের ধূসরতার ভেতর তাঁর বেঁটে মূর্তিটি আবছা হতে হতে গাছপালার ভেতর মিলিয়ে গেল। ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

সকালে আমার বিচ্ছু ভাগনে ডনকে সংস্কৃত পড়াতে আসেন ভবভূতি ভটচাজ। আমরা বলি পণ্ডিতমশাই। ডনের বাবার মতে, 'বাংলা ভালো করে শিখতে হলে সংস্কৃত শেখা দরকার। স্কুলে আজকাল সংস্কৃত ঐচ্ছিক বিষয় করে মাতৃভাষার বারোটা বাজানো হচ্ছে।' বেচারা ডনের অবস্থা করুণ। কারণ পণ্ডিতমশাই তার চেয়েও বিচ্ছু। বেগড়বাই দেখলেই 'পুরাতন দণ্ড' বরাদ্দ। ডনের বাবার ঢালাও হুকুম।

আর পণ্ডিতমশাইয়ের 'পুরাতন দণ্ড' মানে কানের পাশের 'কেশাকর্ষণ', আঙুলের ভেতর ডট পেন গুঁজে 'করনিষ্পেষণ'-বড়ো সাংঘাতিক! পণ্ডিতমশাই কঠিন কঠিন শব্দ আওড়ান। সাধু ভাষায় কথা বলেন। তাঁর শাস্তিও ওই সাধু ভাষার মতো উচ্চস্তরের। ডনের জন্য দুঃখ হয়।

এদিন সকালে পণ্ডিতমশাই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে হাঁফাতে হাঁফাতে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'হত্যাকাণ্ড! বীভৎস হত্যাকাণ্ড!' তারপর দমাস করে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

বাড়িতে সাড়া পড়ে গেল। জল, টেবিল ফ্যান, ছোটাছুটি। ডনের বাবা, অর্থাৎ আমার জামাইবাবু গর্জন করলেন, 'ডাক্তার! ডাক্তার!'

পণ্ডিতমশাইয়ের অবশ্য তক্ষুনি জ্ঞান ফিরল। উঠে বসে বললেন, 'অহো! অহো! কী নিদারুণ দৃশ্য এই প্রভাতে অবলোকন করিলাম!'

বললুম, 'কী হয়েছে পণ্ডিতমশাই?'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'হত্যাকাণ্ড! শোচনীয় হত্যাকাণ্ড!'

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথায়? কোথায়?'

'লৌহবর্ত্মের দুই পার্শ্বে।' পণ্ডিতমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'একপার্শ্বে কবন্ধ দেহ, অন্য পার্শ্বে মস্তক। অহো! অহো!'

'লৌহবর্ত্ম' যে রেললাইন, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেছি। পণ্ডিতমশাই থাকেন রেললাইনের ওধারে। বললুম, 'ট্রেনে মানুষ কাটা পড়েছে?'

পণ্ডিতমশাই খাপ্পা হয়ে বললেন, 'তুমি হস্তীমূর্খ। স্বচক্ষে দর্শন না করিলে বুঝিবে না। সহস্র জনসমাগম! তিন আরক্ষাধক্ষ্যের কূট দ্বন্দ্ব! অহো! মনুষ্যগণ গর্দভে পরিণত!'

ব্যাপারটা দেখতে বেরিয়ে পড়লুম। 'আরক্ষাধ্যক্ষ' মানে দারোগাবাবু তাতে ভুল নেই।

গিয়ে দেখি, সহস্র না হলেও লোকের ভিড় জমেছে বটে! রেললাইনের ওধারে একটা ভিড়, এধারে একটা ভিড়। আর রেললাইনে দাঁড়িয়ে আছেন তিন জন দারোগাবাবু, একদঙ্গল কনস্টেবল।

প্রথমে এধারের ভিড়ের ভেতর উঁকি মেরেই আঁতকে উঠলুম। একটা রক্তাক্ত 'কবন্ধ', অর্থাৎ, মুণ্ডুকাটা ধড়।

রেললাইনের ওধারে গিয়ে ভিড়ে উঁকি মেরে আরও আঁতকে উঠলুম। একটা কাটা মুণ্ডু। চোখ দুটো খোলা। বীভৎস দৃশ্য!

রেললাইনে উঠে এলুম। পুলিশের মধ্যে সত্যিই 'কূট দ্বন্দ্ব' চলেছে। এধারে আমাদের থানার দারোগাবাবু বঙ্কুবিহারী ধাড়া। ওধারে আলাদা থানা। সেখানকার দারোগাবাবু নীলমাধব রক্ষিত। দু-জনেই দুঁদে পুলিশ-অফিসার। তৃতীয় দারোগাবাবু রেলের গয়ারাম পাণ্ডে। তিনিও কম দাপুটে নন। তিন জনে আইন নিয়ে চুলচেরা বিচার আর তর্কাতর্কি চলেছে।

বঙ্কুবাবু বলছেন, 'ধুর মশাই! রেলে কাটা বডি। রেল-পুলিশ বডি তুলুক।'

নিলুবাবুও তাঁকে সায় দিয়ে বলছেন, 'আলবত তাই! পাণ্ডেজি বডি নিয়ে যান।'

গয়ারাম পাণ্ডের গোঁফ তিরতির করে কাঁপছে। বলছেন, 'কভি নেহি! কাঁহা রেলবে লাইন, কাঁহাপর বডি। দেখিয়ে! উঁহা বডি, উঁহা হেড।'

তারপর আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন। 'দেখুন তো মোশা! রেললাইনে কুছু ব্লাড দেখা যায়? কেমন চমক দিচ্ছে লাইন-একদম সিলভারকা মাফিক চমক! হামি বলছে, ইয়ে মার্ডার আছে। অ্যাকসিডেন্ট না আছে।' বলে তিনি অপর দুই দারোগাকে চার্জ করলেন, 'লাইনপর ব্লাড দেখাইয়ে!'

বঙ্কুবাবু এবং নিলুবাবু মুখ-তাকাতাকি করলেন। লক্ষ করে দেখলুম, সত্যি এখানে রেললাইনে কোনো রক্তের চিহ্ন নেই।

হঠাৎ একজন পুলিশ বলে উঠল, 'পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে! এই তো রক্তের দাগ!'

সবাই হন্তদন্ত হয়ে সেখানে গেলেন। লাইনের পাশে খানিকটা রক্ত। বঙ্কুবাবু ও নিলুবাবু এক গলায় বললেন, 'পাণ্ডেজি, বডি আপনার!'

রেল-দারোগা বাঁকা হেসে বললেন, 'বাজে কোথা বলবেন না, বাজে কোথা বলবেন না! মার্ডার কোরে লাইনকা উপ্পর দিয়ে হেড লিয়ে গেছে, তো ব্লাড গিয়েছে! এহি উও ব্লাড

আছে। ঝামেলা মাত করিয়ে।' তারপর ফের আমাকে মধ্যস্থ করলেন। 'আপনি বলুন তো মোশা! ইয়ে অ্যাকসিডেন্ট আছে?'

আমি কিছু বলার আগেই বঙ্কুবাবু বললেন, 'কাম টু দা পয়েন্ট অব ল পাণ্ডেজি! রেলের মাটিতে বডি আর হেড। কাজেই মার্ডার হলেও এর রেসপন্সিবিলিটি রেল-পুলিশের কি না?'

নিলুবাবু বেটন তুলে আমাকে বললেন, 'আপনিই বলুন! কমনসেন্স থেকে বলুন!'

পুলিশকে আমার বড্ড ভয়। আমতা-আমতা করে বললুম, 'আজ্ঞে, তা...'

পাণ্ডেজি আমাকে থামিয়ে দিয়ে গর্জালেন, 'কভি নেহি। রেলবে মে কুছু হোলে উই আর রেসপন্সিবল ফর দ্যাট। ইয়ে আউটসাইট মার্ডার আছে। আপনারা বডি লিয়ে যান।'

বলে উনি খইনির ডিবে বের করলেন। বগলে বেটন।

বঙ্কুবাবু এবার নিলুবাবুর দিকে তাকালেন। 'মি. রক্ষিত! আপনি কী বলেন?'

নিলুবাবু বললেন, 'আমি আইন বুঝি। পাণ্ডেজির আইনের ব্যাখ্যা আমি মানি না।'

পাণ্ডেজি খইনি ডলতে ডলতে বললেন, 'হামি ভি আইন জানে! আপকা ইলাকামে হেড। আপ উঠাকে লে যাইয়ে। ধাড়ামোশাকা ইলাকামে বডি। উনহি বডি উঠাকে লে যাইয়ে। ব্যাস!'

বলে উনি খইনিতে থাপ্পড় মারলেন। নিলুবাবু ফুঁসে উঠলেন। 'মুণ্ডু নিয়ে গিয়ে কড়মড়িয়ে খাব? আমি রাক্ষস না খোক্কস মশাই?'

বঙ্কুবাবুও আরও খাপ্পা হয়ে বললেন, 'আর আমি বডি নিয়ে গিয়ে ঝোল রেঁধে খাব? বলেছেন ভালো!'

পাণ্ডেজি খইনি জিভের তলায় গুঁজে বললেন, 'তব হম লে যাকে খায়েগা, ক্যা? আ জি, হামি ভেজেটারিয়ান আছে। হাঃ হাঃ হাঃ!'

ওঁর হাসিতে বঙ্কুবাবু-নিলুবাবু আরও চটে গিয়ে একগলায় বললেন, 'ডোন্ট জোক!'

ততক্ষণে দু-পাশ থেকে একজন-দু-জন করে লোক এসে এখানে ভিড় করেছে। মাতব্বরগোছের একজন বললেন, 'কী খামোকা তর্কাতর্কি করছেন স্যার? শিগগির বডি মর্গে পাঠান। পচে গন্ধ ছুটবে যে!'

আর একজন বললেন, 'বডি শনাক্ত করা দরকার। চেনা যাচ্ছে না। ধড়-মুণ্ডু এখনই এক করা উচিত।'

বঙ্কুবাবু বাঁকা হেসে বললেন, 'মি. রক্ষিতকে বলুন! মুণ্ডু হালকা জিনিস! বডি ভারী জিনিস!'

নিলুবাবু বললেন, 'আইনের পথে আসুন! মুণ্ডু পড়ে আছে রেলের জায়গায়। পাণ্ডেজি মুণ্ডু নিয়ে এসে বডিতে লাগান!'

পাণ্ডেজি বললেন, 'সিয়ারাম! সিয়ারাম! রেলের জায়গা তো কী হইয়েছে? আগাড়ি কাম হল, আইডিন্টিফিকেশন! মোশাইরা দেখুন, কোন ইলাকার আদমি আছে। হেড দেখনেসে মালুম হোগা!'

ওধারের মাতব্বর নাদুবাবু বললেন, 'আমাদের এরিয়ার কেউ হলে চিনতে পারতুম। ওধারের এরিয়ার কেউ হবে!'

আমাদের এরিয়ার মাতব্বর হাঁদুবাবু হাত নেড়ে বললেন, 'আমাদের নয়! আমাদের নয়! হেড বডি দুই-ই দেখলুম। ওধারেরেই।'

নাদুবাবু চটে গেলেন। 'নৌ! নেভার! আপনাদের এরিয়ার লোক।'

হাঁদুবাবু তেড়ে গেলেন। 'বাজে কথা বললেন না, বাজে কথা বলবেন না। আমাদের এরিয়ার লোক আমি চিনি না?'

আমি মধ্যস্থতা করে বললুম, 'বাইরের লোক হতে পারে। কিন্তু এখনই বডি মর্গে পাঠিয়ে তদন্ত করা দরকার। আপনারা দারোগাবাবুদের বলুন।'

নাদুবাবু-হাঁদুবাবু দারোগাবাবুদের বললেন, 'আর দেরি নয় স্যারেরা!'

স্যারগণও একগলায় বললেন, 'আইন ইজ আইন!'

নাদুবাবু বললেন, 'আইন মানে? বডি পড়ে থাকবে? পচে ভুট হবে? আর আপনারা আইনের তক্ক করবেন?'

এবার হাঁদুবাবুও তাঁকে সায় দিয়ে বললেন, 'পচা বডি থেকে রোগ ছড়াবে। মহামারি হবে। মাইন্ড দ্যাট!'

বঙ্কুবাবু বললেন, 'আহা! বুঝলেন না মশাই? খুন যদি ওপারে হয়ে থাকে, তার তদন্তের ভার মি. রক্ষিতের।'

নিলুবাবু বললেন, 'আগে তা প্রমাণ করুন। কমনসেন্স বলছে, বডি যেখানে পড়ে আছে, সেখানেই খুন হয়েছে। মুণ্ডুটা নিয়ে গিয়ে ওপারে ফেলেছে! অতএব তদন্তের দায়িত্ব আপনার। মুণ্ডু হালকা জিনিস। বয়ে নিয়ে যাওয়া সোজা।'

বঙ্কুবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাত্তেরি! খুন তো রেলের জায়গায় হয়েছে। অতএব...'

পাণ্ডেজির গোঁফ কাঁপতে লাগল। বললেন, 'রেলের এরিয়ায় খুন হইয়েছে, তার পরমান? এভিডেন্স? বাহারমে খুন হো শকতা!'

বঙ্কুবাবু-নিলুবাবু এবার একগলায় বললেন, 'ধড়-মুণ্ডু রেলের জায়গায়। কাজেই রেল-পুলিশই প্রমাণ করুক, বাইরে খুন হয়েছে!'

এইবার তিন দারোগাবাবুর মধ্যে হাঁকডাক বেড়ে গেল। তিন পক্ষের তিনটি পুলিশ বাহিনী পজিশন নিল, যেন এখনই যুদ্ধ বেধে যাবে। তিন দারোগাবাবু বাংলা ও হিন্দি ছেড়ে এবার যাচ্ছেতাই ইংরেজি বলতে শুরু করলেন। আইনের ধারার, নম্বর উল্লেখ করতে করতে...

'ইউ শাট আপ!'

'ইউ-উ শাট আপ!'

'ইউ-উ-উ শা-আ-ট আপ!'

এইসব বলতে বলতে তিন জনেই রিভলবার বের করলেন। কনস্টেবলরা বন্দুক তাক করল। লোকেরা আতঙ্কে পড়ি-কি-মরি করে পালাতে শুরু করল। আমি এক লাফে রেললাইনের ধারে একটা ভাঙাচোরা ওয়াগনের আড়ালে গা-ঢাকা দিলুম।

সেইসময় জোরে হুইসল দিতে দিতে একটা ট্রেন এসে পড়ল। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করলুম। ট্রেনটা অসম্ভব সময় নিয়ে চলে গেল। তারপর চোখ খুললুম।

আশা করেছিলুম একগাদা বডি রেললাইনে পড়ে থাকবে। কিন্তু নাঃ, তেমন কিছু দেখা গেল না। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' করে তিনটি বাহিনী রেললাইনের দু-ধারে নিরাপদে অবস্থান করছে। মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে রেল-পুলিশ এপারের পুলিশ ওপারের পুলিশ। বঙ্কুবাবু-নিলুবাবু-পাণ্ডেজিও একত্র।

নাদুবাবু-হাঁদুবাবুকে আবিষ্কার করলুম, ওয়াগনটার ভেতরে বসে ঠক ঠক করে কাঁপছেন। দু-জনেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক-টা বডি পড়ল?'

বললুম, 'পড়েনি। বেরিয়ে আসুন। ভেতরে সাপ-টাপ থাকতে পারে।'

ওয়াগনের তলা ফুঁড়ে জঙ্গল গজিয়েছে। দু-জনেই ঝটপট বেরিয়ে এলেন।

দেখা গেল, আবার তিন দারোগার আইনের ঝগড়া গোড়া থেকে শুরু হয়েছে। ট্রেনটা এই গণ্ডগোল বাধিয়ে দিয়ে গেল হয়তো। চরম অবস্থাটা ধপাস করে নীচে পড়েছিল। আবার নীচে থেকে ওপরে উঠছে।

আবার নাদুবাবু-হাঁদুবাবু এগিয়ে গেলেন ওঁদের দিকে। পালিয়ে-যাওয়া লোকেরাও এক-পা দু-পা করে ফিরে আসতে থাকল।

আমি কিন্তু এবার সতর্ক। দৈবাৎ বন্দুকের লড়াই বেধে গেলে, 'ক্রস-ফায়ার'-এর মাঝখানে পড়ে আমিও বডি হয়ে যাব। বাপস!

উঁকি মেরে আইনের সূত্রপাত দেখছি, হঠাৎ পেছনে কার আঙুলের গুঁতো খেয়ে চমকে ঘুরে দাঁড়ালুম।

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত!

খিখি করে হেসে চাপা স্বরে বললেন, 'কী বুঝছেন?'

বললাম, 'সাংঘাতিক ব্যাপার!'

'সাংঘাতিক তো হবেই।' চন্দ্রকান্ত চোখ নাচিয়ে বললেন, 'কাল বিকেলে আপনাকে বললুম না?'

অমনি মনে পড়ে গেল। শিউরে উঠলুম। 'কী সর্বনাশ! এই আপনার এক্সপেরিমেন্ট? নরহত্যা? ছি ছি! এ আপনি কী করলেন? আপনি খুনি?'

বিজ্ঞানীপ্রবর আরও হেসে বললেন, 'ধুর মশাই! কিচ্ছু বোঝেন না। আসুন, সব প্রবলেম সলভ করে দিচ্ছি। সব জল হয়ে যাবে। বলেছিলুম না জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে বহু জটিল ব্যাপার জল হয়ে যায়?'

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে আমাদের এই মফসসল শহরের সবাই খাতির করেন। ওঁর অসাধারণ কীর্তিকলাপ কাগজে বেরোয়। তাঁকে দেখেই তিন দারোগাবাবু নড়ে উঠলেন। 'আসুন, আসুন!' বলে সসম্মানে অভ্যর্থনা করলেন। পাণ্ডেজি নমস্কার করে বললেন, 'চন্দরজি যোখোন আছেন, তোখোন সবকুছ ফয়সালা হোবে। আইয়ে, আইয়ে! আপনাকে হামরা জাজ বনাইয়ে দিই। আপনি সুবিচার কোরেন!'

চন্দ্রকান্ত কিছু বললেন না। শুধু মুচকি হেসে হনহন করে রেললাইনের ওপরে ঘাসজমিতে নেমে গেলেন। অবাক হয়ে দেখলুম, কাটামুণ্ডুটি উনি কুড়িয়ে নিয়ে আসছেন।

সবাই হাঁ করে দেখছে। বিজ্ঞানীপ্রবর এবার রেললাইনের এধারে গিয়ে মুণ্ডু-কাটা বডিটার কাছে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর এক অবাক কাণ্ড! এ কি স্বপ্ন না সত্যি?

পড়ে থাকা বডিটা সটান উঠে দাঁড়াল। দাঁত বের করে চারদিকে করজোড়ে নমস্কার করল। কী আশ্চর্য! এ যে দেখছি রামু ধোপা!

দারোগাবাবুত্রয়, নাদুবাবু-হাঁদুবাবু, পুলিশবাহিনী এবং বাকি সবাই হইহই করে দৌড়ে গেল। আমিও গেলুম। গিয়ে দেখি, মুণ্ডুটা চন্দ্রকান্তের হাতে। অথচ...

চন্দ্রকান্ত মুচকি হেসে বললেন, 'ম্যাজিক! সায়েন্স নয়, স্রেফ ম্যাজিক! রামুকে অনেক বলেকয়ে ডেডবডি সাজতে রাজি করিয়েছিলুম। ওর মাথার দিকটা ঢেকে নকল গলা বানিয়েছিলুম স্রেফ প্ল্যাস্টিকের। রামুর মাথাটা বডির চেয়ে ছোট্ট তো! দারুণ ফিট করেছিল প্ল্যাস্টিকের গলা! আর এই মুণ্ডুটাও প্ল্যাস্টিকের! খি-খি-খি।'

বঙ্কুবাবু-নিলুবাবু ফোঁস করে একসঙ্গে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'বাঁচা গেল!'

পাণ্ডেজি হাসতে হাসতে নেতিয়ে পড়লেন। 'চন্দরজি... হাঃ হাঃ হাঃ চন্দরজি...'

আমি বললুম, 'কিন্তু যদি ব্যাপারটা সত্যি হত?'

বিজ্ঞানীপ্রবর বললেন, 'শিক্ষা! একটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলুম। আইনকেও ঠেকে শিখতে হয়। বুঝলেন তো? ভবিষ্যতে এমন কিছু ঘটলে কক্ষনো আইন তুলবেন না। মানুষের জন্য আইন, না আইনের জন্য মানুষ? মানুষ বড়ো, না আইন বড়ো?'

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'মানুষ বড়ো! মানুষ বড়ো!'

টাক এবং ছড়ি রহস্য

কাকতালীয় যোগ

সেদিন সকালে আমার প্রাজ্ঞ বন্ধু স্বনামধন্য কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ডেরায় ঢুকে আমি অবাক। একটি ছোট্ট ডিমালো আয়না মুখের ওপর তুলে উনি নিজের বিশাল টাকটি খুঁটিয়ে দেখছেন। বললেন, 'এসো ডার্লিং। তোমার কথাই ভাবছিলুম।'

বললাম, 'টাকের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

'আছে।' কর্নেল আয়নাটি টেবিলে রেখে একটু হাসলেন। 'কারণ একটি বিজ্ঞাপন। যেটি তোমাদেরই দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় সম্প্রতি বেরিয়েছে। পড়ে দেখতে পার।'

উনি একটা বিজ্ঞাপনের কাটিং এগিয়ে দিলেন। পড়ে দেখি বেশ মজার একটা পদ্য।

টাক! টাক!! টাক!!!

ট্রাই ইয়োর লাক

যদি থাকে দাড়ি

সুফল তাড়াতাড়ি

ইন্দ্রোদ্ধার, দৈব চিকিৎসালয়

১১১/১পি খাঁদু মিস্তিরি লেন

কলকাতা-১৩

বি.দ্র.-আগে টাক পরীক্ষা করিয়ে তবে ভরতি। ২৪ ঘণ্টা সময় লাগবে। দরাদরি নিষিদ্ধ।

বললুম, 'ইন্দ্রোদ্ধারটা বোঝা যাচ্ছে না তো?'

কর্নেল বললেন, 'ইন্দ্র মানে কালো চুল। তাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে টাক পড়াকে ইন্দ্রলুপ্ত বলা হয়।'

‘কিন্তু হঠাৎ টাক নিয়ে আপনি চিন্তিত কেন? এতদিন তো টাককে জ্ঞানী ও দার্শনিকের লক্ষণ বলে খুব গালভরা বুলি আওড়েছেন। আজ আবার-‘

‘কাক!’ কর্নেল বিমর্ষমুখে বললেন। ‘কাকের অত্যাচারে, জয়ন্ত! টাকের সঙ্গে কাকেরও গূঢ় সম্পর্ক আছে।’

ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি আনছিল। কথাটা শুনে গম্ভীর মুখে বলল, ‘এতবার করে মনে পড়িয়ে দিই, ছাদে যাবার সময় কেপ পরে যান। বাবুমশাই তবু কথাটা কানে করবেন না। কাকের দোষটা কী?’

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে তাকালে ষষ্ঠী ট্রে রেখে কেটে পড়ল। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। ছাদের বাগানে গিয়ে আবার কাকের ঠোকর খেয়েছেন। তবে বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভালো। যত রাজ্যের বিদঘুটে গড়নের ক্যাকটাস, উদ্ভুট্টে সব অর্কিড আর দুর্লভ প্রজাপতির ঝোপঝাড়। পাশের বাড়ির গা-ঘেঁষে ওঠা বুড়ো নিম গাছটা সম্ভবত কলকাতার কাকদের রাজধানী। তাড়ানোর জন্যে একবার পটকা ছুড়ে নাকি মামলা বাধার উপক্রম হয়েছিল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, ‘ষষ্ঠী ঠিক বলেছে। আপনার টাককে কাকেরা পাকা বেল-টেল ভাবে। অবশ্য বেল পাকলে কাকের কী বলে একটা কথা চালু আছে।’

কর্নেল কফির সঙ্গে চুরুটও টানেন। জ্বেলে নিয়ে ধোঁয়ার ভেতর বললেন, ‘বেল কেন? তালের সঙ্গেও কাকের সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে একটা কথা চালু আছে।’

ঝটপট বললুম, ‘জানি। কাকতালীয় যোগ। কাক এসে তাল গাছে বসল, সেই মুহূর্তে একটা পাকা তাল খসে পড়ল। নিছক আকস্মিক যোগাযোগ। লোকে যদি ভাবে কাকের সঙ্গে তাল পড়ার সম্পর্ক আছে, তাহলে এটা বোকামি।’

‘ডার্লিং, প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে কাকতালীয় ন্যায় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে।’ কর্নেল সায় দেবার ভঙ্গিতে বললেন। ‘যাই হোক, বিজ্ঞাপনটা দেখা অবধি মন ঠিক করতে পারছি না। কী করি তুমিই বলো!’

‘যদি থাকে দাড়ি/সুফল তাড়াতাড়ি। আপনার দাড়ি আছে। অতএব ট্রাই ইয়োর লাক।’

‘তাহলে চলো! কফিটা শেষ করে এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।’

বেরিয়ে পড়া গেল না। কারণ কলিং বেল বাজল এবং আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই এক ভদ্রলোক আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঢুকে ধপাস করে সোফায় বসে পড়লেন। তারপর দু-হাতে মাথার চুল-কালো কোঁকড়া একরাশ চুল আঁকড়ে ধরে আর্তনাদের সুরে বলে উঠলেন, ‘ওঃ টাক। হায় রে টাক।’

কর্নেল হাঁ। আমিও হাঁ। তবে এটুকু বুঝলুম। এই হল কাকতালীয় যোগ। একেবারে হাতেনাতে আর কি।...

টাক নিয়ে দুর্বিপাক

গরম কফি খাইয়ে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ভদ্রলোককে শান্ত-সুস্থ করা হল। তাঁর নাম মুরারিমোহন ধাড়া। ষাটের ওধারে বয়স। ঢ্যাঙা, রোগা গড়ন। বেজায় লম্বা নাক। মুখে গোঁফ-দাড়ি নেই। তবে মাথার চুল দেখার মতো-উজ্জ্বল কালো, মাঝখানে সিঁথি। পরনে

ধুতি ও তাঁতের ছাইরঙা পাঞ্জাবি। পায়ে যেমন-তেমন একটি চটি। আর হাতে একটা ছড়ি। ছড়িটি কিন্তু সুন্দর।

মুরারিবাবু যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন দেখে গতকাল 'ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়ে' যান। একটা ঘিঞ্জি গলির ভিতর জরাজীর্ণ বাড়ি। কোনো ব্যবসায়ীর গুদাম বলে মনে হয়েছে। দোতলায় অ্যাজবেস্টসের ছাউনি দেওয়া ঘরের মাথায় নতুন সাইনবোর্ড ছিল। বেঁটে, হোঁতকা-মোটা, গোলগাল চেহারার ডাক্তারবাবুটি অবশ্য খুবই অমায়িক। উঁচু বেডে শুইয়ে মুরারিবাবুর টাক পরীক্ষা করে বলেন, 'ঠিক আছে। চলবে। তবে দাড়ি কামাতে হবে।' মুরারীবাবুর তাতে আপত্তি ছিল না। ডাক্তারবাবু নিজেই যত্ন করে দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে দেন। তারপর বলেন, 'চোখ বুজুন।' মুরারিবাবু চোখ বোজেন। এরপর কী হয়েছে তাঁর জানা নেই। একসময় চোখ খুলে দেখেন, ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই। উঠে বসেই সব মনে পড়ে। মাথায় হাত দিয়ে টের পান, টাক নেই, সারা মাথা চুলে ভরতি। খুশি হয়ে ডাক্তারবাবুকে ডাকাডাকি করেন। সাড়া না পেয়ে অবাক হন। ঘোরালো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন অগত্যা। এই হল রহস্যের প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্ব কিন্তু মারাত্মক। মুরারিবাবু কলকাতায় সবে এসেছেন। রেলে চাকরি করতেন। পাটনায় থাকার সময় রিটায়ার করেছেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতার লেক প্লেসে বহু টাকা সেলামি দিয়ে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলেন। দিন পাঁচেক আগে জিনিসপত্র নিয়ে উঠেছেন। একা মানুষ। স্বাবলম্বী। স্বপাক খান। গতকাল সন্ধ্যায় মাথার চুল গজানোর পর নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়ে দেখেন, অন্য কে একজন ঢুকে বসে আছে। কতকটা তাঁর মতোই চেহারা ও গড়ন। মাথায় টাক, মুখে দাড়িও আছে। মুরারিবাবুকে দেখে সে বলে, 'কাকে চাই?' মুরারিবাবু ভড়কে যান। তারপর হইচই বাধান। অন্যান্য ফ্ল্যাটের লোকেরা এসে পড়ে। তারা একবাক্যে রায় দেয়, এই কালো চুলের মুরারিবাবুকে তারা চেনে না। এমনকী ওপরতলা থেকে বাড়ির মালিক এসে পর্যন্ত শাসিয়ে বলেন, পুলিশ ডাকা হবে। বেগতিক দেখে মুরারিবাবু চলে আসেন। রাত্তিরটা হোটেলে কাটিয়ে এখন কর্নেলের শরণাপন্ন হয়েছেন। থানায় যাননি, তার কারণ তিনি এখন কীভাবে প্রমাণ করবেন যে তিনিই আসল মুরারিমোহন ধাড়া? কলকাতায় তাঁর আত্মীয়স্বজন দূরের কথা, চেনা লোকও নেই। থাকলেও কালো কোঁকড়া চুল গজিয়ে তাঁর চেহারাকে একেবারে বদলে দিয়েছে যে!

আর একটু রহস্য আছে। কর্নেলের কাছে আসার পথে 'ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়ে' গিয়েছিলেন, টাক পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তো বটেই, কিন্তু গিয়ে দেখেন, ঘরে তালা। সাইনবোর্ড নেই। খোঁজ করলে কেউ কিছু বলতে পারল না। কর্নেলের কীর্তিকাহিনি মুরারিবাবু খবরের কাগজে পড়েছেন। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা থেকেই তাঁর ঠিকানা জোগাড় করেছেন। এই দুর্বিপাক থেকে তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁকে উদ্ধার করতে পারবেন না বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

ছড়ি বদল পর্ব

ঘটনাটি শোনার পর গোয়েন্দাপ্রবর মন্তব্য করলেন, 'হুঁ, টাকের আমি, টাকের তুমি, টাক দিয়ে যায় চেনা।'

বললুম, ‘উহুঁ, গোঁফ। সুকুমার রায়ের ‘গোঁফচুরি’ পদ্যে আছে।’

কর্নেল হাসলেন। ‘যাই হোক, এক্ষেত্রে টাকচুরি নিয়েই সমস্যা বেধেছে।’ বলে মুরারিবাবুর দিকে তাকালেন। ‘মুরারিবাবু, সেলফ-আইডেন্টিটি ব্যাপারটা সত্যিই গুরুতর। আমিই যে আমি, আপনি মুরারিবাবুই যে মুরারিবাবু, কোনো কোনো সময়ে প্রমাণ করা কঠিন হয়। তবে এ জন্য আদালত আছে।’

মুরারিবাবু করুণ স্বরে বললেন, ‘আছে। আদালতে তো যেতেই হবে। রেলের কর্তারা এবং আমার কলিগরা আছেন। নানা জায়গায় আমার আত্মীয়স্বজন আছেন। টেলিগ্রাম-ট্রাংকল করে সবাইকে ডাকব। ব্যারিস্টারের কাছে যাব। সবই করব। কিন্তু সে তো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে সর্বনাশ হবার তা হতে চলেছে। কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বিজ্ঞাপন দিয়ে চক্রান্ত করে কেউ বা কারা আমার ফ্ল্যাটে ঢুকতে চেয়েছিল, এবং ঢুকে পড়েছে। কেন এ চক্রান্ত, কেন আমার ফ্ল্যাটে ঢুকেছে, সেটা নিয়েই আপাতত দুর্ভাবনা!’

‘কেন?’ কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। রহস্যের গন্ধটা এবার ঝাঁঝালো তো বটেই।

মুরারিবাবু চাপাস্বরে বললেন, ‘হিরে। একটা-দুটো নয়, তিন-তিনটে হিরে। দাম এ-বাজারে কমপক্ষে দেড় লাখ টাকা।’

কর্নেল নড়ে বসলেন। ‘কোথায় রেখেছেন হিরেগুলো?’

মুরারিবাবু তাঁর কালো রঙের ছড়িটা দেখিয়ে বললেন, ‘অবিকল এইরকম একটা ছড়ির ভেতরে। মাথাটায় প্যাঁচ আছে। সেজন্য ছড়িটা সব সময় হাতে রাখতুম। কাল বিজ্ঞাপনটা দেখেই তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে ছড়িটা নিতে ভুলে গিয়েছিলুম। বুঝলেন না? টাক পড়া অব্দি কলিগরা তো বটেই, যে দেখত ঠাট্টাতামাশা করত। বেজায় বিদঘুটে টাক কিনা। আপনার টাক অবশ্য মানানসই। তো-‘

কর্নেল ওঁর কথার ওপর বললেন, ‘এই ছড়িটা নতুন কিনেছেন, আসার পথে?’

‘ঠিক ধরেছেন। নিউ মার্কেটের ওখান থেকে কিনে আনলুম।’ মুরারিবাবু ছড়িটা এগিয়ে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, ‘ওরা হিরেগুলো খুঁজে হন্যে হচ্ছে। পাবে না। তবে বলা যায় না কিছু। যদি দৈবাৎ ছড়িটার বাঁট খুলে ফেলে-তার আগেই দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। আপনার হাতে ধরে বলছি কর্নেল স্যার! আপনি সব পারেন। কোনো ছুতো করে এই ছড়ি হাতে আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে আপনি আগে ঢুকুন। আলাপ জুড়ে দিন। তারপর আপনার এই অ্যাসিস্ট্যান্ট ভদ্রলোক গিয়ে কলিং বেল টিপবেন।’

কর্নেল একটু হেসে বললেন, ‘জয়ন্ত আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট নয়। খবরের কাগজের রিপোর্টার।’

মুরারিবাবু সঙ্গেসঙ্গে আমাকে নমস্কার করে বলল, ‘তাই বলুন! কাগজে কর্নেলের কীর্তিকলাপ তো আপনিই লেখেন। দারুণ আপনার লেখার হাত, মশাই!’ বলে ফের ফিসফিসিয়ে উঠলেন। ‘তাহলে তো আরও চান্স! রিপোর্টার যেতেই পারে ওখানে। কারণ একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। কে প্রকৃত মুরারিমোহন ধাড়া এই নিয়ে অন্তর্তদন্ত করা খুবই স্বাভাবিক। কর্নেল স্যার যাওয়ার মিনিট কতক পরে জয়ন্তবাবু যাবেন। জাল মুরারি তক্ক করবে দরজায় দাঁড়িয়ে। সেই ফাঁকে কর্নেল স্যার দেওয়ালের ব্র্যাকেটে-ঝোলানো ছড়িটা হাতিয়ে এই ছড়িটা রাখবেন। ব্যাটা টেরই পাবে না। বাকিটা সহজ।’

ছড়িটা কর্নেল নিলেন। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার চুল গজানোটা একটু দেখতে চাই।'

মুরারিবাবু মাথা বাড়িয়ে বললেন, 'আলবাত দেখবেন। দেখুন! মিরাকল বলা যায়।'

কর্নেল একটুখানি হেসেই বললেন, 'সত্যিই মিরাকল। ভেবেছিলুম, আঠা দিয়ে পরচুলা পরিয়েছে নাকি। তা নয়। প্রকৃত চুল। ঠিক আছে আপনি সন্ধ্যা ছ-টা নাগাদ আসুন।'

মুরারিবাবু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে কর্নেল বললেন, 'তুমি সম্ভবত কী জিজ্ঞেস করার জন্য উশখুশ করছিলে, ডার্লিং!'

উত্তেজনা নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বললুম, 'ছড়ি বদলানোটা রিস্কি হবে না? যদি দৈবাৎ-'

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, 'রিস্ক না নিলে রহস্য ভেদ করা তো সম্ভব হয় না ডার্লিং।'

'কখন বেরোবেন ভাবছেন?'

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে এবং অভ্যাসে সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'যাবার সময় তোমার আপিস হয়ে তোমাকে ডেকে নেবখন।'

হুঁকো বিষয়ক প্রবাদ

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার আপিসে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছি, কর্নেলের পাত্তা নেই। দুটোয় ফোন করলুম, ষষ্ঠী বলল, 'বাবামশাই তো লাঞ্চো খেয়েই বেইরেছেন।' তিনটে বাজল। চারটে বাজল। পাঁচটায় উদবিগ্ন হয়ে বেরিয়ে পড়ার আগে আবার ফোন করলুম, ষষ্ঠী ফোন ধরে বলল, 'বাবামশাই এই মাত্তর ফিরেছেন। ছাদে গেছেন! কেপ পরেই গেছেন। বুঝলেন না কাগুজে দাদাবাবু? কাক-কাক।' রাগে-অভিমানে ফোন রেখে ভাবলুম, 'এর অর্থ কী?' আমাকে নিয়ে বেরোনোর কথা। অথচ একা বেরিয়েছিলেন। হলটা কী?

যখন কর্নেলের তিন-তলার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছোলুম, তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। রাস্তায় যা জ্যাম। সটান ছাদে ওঁর 'প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ডে' চলে গেলুম। দেখলুম, একটা বিদঘুটে ক্যাকটাসের দিকে ঝুঁকে আছেন প্রকৃতিবিদ। মাথায় সত্যিই 'কেপ'। কাছে গিয়ে বললুম, 'আশ্চর্য মানুষ আপনি!'

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। মুচকি হেসে বললেন, 'আমার চেয়েও আশ্চর্য মানুষ বিস্তর আছে, ডার্লিং! চলো নীচে যাই। মুরারিবাবুর আসার সময় হয়েছে।'

'আপনি গিয়েছিলেন ওঁর ফ্ল্যাটে? কী দেখলেন? ছড়িটা বদলাতে পারলেন?'

'হুঁউ। আসলে জয়ন্ত, টাক ও দাড়ির সঙ্গে টাক ও দাড়ির বন্ধুত্ব খুব ঝটপট গড়ে ওঠে। এটা বরাবর দেখে আসছি।'

নীচের ড্রয়িং রুমে ঢুকে কর্নেল বাথরুমে গেলেন গার্ডেনিং-এর জোব্বা বদলে হাত ধুতে! শুনলুম গলা চড়িয়ে ষষ্ঠীকে কড়া কফির হুকুম জারি করেছেন। এই সময় কলিং

বেল বাজল। দরজা খুলে দিলুম। হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়লেন মুরারিমোহন ধাড়া। দম-আটকানো গলায় বললেন, 'গিয়েছিলেন? কাজ হয়েছে তো?'

কর্নেল পর্দা তুলে বললেন, 'বসুন, আসছি।' তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মুরারিবাবু সোফায় বসে উদবিগ্ন মুখে বললেন, 'আমার ঠাকুরদার কেনা হিরে, জয়ন্তবাবু! এক সায়েব দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল মাইনিং বিজনেসে। ঠাকুরদাকে মাত্র দেড় হাজারে বেচেছিল। তা সেসব কথা পরে বলবখন। বলুন, খবর কী? আমার হার্ট ধুকপুক করছে খালি।' বুকে হাত দিলেন মুরারিবাবু।

কর্নেল সেইরকম একটি ছড়ি হাতে ফিরে এলেন। মুরারিবাবু খপ করে সেটি প্রায় কেড়ে নিয়ে বাঁটের প্যাঁচ ঘোরাতে শুরু করলেন। খিখি হেসে বললেন, 'জ্যাম হয়ে গেছে প্যাঁচ। বহুকাল খোলা হয়নি কিনা।'

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন, 'আগে একটু কফি খান পাঁচুবাবু! তারপর কথা হবে।'

মুরারিবাবু চমকে উঠলেন। 'পাঁচুবাবু! ও কী বলছেন কর্নেল স্যার? আমার না-'

কর্নেল চোখ বুজেই বললেন, 'প্যাঁচ খুলবে না পাঁচুবাবু। কারণ ওটা আপনার কেনা সেই ছড়িটাই।'

মুরারিবাবু কিংবা পাঁচুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী অদ্ভুত রসিকতা!'

'রসিকতা আপনারও কম নয়, পাঁচুবাবু?' কর্নেল চোখ খুলে ফিক করে হাসলেন। 'আপনি আমার হাত দিয়ে আপনার মনিব মুরারিবাবুর হিরে চুরি করতে চেয়েছিলেন। একেই গ্রাম্য প্রবাদে বলে, অন্যের হাতে হুঁকো খাওয়া।'

'মুরারিবাবু' কিংবা 'পাঁচুবাবু' দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই পাশের ঘরের অন্য দরজার পর্দা তুলে এক পাঞ্জাবিপরা ভদ্রলোক বেরোলেন। ঢ্যাঙা, মাথায় টাক, মুখে দাড়ি। তিনি 'তবে রে ব্যাটা পেঁচো।' বলে গর্জন করে ঝাঁপ দিলেন এবং 'পাঁচুবাবু'র পাঞ্জাবির কলার খামচে ধরলেন। তারপর একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন এক পুলিশ অফিসার এবং দু-জন সেপাই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। আমি হাঁ। তক্ষুনি দলটা বেরিয়ে গেলে ঘুরে কর্নেলের দিকে তাকালুম। স্বপ্ন না, সত্যি?

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে শুরু করেছেন ফের। বললেন, 'হুঁ, একেই বলে পরের হাতে হুঁকো খাওয়া। মাঝখান থেকে পাঁচুবাবুর বিজ্ঞাপন-খরচটা গচ্চা গেল। লম্বা-চওড়া একটা গুলগপ্পও কাজে এল না। ডার্লিং তোমার অবশ্য একটা বড়ো লাভ হল। বড়োবাজারের শিশি-বোতলের কারবারি মুরারিমোহন ধাড়ার কর্মচারী পাঁচু বা পঞ্চানন্দকে নিয়ে কাগজে দারুণ খবর হবে।'...

ম্যাজিশিয়ান মামা

টুকাই তার বন্ধু কুট্টুসের কাছ থেকে একটা ভূতের গল্পের বই পড়তে নিয়েছিল। সারা বিকেল খেলার মাঠের শেষদিকটায় নিরিবিলি ঝিলের ধারে বসে বইটা যখন শেষ করে ফেল ল, তখন দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে। খেলুড়েরা কখন চলে গেছে খেলা শেষ করে। ঝিলের ঘাটে যে ধোপা কাপড় কেচে শুকোতে দিয়েছিল, সেও তার গাধাটার পিঠে কাপড়ের বোঁচকা চাপিয়ে চলে যাচ্ছে। টুকাইয়ের এবার গা ছমছম করছিল। সে উঠে পড়ল।

কুট্টুসের কাছে অনেক ভূতের গল্প বই আছে। টুকাই ভাবল, বইটা ফেরত দিয়ে আরেকটা চেয়ে নেবে। কিন্তু এসব বই পড়ে এই সন্ধ্যে বেলা বড্ড ভয় করে যে। কুট্টুসদের বাড়িটা আবার নিরালা জায়গায় শহরের একপাশে। পেছনে একটা কলকারখানাও আছে সায়েবি আমলের। কুট্টুস সায়েবভূতগুলোর কত গল্প না শুনিয়েছে।

দোনামনা করে টুকাই এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে খেলার মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছোল। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। লোকজন হাঁটাচলা করছে। টুকাইয়ের ভয়টা চলে গেল তাই দেখে। সে কুট্টুসদের বাড়ির দিকে চলতে থাকল।

কুট্টুসদের বাড়িটা পুরোনো হলেও বেশ সুন্দর। সামনে এক টুকরো ফুলবাগান আছে। গেটের মাথায় বুগানভিলিয়া ফুলের ঝাঁপি আছে। সন্ধ্যার দিকে কেমন একটা মিঠে গন্ধ মউমউ করে। কিন্তু বাড়ির সামনে গিয়েই টুকাই একটু অবাক হল।

বাড়িতে আলো জ্বলছে না। কুট্টুসরা নেই নাকি? টুকাই গেট দিয়ে উঁকি মেরে আস্তে ডাকল, 'কুট্টুস!' অমনি অন্ধকার বারান্দা থেকে কেউ ভারী গলায় বলে উঠল, 'কে রে?'

তাহলে বাড়িতে লোক আছে। গলাটাও যেন চেনা লাগছে। টুকাই বলল, 'আমি।'

'আমি? আমি কী হে? আমি কি কারুর নাম হয় নাকি?'

টুকাই ধমক খেয়ে হকচকিয়ে বলল, 'আমি টুকাই।'

'টুকাই? সে আবার কে? কই, সামনে এসো তো দেখি।'

টুকাই ভয়ে ভয়ে গেট খুলে ভেতরে গেল। রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট থেকে তেরচা হয়ে ফিকে হলদে রঙের একটুখানি আলো বারান্দায় গিয়ে পড়েছে। সেই আলোয় টুকাই এতক্ষণে দেখতে পেল। কুট্টুসের সেই ম্যাজিশিয়ান মামা বেতের চেয়ারে বসে আছেন।

অমনি সে খুশিতে নেচে উঠল। ভয়টুকু আর রইল না। কুট্টুসের এই মামা নামকরা ম্যাজিশিয়ান। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন এখানে। কুট্টুসের বন্ধুদের কত মজার ম্যাজিক দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেন।

কিন্তু কুট্টুস তো বলেনি ওর ম্যাজিশিয়ান মামা এসেছেন। টুকাই মনে মনে কুট্টুসের ওপর রেগে গেল। ম্যাজিশিয়ান মামা ফের ধমক দিয়ে বললেন, 'কী হল? অমন করে দাঁড়িয়ে আছ যে বড়ো? কাছে এসো, দেখি তুমি কে?'

টুকাই হাসিমুখে বারান্দায় উঠে বলল, 'আমি টুকাই ম্যাজিশিয়ান মামা। আমাকে চিনতে পারছেন না।' তারপর ঢিপ করে পায়ে একটা প্রণামও করে ফেলল।

ম্যাজিশিয়ান মামা খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে। তুমি টুকাই।'

টুকাই বলল, 'কখন এলেন ম্যাজিশিয়ান মামা। কুট্টুস তো আমাকে বলেনি।'

'বলবার সময় পেলে তো!' ম্যাজিশিয়ান মামা বললেন। 'আমিও এলুম, ওরাও বাড়িসুদ্ধ গেল কোন বিয়েবাড়ি নেমন্তন্ন খেতে। তাই একা একা পাহারা দিচ্ছি। তা তোমায় পেয়ে ভালোই হল। কথাবার্তা বলা যাবে।'

টুকাই বলল, 'ম্যাজিক দেখাতে হবে কিন্তু ম্যাজিশিয়ান মামা।'

'দেখাব, দেখাব।' ম্যাজিশিয়ান মামা একটু হাসলেন, 'তোমাদের ম্যাজিক দেখিয়ে বড়ো আনন্দ পাই, কিন্তু দেখছ তো, বাড়িতে কারেন্ট নেই-লোড শেডিং। ওই দেখো, সব বাড়িতে আছে। শুধু এই বাড়িটা বাদে। ভারি অদ্ভুত মনে হচ্ছে না তোমার?'

টুকাই দেখে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ ম্যাজিশিয়ান মামা।'

'তা যাক গে। অন্ধকারই ভালো। বুঝলে? অন্ধকার আমি খুব পছন্দ করি।'

টুকাই সায় দিয়ে বলল, 'আমিও পছন্দ করি ম্যাজিশিয়ান মামা।'

'কর বুঝি? তুমি খুব ভালো ছেলে।' ম্যাজিশিয়ান মামা বললেন, 'তা তোমার হাতে ওটা কী?'

'একটা ভূতের গল্পের বই, ম্যাজিশিয়ান মামা। কুট্টুসকে ফেরত দিতে এলুম।'

'অ্যাঁ! ভূতের গল্পের বই? কই, দেখি, দেখি।'

ম্যাজিশিয়ান মামা বইটা টুকাইয়ের হাত থেকে টেনে নিলেন। টুকাই খিটখিট করে হেসে বলল, 'অন্ধকারে দেখবেন কী করে?'

'আমি অন্ধকারেও দেখতে পাই। বুঝলে তো?'

টুকাই ভাবল, ম্যাজিশিয়ানরা কত অদ্ভুত অদ্ভুত ম্যাজিক দেখাতে পারেন। তা ছাড়া চোখে রুমাল বেঁধে থটরিডিংয়ের খেলাও যখন দেখান, তখন অন্ধকারে বই পড়াটা কী এমন কঠিন ওঁদের পক্ষে। সে অবাক চোখে ম্যাজিশিয়ান মামার দিকে তাকিয়ে রইল। এও একটা দারুণ ম্যাজিক বই কী।

ম্যাজিশিয়ান মামার চেহারা এতক্ষণে আবছা দেখা যাচ্ছে। প্রকাণ্ড মানুষ। মাথায় টাক আছে। পরনে সেই বরাবর দেখা পাঞ্জাবির ওপর নকশাদার কালো জহরকোট। সেই

পেল্লায় গোঁফ। উনি বইটা উলটে পালটে দেখে বললেন, ‘ভূতের ছবিও আছে দেখছি। কিন্তু দেখো বাপু, যে এই ছবি এঁকেছে, সে কস্মিনকালে ভূত কেন, ভূতের টিকিও দেখেনি। ছ্যাঁ-ছ্যাঁ। ভূতের চেহারা কি এমন বিচ্ছিরি হয়?’

টুকাই হাসতে হাসতে বলল, ‘কেমন হয় ম্যাজিশিয়ান মামা?’

‘দেখবে নাকি?’

‘হুঁউ।’

‘কিন্তু এই অন্ধকারে দেখবে কী করে? একটা মোমবাতি চাই যে। চলো, ভেতরে গিয়ে খুঁজে দেখি।’

ঘরে ঢুকে ম্যাজিশিয়ান মামা অন্ধকারে খোঁজাখুঁজি করে মোমবাতি জোগাড় করলেন। এটা ওঁর পক্ষে কঠিন কাজ নয়, টুকাই জানে। সে বলল, ‘ম্যাজিশিয়ান মামা, দেশলাইকাঠি ছাড়া মোম জ্বালাতে পারেন না ম্যাজিক দিয়ে?’

‘পারি বই কী!’ বলে ম্যাজিশিয়ান মামা ফুঁ দিলেন। আর অবাক কাণ্ড, মোমবাতি দপ করে জ্বলে উঠল। টুকাই খুব হাসতে লাগল মজা পেয়ে। ম্যাজিশিয়ান মামার কত মজার মজার ম্যাজিক সে দেখেছে, এমন ম্যাজিক দেখেনি তো।

টুকাই মনে করিয়ে দিল, ‘ম্যাজিশিয়ান মামা, এবার ভূতের চেহারা দেখব।’

‘ভূতের চেহারা-তোমায় বললুম না? কখনো এই বইয়ে আঁকা ছবির মতো বিচ্ছিরি হয় না।’

‘কেমন হয়?’

‘এই তোমার-আমার মতো।’

টুকাই মাথা নেড়ে বলল, ‘উঁহু। তাহলে সবাই ভূতকে ভয় করে কেন শুনি?’

‘বোকারাই ভয় পায়।’ মোমবাতিটা টেবিলে আটকে দিয়ে ম্যাজিশিয়ান মামা চেয়ারে বসলেন। ‘তুমি যদি বোকা হও, তুমিও ভয় পাবে। তুমি কি বোকা?’

টুকাই, আরও জোরে মাথা নাড়ল।

ম্যাজিশিয়ান মামা বললেন, ‘ভূতের চেহারা ভদ্রলোকের মতো। যেমন ধরো আমি...’

কথা কেড়ে টুকাই হাসতে হাসতে বলল, ‘যাঃ। আপনি কি ভূত নাকি?’

‘কে বলতে পারে? এই যে নিঝুম সন্ধ্যা বেলা তুমি এই অন্ধকার বাড়িটাতে এলে-কে বলতে পারে তুমি ভূত না মানুষ!’

টুকাই হেসে অস্থির হল। ম্যাজিশিয়ান মামা খুব আমুদে মানুষ, তা সে বরাবর দেখছে। বলল, ‘আচ্ছা ম্যাজিশিয়ান মামা ভূতরা নাকি ম্যাজিক দেখাতে পারে?’

‘হুঁউ। খুব পারে। তবে ভূতের ম্যাজিক তো। আরও অদ্ভুত। দেখবে নাকি?’ বলে ম্যাজিশিয়ান মামা প্যাঁচালো নাট থেকে বল্টু খোলার মতো নিজের প্রকাণ্ড মাথাটা কয়েক পাক ঘুরিয়ে দিলেন। অমনি তাঁর মুণ্ডু বাঁই বাঁই করে ঘুরতে থাকল। টুকাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল। এতক্ষণে তার গা ছমছম করতে লাগল। চোখদুটো বড়ো হয়ে উঠল। এ যে বড়ো সাংঘাতিক ম্যাজিক।

ম্যাজিশিয়ান মামার মুগুর ঘূর্ণি থামল। তখন চোখ নাচিয়ে বললেন, 'কেমন ম্যাজিক? এর নাম হল মুগুনৃত্য। এবার এইটে দেখ। এ অমার নতুন ম্যাজিক। এর নাম হল জ্বলন্ত মোমবাতি ভক্ষণ।'

এবার উনি আস্ত মোমবাতি মুখে পুরে কোঁত করে গিলে ফেললেন। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। টুকাই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ম্যাজিশিয়ান মামা! ম্যাজিশিয়ান মামা!'

মোমবাতিটা হঠাৎ ম্যাজিশিয়ান মামার টাক ফুঁড়ে বেরোল। ঘর আলোকিত হল আগের মতো। উনি ফিক করে হেসে বললেন, 'ভয় পেয়েছিলে বুঝি? এটা তত কিছু ভয়ের না। তবে এই তিন নম্বর খেলাটা।...'

টুকাই চেঁচিয়ে উঠল ফের, 'আর না। আর না।' তারপর সটান দরজা দিয়ে ছিটকে বেরোল এবং বারান্দা থেকে এক লাফে নেমে গেট পেরিয়ে দৌড় দৌড় দৌড়! এ কখনো ম্যাজিক নয়। এ যে বড্ড ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা! মুগুনৃত্য, জ্বলন্ত মোমবাতি ভক্ষণ। তারপর তিন নম্বরটা হয়তো টুকাই ভক্ষণ। বাপস রে!...

পরদিন স্কুলে কুট্টুসের সঙ্গে দেখা। কুট্টুসকে কিছু বলার আগেই সে চোখ পাকিয়ে তেড়ে এল। 'টুকাই! আর কখনো তোকে বই দেব না। অমন করে জানলা গলিয়ে বইটা ছুড়ে ফেলে এসেছিস। মলাট ছিঁড়ে কী অবস্থা হয়েছে দেখেছিস?'

টুকাই কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'যাঃ! ছুড়ে দিয়ে আসব কেন? বইটা তো তোর ম্যাজিশিয়ান মামাকে দিয়ে এসেছিলুম। উনিই দেখতে নিলেন যে!'

কুট্টুস আরও খাপ্পা হয়ে বলল, 'চালাকির জায়গা পাসনি? ওঁকে কোথায় পেলি? ম্যাজিশিয়ান মামা তো আমেরিকায় ম্যাজিক দেখাতে গেছেন। এখন সানফ্রান্সিসকোতে ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। কাগজে ছবি বেরিয়েছে না?'

টুকাই ঢোক গিলে বলল, 'তাহলে কাল সন্ধ্যে বেলা তোদের বাড়ি কাকে দেখলুম রে!'

কুট্টুস ঘুসি পাকিয়ে বলল, 'ফের চালাকি?'

টুকাই চুপচাপ কেটে পড়ল তার সামনে থেকে। হুঁ, খুব বেঁচে গেছে কাল সন্ধ্যে বেলা। তবে দোষ তো কুট্টুসদেরই। কবরখানার কাছে বাড়ি খালি রেখে অমন করে নেমন্তন্ন খেতে যায় কেউ?

পুপুর জঙ্গল

এইটুকু মেয়ে পুপু। বয়স মোটে সাড়ে তিন বছর। এই বয়সেই সে কত কী জানে। কত কী বোঝে। সে এখন সব কথা ঠিক ঠিক বলতে পারে। শুধু কয়েকটা কথা বাদে।

যেমন কিনা সে বাবাকে বলে 'তাতা', ঠাকুরদাকে 'দাদা'। আর ঠাকুরমাকে 'মামমাম'। আসলে মুখে কথা ফোটার সময় এগুলো সে নিজেই বানিয়ে নিয়েছিল। এখনও তা বদলায়নি। অথবা সে বদলাতে চায় না। এগুলো তার নিজের পছন্দ কিনা।

আরও কিছু কথা আছে। সে বেড়ালকে এখনও 'ম্যাঁও' বলে। বেড়াল কথাটা বলতে পারে না তা তো নয়। তবু কিছুতেই বলবে না। কারণ এর পেছনে একটা মজার ঘটনা আছে। তখন তার দেড় বছর বয়স। একটা বেড়াল চুপিচুপি তার দুধের গেলাসে মুখ দিয়েছে। আর পুপু করেছে কী, তার লেজ ধরে দিয়েছে হ্যাঁচকা টান। আচমকা লেজে টান পড়ায় বেড়ালটা ভয় পেয়ে ম্যাঁও করে চেঁচিয়ে উঠে জানলা গলিয়ে উধাও। পুপুর তখন সে কী হাসি।

মাস তিনেক আগে পুপু বাবা-মায়ের সাথে চাঁদিপুরে সাগর দেখতে গিয়েছিল। ফিরে আসার পর তার দাদা বলেছিলেন, 'পুপু, কী দেখে এলে?'

পুপু সাগর না বলে দুটো হাত উঁচু থেকে নীচুতে তারপর নীচু থেকে উঁচুতে নাচের মতো দুলিয়ে সুর করে বলল, 'ঢে-এ-এ-উ-উ!'

তারপর থেকে সে কিছুতেই 'সাগর' বলবে না। বলবে 'ঢেউ'। এ তার নিজের ভাষা।

গত মাসে তার বাবা-মা তাকে নিয়ে ওড়িশার একটা গহন বনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে বাংলোর চৌকিদারের মুখে 'জঙ্গল' শুনে শুনে সে কিছুতেই বন বলে না।

তার ঠাকুরমা ব্যালকনিতে অনেকগুলো টবে নানারকম গাছ লাগিয়েছেন। পুপুর এখন সেটাই 'জঙ্গল'। সেখানে সে আপন মনে বাঘ-ভালুকের সাথে কথা বলে। বাঘকে সে বলে 'হালুমবাবা', ভালুককে বলে 'ভললুদাদা'।

পুপু ক্যারিকেচারেও পাকা। তাকে যদি বলা হয়, 'তোমার দাদু কী করেন, একবার দেখাও তো পুপু'। তখন সে তার মায়ের চশমা নিয়ে চোখে পরবে। বিছানায় শুয়ে হাঁটু ভাঁজ করে একটা বই খুলে পড়ার ভান করবে আর মাঝে মাঝে নস্যির কৌটো থেকে নস্যি নেওয়ার ভঙ্গি করবে। সত্যি কৌটো নেই। ওটা আছে, তা ধরে নিতে হবে, এই যা।

পুপু তার দাদার ক্যারিকেচার আরও ভালো করে। চেয়ারে বসে একটা কাগজে ডটপেন দিয়ে হিজিবিজি কাটবে। আর মাঝে মাঝে বাঁ হাতের দুই আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা সিগারেট টানার ভঙ্গি করবে। দাদা তাকে যদি বলেন, 'ও কী পুপু! হিজিবিজি কেন? বইয়ে যা পড়ছ তা লেখো।' পুপু বলবে, 'দাদা তুমি তো হিজিবিজিবিজি লেখ।'

'পুপু, আমি তো গপপো লিখি।'

'ভ্যাট! তুমি গপপো লিখতে পারোই না। হিজিবিজিবিজি লেখ শুধু।'...

সেদিন পুপুর দাদু এসেছিলেন। তাঁর একটা ছোট্ট কুকুর আছে। সারা গায়ে সাদা ঝাঁকড়া লোম। তার নাম জিমি। পুপুর সাথে তার খুব ভাব। আগে পুপু তাকে 'ঘো ঘো' বলত। বোধ করি জিমির অনুরোধেই সে তাকে আর ওই নামে ডাকে না। জিমি বলেই ডাকে।

তো বিকেলে পুপুর দাদু বেড়াতে বেরোলেন। জিমি চলল পেছনে। পুপুও চলল দাদুর আঙুল ধরে। দাদু বললেন, 'পুপু, তুমি আমার কাঁধে চেপে এসো। অতদূর হাঁটতে পারবে না।'

পুপু বলল, 'না দাদু, আমি হাঁটি হাঁটি করে যাব।' কিছুদূর হাঁটি হাঁটির পর একটা খেলার মাঠ। মাঠের শেষে একটা ঝিল। ঝিলের চার পাড়ে ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়। পুপুর দাদু একটা বেঞ্চে বসে পড়লেন। পুপু আর জিমি ছুটোছুটি করতে থাকল। পুপুর দাদু বললেন, 'পুপু, জঙ্গলের দিকে যেন যেয়ো না।'

পুপু হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল, তাই তো। তার এত কাছে একটা জঙ্গল। পুপুর দাদু যখন নস্যি নিচ্ছেন সেই সুযোগে পুপু দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। জিমি কি না গিয়ে পারে? সেও তার পেছনে চলল।

কিছুদূর গিয়ে জিমি 'ঘোঃ ঘোঃ' করে উঠল। পুপু বলল, 'কী রে জিমি?'

জিমি পেছনের দুই পা মুড়ে বসে চাপা গলায় আবার বলল, 'ঘোঃ ঘোঃ?'

সেই সময় পুপু দেখল সামনে একটা গাছের ডালে বসে আছে একটা হনুমান। এতদিন হনুমান সে বইয়ের ছবিতে দেখেছে। সত্যিকারের হনুমান দেখে সে একটু ভয়ে ভয়ে বলে উঠল, 'ও হনুমানকাকু! তুমি ওখানে কী করছ?'

হনুমানটা কাকু বলা শুনে খুশি হয়ে নীচের ডালে নেমে এল। হাসিমুখে বলল, 'তোমার নাম কী?'

'আমার নাম পুপু।'

'ওগো মেয়ে! আমার লেজটা একটু টেনে দেবে? এক বুড়িমার বাড়ির বাগানে জামরুল খেতে ঢুকেছিলুম। লেজে ঢিল মারল বুড়িমা। একটা জায়গা যেন কুঁকড়ে গেছে। একটু টেনে দাও না সোনা!'

পুপু তার লেজ ধরে কয়েকবার টান দিল। হনুমান বলল, 'আঃ! আরাম পেয়েছি। শোনো পুপু। আর এখানে থেকো না। একটা ভালুক আসছে দেখেছিলুম। সে বড়ো বদমেজাজি।' বলেই হনুমান পেছনে তাকিয়ে থেকে লাফ দিয়ে পাশের গাছে ঝুলে পড়ল। তারপর উধাও হয়ে গেল।

পুপু ডাকল, 'জিমি, জিমি।'

কিন্তু জিমিকে দেখতে পেল না। পুপু বলল, 'তুই এত ভিতু জানতুম না তো!'

এই সময় একটা ভালুক এসে থমকে দাঁড়াল। বলল, 'ওটা কে বটে?'

পুপু ভয়ে ভয়ে বলল, 'ভললুদাদা! আমি পুপু।'

ভালুক বলল, 'এখানে একা তুমি কী করছ?'

পুপু বলল, 'আমি জঙ্গলে বেড়াতে এসেছি। আমার সাথে জিমি এসেছে।'

'জিমি আবার কে?'

'ঘোঃ ঘোঃ,' পুপু হাসল। 'জিমি খুব ভিতু তাই সে লুকিয়ে আছে। সে তোমাকে ভয় পেয়েছে যে।'

ভালুক বলল, 'তুমি তাকে ঘোঃ ঘোঃ বলছ কেন?'

'সে সব সময় ঘোঃ ঘোঃ করে যে!'

ভালুক হেসে কুটি কুটি হল। 'তাই বলো! জিমি তোমার কুকুরের নাম।'

'আমার নয়, দাদুর।'

'তোমার দাদু কোথায়?'

'খেলার মাঠে নস্যি দিয়ে হ্যাঁচচো হ্যাঁচচো করছে।'

'নস্যি? আমারও নস্যি নিতে ভালো লাগে। তবে কী জানো? খেলার মাঠে আমি গেলেই রামু ধোপার গাধাটা খুব চেঁচামেচি করবে। সে এক ঝামেলা।'

'গাধা কী ভললুদাদা?'

'গাধা দেখোনি তুমি? ওই দেখো। বেঁটে, সাদা, চারঠেঙে ওই যে ঝিলের জলে দুই ঠ্যাং ডুবিয়ে ঘাস ছিঁড়ে খাবে বলে টানাটানি করছে। রামু ধোপা অনেক কাপড় কেচে শুকোতে দিয়েছে। একটু পরে শুকনো কাপড় গুছিয়ে রামু তার গাধার পিঠে চাপিয়ে বাড়ি যাবে।'

পুপু ঝোপের ফাঁক দিয়ে গাধা দেখে অবাক হল। তারপর হঠাৎ যেই গাধাটা এদিকে তাকাল, অমনি সে ভালুকে দেখে বিকট চেঁচিয়ে উঠল। ভালুকটা চেঁচানি শুনে বলে উঠল, 'ওরে বাবা! আমি পালাই। রামুকে গাধাটা ডাকছে। রামু এখনই লাঠিসোটা নিয়ে তাড়া করবে।'

ভালুকটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেল। পুপু ডাকছিল, 'ভললুদাদা! ভললুদাদা! তুমি পালিয়ে যেয়ো না।'

এবার জিমি বেরিয়ে এসে বলল, 'ঘোঃ ঘোঃ, চলে এসো পুপু। আমার ভয় করছে।'

পুপু ধমক দিল, 'দূর ভিতু কোথাকার! জঙ্গলে বেড়াতে এসে ভয় পেলে চলে? আর আমরা আরও দূরে যাই। জঙ্গলে কত মজা।'

কিছুদূর এগিয়ে পুপুর কানে ভেসে এল 'খর খর ঘষ ঘষ' আওয়াজ। সে থমকে দাঁড়াল। একটা গাছের গুঁড়িতে একটা বাঘ দুই পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের দুই পায়ের নখ ঘষছে। পুপু বলে উঠল, 'ও হালুমবাবা! তুমি অমন করছ কেন?'

বাঘটা তার দিকে না তাকিয়ে চার পায়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আরে! এটা আবার কে?'

পুপু বলল, 'আমি পুপু।'

বাঘটা অবাক হয়ে বলল, ‘তুমি এইটুকু মেয়ে। তোমার এত সাহস? জানো আমি তোমাকে গপ করে গিলে খেতে পারি।’

পুপু হেসে উঠল। ‘খেয়েই দেখো না হালুমবাবা! তোমার পেটে ঢুকে আমি কাতুকুতু দেব। আমার কাতুকুতু কেমন তা তো তুমি জানো না।’ বলে সে দু-হাত বাড়াল।

‘কাতুকুতু! কাতুকুতু!’

বাঘ বলল, ‘থাক ও শুনেই কাতুকুতু লাগছে। তোমাকে খেয়ে আমার পেটও ভরবে না। খামোকা কাতুকুতু লাগবে। একবার একটা শেয়ালছানা খেয়ে কী বিপদে না পড়েছিলুম। সে পেটের ভেতরে চার ঠ্যাং ছুড়ে আমাকে খুব ভুগিয়েছিল।’

পুপু জিমিকে খুঁজছিল। জিমি আবার লুকিয়েছে। পুপু ডাকল, ‘জিমি! জিমি!’

বাঘ হাসল। ‘হুঁ। ওই ঝোপের ভেতর এতটুকু সাদা কী লুকিয়ে আছে। আরে! ওটা তো একটা কুকুর। তোমার চেয়ে ছোট্ট। নাহ। ওটাকে খেলেও বিপদ। সেই শেয়ালছানা খাওয়ার মতো ভুগতে হবে। অথচ আমার খুব খিদে পেয়েছে যে। ও পুপু, কী খাই বলো তো?’

পুপু বলল, ‘হালুমবাবা, তুমি রামুর গাধাটাকে খাবে?’

বাঘ আঁতকে উঠে বলল, ‘ওরে বাবা গাধা খাওয়ারও কী বিপদ তুমি তো জানো না।’

‘কী বিপদ শুনি?’

‘আমাকে দেখলেই কে জানে কেন গাধাটা গান গাইতে শুরু করবে। সেই গান শুনলে আমার তো হাসি পাবে। যে হাসির চোটে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হবে। পেটে সুড়সুড় করবে। খুব হাসি পেলে তোমারও কি পেট সুড়সুড় করে না?’

পুপু বলল, ‘ঠিক বলেছ। সেদিন আমার নিনিপিসি একটা ছড়া বলছিল, ছড়াটা শুনে আমার এত পেট সুড়সুড় করছিল। বলেছিলুম, ও নিনিপিসি! আর বোলো না গো বোলো না।’

‘ছড়াটা কী শুনি?’

‘পেটমোটা কোলাব্যাং

জুতো পরা দুই ঠ্যাং

হাতে নিয়ে লণ্ঠন

চলে গেল লন্ডন...’

বাঘ হাসির চোটে গড়াগড়ি খেতে খেতে বলল, ‘ও পুপু! আর বোলো না গো! বোলো না!’

পুপু বলল, ‘আরও আছে হালুমবাবা।’

‘ওরে বাবা আরও শুনলে আমি হাসির চোটে মারা পড়ব।’ বলে বাঘটা লাফ দিতে দিতে পালিয়ে গেল।

এবার জিমি বেরিয়ে এসে বলল, ‘ঘোঃ ঘোঃ! খুব হয়েছে এবার এসো।’

পুপু বলল, ‘তুই যা, আমি যাব না।’

এই সময় একটা রংচঙে ফুলের ঝোপ দেখতে পেল পুপু। সে ঝোপ থেকে ফুল তুলতে হাত বাড়িয়েছে, অমনি একটা ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে বেরিয়ে এল। তার পরনে রঙিন শাড়ি, পিঠে দুটো রঙিন ঝলমলে ডানা, সে বলল, 'এই মেয়ে! ফুল তুলতে নেই। ফুল শুধু দেখতে হয়!'

পুপু বলল, 'বাঃ রে! আমি মামমামের ফুলগাছ থেকে ফুল তুলি। মামমাম তো বকে না, তুমি বকছ কেন? কে তুমি?'

'আমি ফুলপরি। তুমি কে?'

'আমি পুপু।'

ফুলপরি বলল, 'ভ্যাট! পুপু কি একটা নাম হল? এটা তো ডাকনাম। তোমার আসল নামটা কী?'

পুপু বলল, 'বিষ্টিকণা।'

ফুলপরি হাসল, 'উঁহু, বলো বৃষ্টিকণা।'

'বৃ-ষ-টি-ক-ণা। হয়েছে তো এবার?'

'তুমি বৃষ্টি দেখেছ তো?'

'হুঁউ। আকাশ থেকে ঝরে। বৃষ্টি দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।'

'আকাশে মেঘ ভাসে। মেঘ থেকে ঝরে। তুমি সেই বৃষ্টির ফোঁটা। বুঝলে তো?'

পুপু বলল, 'ভ্যাট, তাহলে আমি পুপু। তুমি ফুলপরিদি! তুমি কোথায় থাকো গো?'

ফুলপরি বলল, 'আমি ফুলের ভেতর থাকি। কখনো মনের খুশিতে উড়তে উড়তে মেঘের দেশে চলে যাই।'

'ফুলপরিদি! তুমি আমাকে মেঘের দেশে নিয়ে চলো না।'

'যাবে তুমি, তাহলে এসো। তোমাকে কাঁধে চাপিয়ে উড়ে যাব।'

পুপু পেছনে জিমিকে দেখিয়ে বলল, 'জিমিকেও নিয়ে যেতে হবে ফুলপরিদি।'

জিমি বলল, 'ঘোঃ ঘোঃ, যাব না, আমি কিছুতেই যাব না।'

পুপু বকে দিল তাকে, 'তাহলে তুই অপেক্ষা করে থাক, আমি ফুলপরিদির কাঁধে চেপে মেঘের দেশে যাই। তুই চলে যাসনে যেন।'

ফুলপুরি পুপুকে দু-হাতে তুলে কাঁধে চাপাল। তারপর উড়ে চলল মেঘের দেশে।

জিমি ওদিকে তাকিয়ে বারবার বলতে থাকল। 'ঘোঃ ঘোঃ ঘোঃ ঘোঃ।'

এদিকে হয়েছে কী পুপুর দাদু পুপুকে খুঁজছেন। তিনিও হঠাৎ জিমির ডাক শুনতে পেলেন। তিনি ছুটে আসছেন দেখে জিমি তাঁকে পুপুর খবর দিতে গেল। তিনি বললেন, 'পুপু কোথায় রে?'

জিমি আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল, 'ঘোঃ ঘোঃ!'

পুপুর দাদু হঠাৎ দেখলেন পুপু একটি ফুলের ঝোপের পাশে মাটিতে শুয়ে আছে।

তিনি তাকে তখনই কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'সারা দুপুর তুমি ঘুমোও না। কাউকে ঘুমোতেও দাও না। এখন জঙ্গলে হাঁটি হাঁটি করে কেমন ঘুম পেয়েছে।'

পুপুর সত্যি ঘুম পেয়েছিল। ফুলপরির কাঁধে মেঘের দেশে যেতে যেতে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দাদু বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মাথার কাছে জিমি অবাক হয়ে বসে রইল...

এবার আসল কথাটা খুলে বলি। ওপরে যে গপপোটা লিখেছি, তা পুপুর মুখে শোনা।

সকালে আমি লিখতে বসেছি, সেই সময় পুপু চোখ মুছতে মুছতে এসে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিলাম, 'পুপু, কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?'

পুপু বলেছিল, 'কাল বিকেলে আমি জঙ্গলে গিয়েছিলুম। জঙ্গলে কী কী হয়েছিল, সব বললুম। তাই শুনে সবাই আমাকে বলল, পুপুটা কী মিথ্যুক। বলো তো দাদা আমি কি মিথ্যুক?'

বলেছিলুম, 'না না। তুমি মিথ্যুক নও। তবে এবার আমায় বলো তো জঙ্গলে কী কী হয়েছিল?'

পুপু সবটা বলার পর বলেছিল, 'দাদা তুমি হিজিবিজিবিজি না লিখে আমার এই গপপোটা লেখো।'

কী আর করা যাবে? পুপু যা যা বলেছিল অবিকল তাই তাই লিখে দিলুম।

উপন্যাস

সবুজ সংকেত

১

‘সবুজ আলোটাকে তাড়া করাই ভুল হয়েছিল,’ বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত ঘুম ঘুম স্বরে বললেন। চাউনি উদাস। ‘আসলে আমার উদ্দেশ্য ছিল ওটাকে ফোটনকণায় পরিণত করে হিমায়িত মিথেনে বন্দি রাখা।’

হালদার ডিটেকটিভ এজেন্সির সুখ্যাত গোয়েন্দা কৃতান্তকুমার হালদার, ওরফে কে.কে. হালদার, ওরফে আমাদের হালদারমশাই হাঁ করে তাকিয়ে কথা শুনছিলেন। এবার মুচকি হেসে বললেন, ‘চোর-ডাকাতকে তাড়া করার মতো আলো-টালোকেও তাড়া করা যায় বুঝি?’

চন্দ্রকান্ত শুধু বললেন, ‘যায়।’

‘হাজতে ঢোকানোর মতো বন্দি রাখাও যায়?’ হালদারমশাইয়ের ঠোঁটের কোনায় চলে গেল হাসিটা। আলপিনের ডগার মতো আটকে রইল।

যেন খোঁচা খেয়েই চটে গেলেন বিজ্ঞানী। বললেন, ‘ও আপনি বুঝবেন না।’

হালদারমশাইও চটলেন। পুলিশের চাকরি করে মাথাটি সাংঘাতিক সাংঘাতিক অভিজ্ঞতায় ঠাসা। রিটায়ার করার পর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। রহস্যের লেজের ডগাটুকু দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাই বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের বাড়ির পেছনের বাগানে রাতবিরেতে সবুজ আলোর ঝলকানি দেখা যায় শুনে তাক করেই ছিলেন। কিন্তু তারপর ‘তাড়া করা’ এবং ‘বন্দি রাখা’র কথা শুনে টের পেলেন, কেসটিতে তাঁকে পাত্তা দেওয়া হবে না। তেতো মুখে একটিপ নস্যি নিয়ে হাঁচার ভঙ্গিতে বললেন, ‘হিং টিং ছট!’

বেগতিক দেখে বললুম, ‘আপনি বলুন চন্দ্রকান্তবাবু! ব্যাপারটা সত্যি ইন্টারেস্টিং!’

যাঁর ঘরে আমাদের এই সমাবেশ, তিনি একটু তফাতে ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সাদা দাড়িতে আঙুলের চিরুনি টানছিলেন। চওড়া টাকে সকালের

রোদ্দুরের প্রতিফলন। এতক্ষণে মুখ খুললেন, ‘হালদারমশাই! আশা করি, প্রাচীন ভারতের যুদ্ধাস্ত্র নাগপাশের কথা শুনেছেন?’

হালদারমশাই একটু অবাক হলেন, ‘শুনেছি কর্নেল স্যার! আমার ধারণা, নাগপাশ আসলে ল্যাসো, স্রেফ দড়ির ফাঁস!’

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত নড়ে বসলেন। ‘লেসার বিমকেও নাগপাশের মতো ব্যবহার করা যায়,’ উত্তেজিতভাবে বললেন তিনি। ‘আমার উদ্দেশ্য ছিল লেসার নাগপাশে সবুজ আলোটাকে আটকে ফেলা। তারপর যা বলছিলুম, হিমায়িত মিথেনে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে!’

হালদারমশাই ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘বেশ। তাতে হতটা কী?’

‘পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টির প্রথম পর্যায়টা জানা যেত,’ চন্দ্রকান্ত জোর গলায় বললেন। ‘আমার একটা রে-ডিটেক্টর আছে। তা থেকে বুঝতে পেরেছি, সবুজ আলোটা আসছে ইউরেনাসের ন-টা বলয়ের কোনো একটা থেকেই। মার্কিন মহাকাশযান ভয়েজার থেকে পাঠানো ডাটা ডিকোড করে জানা গেছে, বলয়গুলোতে সৌর নীহারিকার মতোই মহাজাগতিক ধুলো আর হিমায়িত মিথেনকণিকা ঠাসা। তো...’

‘হিং টিং ছট!’ হালদারমশাই খিখি করে হেসে উঠলেন।

কথায় বাধা পড়ায় বিজ্ঞানী খাপ্পা হয়ে বললেন, ‘এ আপনি বুঝবেন না।’

না-এর টংকার বিচলিত করতে পারল না গোয়েন্দাকে। ‘আলবাত বুঝি,’ বলে তিনিও বাতটাকে থাপ্পড় মারলেন চটাস করে।

বিব্রত মুখে গৃহকর্তার দিকে তাকালুম। তিনি সাধুবাবার মতো চুপ। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত এবার মারমুখী হয়ে ঝুঁকে এলেন গোয়েন্দা কে.কে. হালদারের দিকে। গরম শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, ‘কী বোঝেন?’

‘কোনো দুষ্টচক্রের কারসাজি,’ চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে জবাব দিলেন গোয়েন্দা। ‘কেসটা আমাকে দিন। সাত দিনের মধ্যে সবুজ আলোর রহস্য ফর্দাফাঁই করে দেব।’

বিজ্ঞানী রণে ভঙ্গ দিলেন, বলা যায়। ফিক করে হেসে ফেললেন এবার, ‘ঠিক আছে। দিলুম। কিন্তু সাবধান, উলটে নিজেই বিপদে পড়লে আমাকে যেন দায়ী করবেন না।’

হালদারমশাই তাঁর জরাজীর্ণ ব্রিফকেস খুলে বললেন, ‘আমার এজেন্সির ফর্ম আছে। লিখিত চুক্তি হবে। আমি মশাই মুখের কথায় আজকাল আর কেস নিই না।’ দু-কপি ফর্ম বের করে চন্দ্রকান্তের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, ‘বাই দা বাই, একটা কথা। আপনার বাগান কর্নেল স্যারের মতো শূন্যোদ্যান নয় তো?’

‘শূন্যোদ্যান মানে?’

‘সেই যে ব্যাবিলনে ছিল, কোন এক নেবুকাটা রাজার যেন?’

হাসি চেপে বললুম, ‘নেবুকাটা রাজার নয়, হালদারমশাই! সম্রাট নেবুকাডনাজারের!’

গৃহকর্তা কর্নেল নীলাদ্রি সরকার শুধরে দিলেন, ‘নামটা নেবুকাডনাজার বা নেবুচাডনাজার বলে পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে যে-সম্রাট ব্যাবিলনে তথাকথিত শূন্যোদ্যান তৈরি করেছিলেন, তাঁর প্রকৃত নাম ছিল নেবুকাদরাগগার। যাই হোক, আমার ছাদের ‘প্ল্যান্ট-ওয়ার্ল্ড’কে হালদারমশাই শূন্যোদ্যান বলেছেন। খাসা! অপূর্ব! এবার থেকে আমার প্ল্যান্ট-ওয়ার্ল্ডকে ‘শূন্যোদ্যান’ বলব।’

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত ফর্মে চোখ বুলোচ্ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, 'ছাদে বাগান করেছেন? বলেন কী! তাহলে তো মহাজাগতিক রশ্মি উদ্ভিদকোষে কীসব প্রতিক্রিয়া ঘটায়, সেটা পরীক্ষা করতে হলে আপনার বাগানই আদর্শ। এত উঁচু বাড়ির ছাদে বাগান! পৃথিবীর গা থেকে যেসব ধুলোময়লা সব সময় ছড়াচ্ছে, তা আপনার বাগানের নাগাল পাবে না। কই, চলুন তো দেখি!'

চন্দ্রকান্ত উৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গের কিটব্যাগটা কাঁধে ঝোলালেন। বুঝলুম, ওর ভেতর বিস্তর যন্ত্রপাতি আছে। হালদারমশাইয়ের ফর্ম দুটো পড়ে রইল সোফায়। কর্নেলের মুখে প্রশংসা শুনে তাঁর মুখে যে প্রশান্ত হাসি ফুটেছিল, মিলিয়ে যেতে দেখলুম। ফর্ম দুটো কুড়িয়ে নিয়ে গুম হয়ে আমাদের অনুসরণ করলেন গোয়েন্দা কে.কে. হালদার।

কর্নেলের বাড়ির বিশাল ছাদের এই বাগানে আমি কদাচিৎ আসি। এখানে এলেই কেমন গা ছমছম করে। রাজ্যের যত কিম্ভূতকিমাকার ক্যাকটাস আর রং-বেরঙের অর্কিডের এক আজব জঙ্গল। অর্কিড কোনো জ্যান্ত গাছকে আশ্রয় করেই বাঁচে। কিন্তু আমার বিজ্ঞ বন্ধু কী রাসায়নিক প্রকৌশলে শুকনো কাঠের মাচানে বা ক্রসে অর্কিডগুলো আটকে রেখেছেন এবং তারা দিব্যি বেঁচে আছে। ফুলও ফোটাচ্ছে। সকাল-বিকেল উনি এসে পরিচর্যা করেন। হরেক লোশনের শিশি, তুলো, মসৃণ কাঠির বান্ডিল চিলেকোঠার ভেতর দেওয়ালের তাকে রাখা আছে। কিন্তু এ যেন কোনো অজানা গ্রহ। বেঁটে, চ্যাপটা, গোল, বাঁকাচোরা উদ্ভুটে উদ্ভিদের দল সেই গ্রহের প্রাণী। মানুষ দেখলেই তাদের শরীরের অসংখ্য অদৃশ্য চোখে চক্রান্তের ঝিলিক ফুটে ওঠে।

আমারই মনের ভুল হয়তো। আসলে হয়েছে কী, এদের প্রত্যেকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি করে সাংঘাতিক রহস্যময় ঘটনার স্মৃতি। কোথাও কোনো অদ্ভুত চুরিচামারি, কোথাও কোনো রহস্যময় খুনখারাপি অথবা কোনো দুর্গম জায়গায় রোমাঞ্চকর অভিযানের সাক্ষী এরা। পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে ওইসব সূত্রে এদের সংগ্রহ করে এনেছেন প্রকৃতিবিদ।

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'দুর্দান্ত জ্যান্ত ল্যাবরেটরি!' তারপর কিটব্যাগ থেকে একটা টর্চের গড়নের যন্ত্র বের করে কয়েক পা এগোতেই একটা দুষ্টু ক্যাকটাসের পাল্লায় পড়লেন। অবস্থা শোচনীয় হল। দুষ্টু ক্যাকটাসটা তাঁর ঝাঁকড়া চুল টেনে শার্ট খিমচে অস্থির করে ফেলল।

কর্নেল তাঁকে উদ্ধার করে বললেন, 'এর পাল্লায় পড়ে রোজ একটা করে কাকের মৃত্যু হয়। তবু বোকা কাকগুলোর শিক্ষা হয় না।' পুবের বিরাট নিম গাছটিতে কাকের ঝাঁকের দিকে তাকালেন, মুখে বিরক্তির ছাপ।

চন্দ্রকান্ত এবার সর্তক হলেন। যন্ত্রটা বাগিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে খুটখাট শব্দে সুইচ টেপাটিপি করতে থাকলেন। হালদারমশাই সামনেকার একটা লম্বাটে উদ্ভিদ দেখে তারিফ করলেন, 'অসাধারণ! ও মাসে বেগমপুর হর্টিকালচারাল সোসাইটিতে একটা চুরির তদন্তে গিয়ে ঠিক এমনি একটা ক্যাকটাস দেখেছিলুম।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'দেখতে ক্যাকটাসের মতো হলেও এটা ক্যাকটাস নয়, হালদারমশাই! ওটা দাইদিয়েরিয়া গাছ। মালাগাসি থেকে এনেছিলুম।'

'মালাগাসি?' হালদারমশাইও হাসলেন, 'মালাগাছি বলুন। নদিয়ার করিমপুর থানায় যখন ছিলুম, তখন এক সায়েব পাদরি মালাগাছিতে মিশন খুলেছিলেন। তিনিও আপনার মতো মালাগাসি বলতেন।'

‘হালদারমশাই, মালাগাসি মাদাগাস্কার দ্বীপের অপর নাম,’ হালদারমশাইকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে কর্নেল একটা অষ্টাবক্র ক্যাকটাসের পাশে হাঁটু মুড়ে বসলেন। বুকপকেট থেকে একটা আতশকাচ বের করে ওটার গায়ে রেখে খুব মন দিয়ে কিছু দেখতে থাকলেন।

ঠিক এই সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

আকাশপথে মার্বেলের গুটির সাইজের কী একটা জিনিস এসে কর্নেলের টুপিতে ঠকাস করে পড়ল। পড়াটা উনি টের পেলেন। কারণ সঙ্গেসঙ্গে টুপিসুদ্ধু মাথাটা জোরে নাড়া দিলেন। ফলে খুদে জিনিসটা ছিটকে এসে আমার পায়ের কাছে পড়ল। তারপর চমকে উঠলুম।

ছোট্ট একটা নুড়ি। তাতে লাল সুতো দিয়ে একটা ভাঁজকরা চিরকুট জড়ানো আছে।

দেখামাত্র চারদিকে উঁচু ও নীচু বাড়িগুলোর ছাদ লক্ষ করলুম। সন্দেহজনক কেউ কোথাও নেই। শুধু দক্ষিণের চার-তলা বাড়ির ছাদের কার্নিশে একটা বেড়াল ঘাপটি মেরে বসে নীচে কিছু দেখছে। বেড়ালের পক্ষে এ-কাজ সম্ভব নয়। পুবের নিম গাছের কাকগুলোকেও সন্দেহ করা চলত। কাকেরা বড্ড ঝগড়াটে এবং কোনো জিনিস ঠোঁটে কামড়ে নিয়ে যেতে যেতেও ঝগড়া করতে ছাড়ে না, তাই ঠোঁট থেকে জিনিসটা পড়ে যাওয়াও সম্ভব। কিন্তু তাই বলে চিরকুট-বাঁধা নুড়ি? যদ্দূর জানি, কাকেরা অন্তত পায়রাদের মতো ডাকপিয়োনের কাজ করে না।

ডাকপিয়োনের কথা মাথায় আসার কারণ ওই চিরকুটটা। হালদারমশাই ঢ্যাঙা মানুষ। দু-হাঁটুতে দুটো হাত রেখে ঝুঁকে কর্নেলের কাজকারবার দেখছেন। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে চন্দ্রকান্ত একটা অর্কিডের গায়ে তাঁর যন্ত্রটা ঠেকিয়ে অনবরত খুটখুট শব্দে সুইচ টেপাটিপি করছেন। চিরকুট-বাঁধা নুড়িটা কাঁপা কাঁপা হাতে কুড়িয়ে নিলুম। তারপর সুতো ছিঁড়ে ভাঁজ খুলে দেখতেই বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। আঁকা-বাঁকা হরফে লাল কালিতে লেখা আছে: ‘কো-২-কে চুরি করেছি। নাক গলিয়ো না। টাক ফুটো হয়ে যাবে। ইতি-

হাহা হুহু’

দম-আটকানো গলায় চেঁচিয়ে উঠলুম, ‘কর্নেল! কর্নেল! সর্বনাশ!’

হালদারমশাই ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো সিধে হয়ে গেলেন। চন্দ্রকান্তও ঘুরে দাঁড়ালেন। দু-জনেই একগলায় বলে উঠলেন, ‘ক্কী, ক্কী?’

‘কিডন্যাপিং!’ হেঁপো রুগির মতো বললুম, ‘কারা কাউকে কিডন্যাপ করে এইমাত্র চিঠিটা ছুড়ে মেরেছে।’

হালদারমশাই এক লাফে এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে চিরকুটটা ছিনিয়ে নিলেন। তারপর তিনি এই মাদাগাস্কারি দাইদিয়েরিয়ার মতোই খেঁকুটে এবং টানটান হয়ে গেলেন। চন্দ্রকান্ত হন্তদন্ত হয়ে এসে উঁকি মেরে চিরকুটটা পড়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি বেঁটে মানুষ। তাই যন্ত্রের শরণাপন্ন হলেন। কিটব্যাগ থেকে একটা পেরিস্কোপ-জাতীয় যন্ত্র বের করে ফেললেন।

কর্নেল একেবারে নিশ্চল। বিদঘুটে ক্যাকটাসটার গায়ে আতশকাচ রেখে হাঁটু মুড়ে তেমনি বসে আছেন। কাছে গিয়ে বললুম, ‘ব্যাপারটা দেখবেন তো? একটা সাংঘাতিক ঘটনা...’

‘হাহা-হুহু!’

চমকে উঠে বললুম, 'আপনি জানেন, জানতেন?'

ধুরন্ধর প্রকৃতিবিদ আর মুখ খুললেন না। ঘুরে দেখি, হালদারমশাই চোখের ইশারায় আমাকে কাছে ডাকছেন। এদিকে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত আপনমনে বিড়বিড় করছেন, 'কো প্লাস কো, ইজ ইকোয়াল টু কো-টু... হা প্লাস হা, ইজ ইকোয়াল টু হা-টু... হু প্লাস হু, ইজ ইকোয়াল টু হু-টু... জয়ন্তবাবু!' কাছে পেয়ে উত্তেজিতভাবে আমার হাত চেপে ধরলেন। 'বাড়ি ফিরে কম্পিউটারে ফিড করাতে হবে। দেখব, কী বেরিয়ে আসে। আপাতত ম্যাথামেটিক্যালি ব্যাপারটা কী দাঁড়ায় দেখুন।' তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে যন্ত্র দুটো কিটব্যাগে ঢুকিয়ে নোটবই, ডট পেন বের করলেন। খসখস করে লিখে ফেললেন:

(KO+KO)%(HA+HA)+(HOO+HOO)=2KO%(2HA+2HOO).

অঙ্ককষা চলতে থাকল। এবার হালদারমশাই আমাকে টানলেন। একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'একটা ব্যাপার লক্ষ করার আছে।'

'কী বলুন তো?'

হালদারমশাই আমার কানের কাছে মুখ আনলেন। 'কর্নেল স্যার ব্যাপারটা জানেন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।'

'আরও একটা ব্যাপার আছে।'

'কী?'

'ছাদে ওঠার সময় কর্নেল স্যার টুপি পরে এসেছেন।'

'ছাদে অবশ্য টুপি পরেই আসেন। ষষ্ঠীর কাছে শুনেছি, কাকের ঠোকর খাবার ভয়েই...'

আমার কথার ওপর খিক করে হাসলেন হালদারমশাই। 'এই নুড়িটাতে চিঠিটা বাঁধা ছিল, তাই না? আপনি বলার আগেই আমার চোখে পড়েছে। এখন বুঝুন, কনের্ল স্যার টুপি পরে না এলে ওঁর টাক রক্তারক্তি হত কি না?'

'তা তো হতই,' সায় দিয়ে কর্নেলের দিকে তাকালুম। এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

হালদারমশাই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'খুব রহস্যজনক ঘটনা, বুঝলেন?' বলেই উত্তরের পুরোনো দোতলা একটা বনেদি বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। দৃষ্টিতে ঘোরতর সন্দিগ্ধতা।

জিজ্ঞেস করলুম, 'কী দেখছেন অমন করে?'

'একটা বা দুটো মুখোশপরা মুখ, এইমাত্র সরে গেল জানলা থেকে। ব্যাপারটা এখনই দেখা দরকার।'

গোয়েন্দা কে.কে. হালদার দ্রুত সিঁড়ির দিকে ধাবিত হলেন।

কর্নেল ডাকলেন, 'হালদারমশাই! কোথায় চললেন অমন করে?'

'আসছি। এখনই আসছি কর্নেল স্যার!'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'হাহা-হুহু রহস্যের কিনারা করার আগে একবার মহাভারত পড়ে নেওয়ার দরকার ছিল।'

হালদারমশাই এমন অদ্ভুত কথায় বোধকরি ক্ষুব্ধ হলেন। মুখ গোমড়া করে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তও তাঁকে অনুসরণ করলেন। বুঝলুম, এখনই বাড়ি ফিরে কম্পিউটারের সামনে বসবেন। কর্নেল তাঁকে ডাকলেন না।

'কী জয়ন্ত?' কর্নেল এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। 'তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?'

'ব্যাপারটা সাংঘাতিক। আপনি সব জানেন, তাও বোঝা যাচ্ছে। অথচ আপনি নির্বিকার।'

কর্নেল আমাকে নিয়ে চললেন সিঁড়ির দিকে, 'চলো! কড়া কফি খাওয়া যাক। কফি হিমায়িত ঘিলু চাঙ্গা করে, ডার্লিং!'

নীচের সেই বিশাল জাদুঘর-সদৃশ ড্রয়িংরুমে ফিরে সোফায় ধপাস করে বসে পড়লুম। কর্নেল টুপি খুলে ইজিচেয়ারে বসে হাঁক দিলেন, 'ষষ্ঠী!'

ষষ্ঠী ওপাশের দরজার পর্দা তুলে করুণ মুখে বলল, 'বাবামশাই! একটু আগে আবার সেই ভূতপেরেতের ফোং এয়েছিল।'

কর্নেল চোখ পাকিয়ে বললেন, 'কোনো কথা নয়। কফি! ঝটপট!'

ষষ্ঠী দ্রুত অদৃশ্য হল ভেতর দিকে। বললুম, 'ষষ্ঠী ফোনের কথা বলল! খুলে বলবেন এবার?'

'তোমার কাগজের খবর হবার মতো কিছু নয়,' কর্নেল হাসলেন, 'অন্তত এই হাহা-হুহু ব্যাপারটা তো নয়ই। তবে আমার ভয় হচ্ছে, হালদারমশাই কোনো বিপদে না পড়েন।'

'উনি উত্তরের একটা দোতলা বাড়ির জানলায় মুখোশপরা কাদের দেখেছেন।'

কর্নেল কোনো কথা বললেন না। চোখ বুজে দোল খেতে থাকলেন। এই সময় ফোন বাজল। অনিচ্ছা অনিচ্ছা করে ফোনটা তুলে সাড়া দিতেই ভূতুড়ে গলায় হুমকি ভেসে এল, 'এই বুড়ো ঘুঘু! সাবধান! হাহা-হুহু কোকোকে চুরি করেছে।' তারপর ফোন রাখার শব্দ হল। আতঙ্কে আমার শরীর হিম হয়ে গেল। অবশ হাতে ফোনটা রেখে দিলুম। তারপর ব্যস্তভাবে বললুম, 'কর্নেল! কর্নেল! কিডন্যাপাররা শাসাল! বলল, হাহা-হুহু কোকোকে চুরি করেছে।'

ষষ্ঠী চুপচাপ কফির ট্রে রেখে গেল। কর্নেল বললেন, 'কফি খেয়ে নাও ডার্লিং! এখনই বেরোনো দরকার। হালদারমশাইয়ের জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে।' :

কফিটা ছিল যেমন গরম, তেমনি কড়া। কষ্ট করে গিলে উঠে দাঁড়ালুম। আমার তর সইছিল না। কর্নেল টুপি পরে একটা ছড়ি হাতে বেরোলেন। দাঁতে কামড়ানো জ্বলন্ত চুরুট। বাড়ির নীচে ডান দিকে একটা গলি। সেই গলি-রাস্তায় আন্দাজ একশো মিটার এগিয়ে ফের ডাইনে ঘুরে একটা গেট দেখতে পেলুম। গেটের মাথায় ঘন বোগেনভিলিয়ার ঝাঁপি। কোনো দরোয়ান নেই। ভেতরে লনে একফালি রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। দু-ধারে একসময় বাগিচা ছিল। এখন জঙ্গল হয়ে আছে। বনেদি বড়োলোকের বাড়ি বলে মনে হল। কিন্তু এখন সেই সচ্ছলতার চেকনাইটি খয়ে গেছে। দেওয়ালে, কার্নিশে ফাটল আর শ্যাওলা। নিষ্ঠুর চেহারার উদ্ভিদ হিংসুটে শেকড় ঢুকিয়ে বাড়িটাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। গেটের পাশে ভাঙাচোরা ফলকে কী লেখা, পড়তে পারলুম না। তাহলে এই বাড়িটারই জানলায় কি হালদারমশাই মুখোশপরা কাদের দেখতে পেয়েছিলেন কর্নেলের শূন্যোদ্যান থেকে? কর্নেল গেট খুলে বললেন, 'হুঁ, হালদারমশাই বিপন্ন।'

আঁতকে উঠে বললুম, 'কেন এ-কথা বলছেন?'

'অ্যালসেশিয়ানটার সাড়াশব্দ নেই, তাই।'

'বুঝলুম না।'

'একটু পরেই বুঝবে।'

এইসময় লনের রাস্তায় কোন আমলের বিছানো নুড়িগুলোর দিকে চোখ গেল। বললুম, কর্নেল! এই বাড়ির ছাদ থেকেই চিরকুটটা নুড়িতে বেঁধে গুলতিতে করে ছোড়া হয়েছিল। কারণ, এই দেখুন, একই সাইজের কত নুড়ি।'

কর্নেল কানে নিলেন না। গাড়িবারান্দার তলায় গিয়ে ডাকলেন, 'গোবিন্দ আছ নাকি? ও গোবিন্দ!'

সাড়া না পেয়ে কড়া নাড়তে থাকলেন। সিঁড়ির ওপর প্রকাণ্ড দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। একটু পরে দরজা খুলে গেল। এক মারকুটে চেহারার ভদ্রলোক, পরনে যেমন-তেমন প্যান্ট-শার্ট, কিন্তু জুলফি-গোঁফ আর চিবুকে দেখনসই দাড়ি, কর্নেলকে দেখে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আসুন কর্নেল! স্বচক্ষে দেখুন, আইন-শৃঙ্খলার কী অবস্থা হয়েছে আজকাল!'

কর্নেল বললেন, 'কী ব্যাপার হরবাবু?'

হরবাবু বললেন, 'দিনদুপুরে ঘরে চোর ঢুকেছিল! ব্যাস, অমনি পড়েছে ডনের পাল্লায়। গোবিন্দকে থানায় খবর দিতে পাঠিয়েছি। ফোনে লাইনই পাওয়া গেল না থানার।'

কথা বলতে বলতে একটা হলঘরে আমাদের ঢোকালেন হরবাবু। দেওয়ালে বড়ো বড়ো পুরোনো পোর্ট্রেট। মেঝেয় জীর্ণ কার্পেট। বেরঙা সোফাসেট, গদিছেঁড়া চেয়ার আর কুশন। বাঁ-দিকের একটা ঘরের দরজা খোলা এবং পর্দা ঝুলছে। সেখানে একটা লেজ দেখা আর গজরানি শোনা গেল। বুঝলুম, ডন নামক চতুষ্পদ দজ্জাল প্রাণীটি ওখানে দু-ঠ্যাং মুড়ে বসে আছে।

হরবাবু পর্দা তুলতেই করুণ দৃশ্যটা চোখে পড়ল।

কোনার দিকে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন গোয়েন্দা কে.কে. হালদার। কাকতাড়ুয়া বলাই ভালো। উনি আমাদের দেখে নড়ে ওঠামাত্র ডন আওয়াজ দিল। অমনি হালদারমশাই কাঁচুমাচু হাসলেন। অবস্থাটা বোঝা গেল।

কর্নেল হাসি চেপে বললেন, 'হরবাবু, একটা ভুল হয়ে গেছে।'

হরবাবু বললেন, 'কী ভুল বলুন তো?'

'আপনি ফোনের ভরসা না করে থানায় চলে যান। গোবিন্দকে ফিরিয়ে আনুন। পুলিশ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবেন, চোর পালিয়ে গেছে।'

হরবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী! ওই তো চোর!'

'না হরবাবু! উনি আমাদের বিশেষ পরিচিত প্রাইভেট ডিটেকটিভ মি. কে.কে. হালদার। উনি একজন রিটায়ার্ড পুলিশ ইনস্পেকটরও!' বলে কর্নেল কুকুরটার নাকের কাছে তাঁর ছড়ির ডগা এগিয়ে দিলেন।

অমনি অতবড়ো কুকুরটা লেজ গুটিয়ে কুঁইকুঁই করতে করতে আমাদের পাশ কাটিয়ে হলঘরে ঢুকল। তারপর কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেল। হরবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'এর

মানে?'

'মানে পরে শুনবেন। আপনি প্লিজ থানায় গিয়ে গোবিন্দকে ডেকে আনুন।'

হরবাবু গোমড়া মুখে বেরিয়ে গেলেন। এবার হালদারমশাই 'বাপস' বলে কাছের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। নস্যিও নিলেন। ঘাম ঝরছে দরদর করে।

কর্নেল তাঁর দিকে মনোযোগ না দিয়ে ডাকলেন, 'হাহা-হুহু! চলে এসো এবার। একহাত লড়া যাক।'

পেছনে হলঘরের ভেতর থেকে কেউ বলে উঠল, 'হাতেনাতে বামাল ধরা পড়েছে। হাহা-হুহু বন্দি কর্নেল!'

ঘুরে দেখি, এক অমায়িক চেহারার বৃদ্ধ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। পাতা-চাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাশে গায়ের রং। হাতে একটা নকশাদার ছড়ি, লাঠি বলাই উচিত। কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'মাঝখান থেকে আমাদের হালদারমশাইকে ভুগিয়ে ছাড়ল! কই, চলুন, ওদের কী অবস্থা দেখি।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঁকি মেরে হালদারমশাইকে দেখে বললেন, 'কে উনি?'

'আপনি তাহলে নীচের তলার ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানেন না দেখছি!'

'না তো। কী ব্যাপার?'

কর্নেল হালদারমশাইয়ের পরিচয় দিয়ে আগাগোড়া ঘটনাটি বললেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক খুব হাসলেন। তারপর বললেন, 'যাই হোক, শ্রীমানদ্বয়ের দৌলতে এই একঘেয়ে নিরানন্দ জীবনে মাঝে মাঝে কিছু বৈচিত্র্য মেলে। আজ ভোর বেলা থেকে মনটা বিশেষ ভালো ছিল না। এখন আবার চাঙ্গা হওয়া গেল। আসুন! ওপরে গিয়ে বসা যাক।'

হলঘরের একদিকে ঘোরালো চওড়া কাঠের সিঁড়ি। দোতলার একটা ঘরে আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন ভদ্রলোক। ঘরটা সেকেলে আসবাবে সাজানো। উনিশ শতকি বনেদিয়ানার ছাপ আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। হালদারমশাই এবং আমার উদ্দেশে কর্নেল বললেন, 'এ-বাড়ির অনেক ইতিহাস আছে। নবাবি আমলের দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটলে প্রচুর তাক-লাগানো খবর পাওয়া যাবে এ-বাড়ি সম্পর্কে।'

বাড়ির কর্তা বললেন, 'পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই, কর্নেল! আসুন, কয়েদিদের উদ্ধার করবেন। সাবধান! রীতিমতো যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে কিন্তু।'

কর্নেল ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে গেলে হালদারমশাইকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কুকুরের পাল্লায় পড়লেন কী করে?'

হালদারমশাই কাঁচুমাচু হেসে বললেন, 'গেট থেকে উঁকি মেরে দেখি, নীচের হলঘরের দরজা খুলে ওই হরবাবু বেরিয়ে সন্দেহজনকভাবে বাড়ির পেছন দিকটায় চলে গেলেন। চেহারাখানা তো দেখলেন। দাগি ক্রিমিন্যাল মনে হয় না? তো সেই ফাঁকে আমি হলঘরে ঢুকে পড়লুম। সেই সময় ওপরে কুকুরের গজরানি। অমনি পাশের ওই ঘরটাতে ঢুকে পড়লুম। তারপর কুকুর ব্যাটাচ্ছেলে এসে দরজায় বসে পড়ল। ভাগ্যিস ঝাঁপিয়ে পড়েনি। কিন্তু আশ্চর্য, যতবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিভলবার বের করতে যাচ্ছি, ততবার গজরে গজরে উঠছে। বেগতিক দেখে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম নট-নড়নচড়ন অবস্থায়। একটু পরে হলঘরের বাইরের দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। তখন বাধ্য হয়ে সাড়া দিতে হল। বুঝলেন না? অ্যালসেশিয়ান বলে কথা! কিন্তু হরবাবু না টরবাবু এসে আমাকে দেখেই চোর বলে

হাঁক ছাড়লেন। অমনি কালো হোঁতকা চেহারার এক পালোয়ান, মানে গোবিন্দ না টোবিন্দ এসে হাজির। ওঃ! জীবনে এমন বোকা কখনো বনতে হয়নি।'

কর্নেল এবং বাড়ির কর্তা দু-জন মুখোশপরা খুদে মানুষকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ওদের দু-জনেরই হাতে দুটো কালো রঙের লম্বাটে খেলনাপিস্তল, এক জনের বুকপকেটে একটা গুলতি। কর্নেল ওদের মুখোশ খুলে দিতেই বেরিয়ে পড়ল সুন্দর দুটো ছেলে। ন-দশ বছর বয়স মোটে। মুখে মিটিমিটি হাসি। দেখামাত্র বুঝলুম, ওরা দুটো যমজ ভাই। একে অন্যের প্রতিমূর্তি। কর্নেল বললেন, 'শেঠমশাই! ভিলেনদের পরিচয় করিয়ে দিন। কে হাহা, কে হুহু, আপনিই ভালো জানেন।'

শেঠমশাই এক জনের চুল টেনে দিয়ে বললেন, 'ইনি হাহা, গুলতিবাজ।' অন্য জনের কান টেনে দিয়ে বললেন, 'ইনি হুহু। আর বলবেন না! এদের দস্যিপনায় সারাক্ষণ অস্থির হয়ে থাকি। হাহা গুলতি ছোড়ে আর হুহু চিরকুট লেখে।'

হালদারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কো-২ ব্যাপারটা কী?'

'এরাই,' শেঠমশাই বললেন, 'কোমল আর কোরক। কোমল হল হাহা, আর কোরক হল হুহু। সেই ড. জেকিল আর মি. হাইডের মতো আর কি! নিজেরাই হিরো, নিজেরাই ভিলেন। নিজেরাই নিজেদের কিডন্যাপার।' শেঠমশাই হাসতে হাসতে একটা আরামকেদারায় বসে পড়লেন।

সেই সুযোগে হাহা-হুহু সুড়ুৎ করে বেরিয়ে গেল। কর্নেল এসে হালদারমশাইয়ের পাশে বসলেন। বললেন, 'আপনাকে মহাভারত পড়তে বলেছিলুম, হালদারমশাই!'

হালদারমশাই রহস্য কেঁচে যাওয়ায় নিরাশ। শুধু বললেন, 'হুঁ:!'

'মহাভারতে হাহা আর হুহু নামে দুই গন্ধর্বের কথা আছে।'

শেঠমশাই বললেন, 'আসলে ওদের প্রাইভেট টিউটর তপোব্রত এই চক্রান্তের মূলে। কর্নেলকে নিয়ে মজা করার ফন্দি। আজ যেই-না গুলতি ছুড়েছে অমনি ধরে ফেলেছি। শ্রীমানরা একটু আগে কবুল করেছে সব। মহাভারতের হাহা-হুহু গন্ধর্বের কথা ওরা কেমন করে জানবে? তপোব্রত শিখিয়েছে। সেও একটা বোকার বোকা, তা যত ডিগ্রির জাহাজ হোক-না-কেন। কর্নেলকে ফাঁকি দেওয়া কি অত সহজ কথা? তপোব্রতকে ধমকে দিতে হবে।'

কর্নেল বললেন, 'না, না। ও বেচারাকে কিছু বলবেন না। খুব ভদ্র আর সুশিক্ষিত ছেলে। অনেক খোঁজখবর রাখে। আজকাল তপোব্রতের মতো প্রাইভেট টিউটর পাওয়া ভাগ্যের কথা।'

হালদারমশাই ফের একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু ক্লিয়ার হলে ভালো হত।'

কর্নেল বললেন, 'কোরক-কোমল শেঠমশাইয়ের নাতি। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাই বলব, বছর দুই আগে কোরক-কোমলের বাবা-মা শোচনীয় দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। ওঁরা রিকশো করে আসছিলেন। একটা প্রাইভেট কার পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারে। শেঠমশাইয়ের দুই ছেলে। ছোটো ছেলে হরনাথবাবুকে তো দেখেছেন একটু আগে।'

হালদারমশাই নড়ে বসলেন। 'অ্যাক্সিডেন্টটা কেমন যেন...' বলেই থেমে গেলেন। মুখে সন্দেহের ছাপ।

শেঠমশাইকে মুহূর্তের জন্য বিরক্ত দেখাল। কিন্তু চেপে গিয়ে ম্লান হাসলেন। 'আপনি ডিটেকটিভ। সবেতেই আপনি সন্দেহপ্রবণ, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু পুলিশ তো বটেই, আমিও এর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখিনি। এমন অ্যাক্সিডেন্ট তো আজকাল প্রায়ই হচ্ছে। তা ছাড়া তখন সন্ধ্যে বেলা। ওই এরিয়ায় লোডশেডিংও ছিল। তার চেয়েও বড়ো কথা, ওদের শত্রু কেন থাকবে?'

'কর্নেল স্যারকে দিয়ে একবার তদন্ত করালেও পারতেন!' হালদারমশাই তবু দমে গেলেন না, 'আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভরা তো কোন ছার, পুলিশের বাঘা বাঘা ডিটেকটিভকে কর্নেল স্যারের পায়ের ধুলো নিতে দেখেছি।'

কর্নেল বললেন, 'আমি তখন বাইরে ছিলুম। তা ছাড়া কোরক-কোমলের বাবা অমরবাবুকে এ-পাড়ার পুরোনো বাসিন্দা হিসেবে ছোটোবেলা থেকেই চিনতুম। অত্যন্ত সজ্জন মানুষ ছিলেন। ওঁর স্ত্রী সবিতাকেও চিনতুম। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই ছিলেন পরমাণু বিজ্ঞানী। সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ওঁরা।'

'সায়েন্টিস্ট!' হালদারমশাই গলার ভেতর বললেন। ঠোঁটের কোনায় সেই আলপিন-হাসি।

বুঝলুম, বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের কথা মনে পড়ে গেছে। কর্নেল বললেন, 'যাই হোক, হালদারমশাই, তাহলে হাহা-হুহু রহস্য ফাঁস হয়েছে। এবার ওঠা যাক। সাড়ে দশটা বাজে। এগারোটায় আমার একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

শেঠমশাই হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'সে কী! কতদিন পরে এলেন। সঙ্গে এঁরা সব রয়েছেন। অন্তত একটু চা বা কফি না খাইয়ে বিদায় দিই কী করে? একটু বসুন। গোবিন্দ এখনই এসে যাবে। সমস্যা হয়েছে, রান্নাবান্নার জন্য কাজের লোক জোটে না। গোবিন্দই সব করে-টরে অগত্যা। হর-র যা মেজাজ! একটা কাজের লোক টেঁকে না। ক-দিন থেকেই কেটে পড়ে।'

হালদারমশাই বললেন, 'হরনাথবাবুর, মানে, ফ্যামিলি-ট্যামিলি নেই?'

জবাব দিলেন কর্নেল। 'উনি বিয়ে করেননি। তবে দাদার মতোই গুণী মানুষ। দারুণ ছবি আঁকেন। নীচের একটা ঘরে ওঁর স্টুডিয়ো আছে। সারাক্ষণ সেখানেই থাকেন।'

শেঠমশাই বিরক্ত মুখে বললেন, 'ও একটা পাগল। বদ্ধ পাগল। পাগল আর গোঁয়ার। অকম্মার ধাড়ি!'

কর্নেল হাসলেন, 'আর্টিস্টরা একটু খেয়ালি স্বভাবের মানুষ।'

এইসময় সেই গোবিন্দ এল হাঁফাতে হাঁফাতে। হালদারমশাই ঠিকই বলেছেন, পালোয়ানই বটে। তাগড়াই চেহারা। চুলে পাক ধরেছে কিন্তু শরীরটি ঢালাইকরা লোহা একেবারে। পরনে খাটো নীলচে লুঙ্গি আর লাল ছেঁড়াখোঁড়া গেঞ্জি। গলায় তক্তি। সে অবাকচোখে শুধু হালদারমশাইকে দেখতে থাকল।

বুড়োকর্তা ধমক দিয়ে বললেন, 'দেখছিস কী? এঁদের জন্য চা-কফি যা হোক একটা কিছুর ব্যবস্থা কর।'

কিছুক্ষণ পরে আমরা তিন জনে বনেদি শেঠ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলুম। গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন শেঠমশাই। গলি-রাস্তায় যেতে যেতে হালদারমশাই বললেন, 'একটা এক্সপিরিয়েন্স হল বটে। তা কর্নেল স্যার, আপনার শেঠমশাইয়ের পুরো নামটি কী?'

‘অচিন্ত্যকুমার শেঠ। পদবি শেঠ, কিন্তু এঁরা বাঙালি। নবাবি আমল থেকে ব্যাঙ্কিং এঁদের বংশগত পেশা ছিল।’ কর্নেল একটু দাঁড়িয়ে নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে নিলেন, ‘অচিন্ত্যবাবুর বয়স এখন প্রায় আশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে উনি যখন যুবক, তখন ওঁদের দরিয়াগঞ্জ প্রাইভেট ব্যাঙ্ক ফেল করে। ওই সময় দেশে অসংখ্য প্রাইভেট ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। ব্যাঙ্ক ফেল করার হিড়িক বলা যায়। ফলে শেঠমশাই বংশগত পেশা ছাড়তে বাধ্য হন। মুর্শিদাবাদে পদ্মার ধারে দরিয়াগঞ্জে ওঁদের পূর্বপুরুষের বসবাস ছিল। সেই সূত্রে কিছু জমিজমাও ছিল। এখনও কিছু আছে শুনেছি। সম্ভবত তাই থেকে কোনো রকমে এখন সংসার চলছে। অমরের মৃত্যুর পর অবস্থা শোচনীয় হয়ে গেছে। হরনাথ তো ছবি নিয়েই মশগুল।’

এতক্ষণে মনে পড়ল, বাড়িটার গেটে ভাঙাচোরা ফলকে যে নামটা লেখা দেখেছিলুম, সেটা নিশ্চয় ‘দরিয়াগঞ্জ ভবন’।

হালদারমশাই ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বললেন, ‘আসি, কর্নেল স্যার!’

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, ‘আজ রাতে, আশা করি, চন্দ্রকান্তবাবুর বাগানে সবুজ আলোর রহস্য ভেদ করতে যাবেন, হালদারমশাই?’

উনি শুধু হাসবার চেষ্টা করলেন। আমি হাসতে হাসতে বললুম, ‘হাহা-হুহু রহস্য ফাঁস করতে গিয়ে যা ভুগেছেন, এবার হালদারমশাই সাবধানে কেসে হাত দেবেন।’

হালদারমশাই নির্লিপ্ত মুখে পা বাড়ালেন। কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ ঘুরে বললেন, ‘একটা কথা।’

কর্নেল বললেন, ‘বলুন।’

‘কুকুরটা আপনার ছড়ির গুঁতো খেয়ে অমন লেজ গুটিয়ে নিপাত্তা হয়ে গেল কেন বলুন তো?’

‘ফর্মুলা-২০।’

‘তার মানে?’

কর্নেল আমাকে বললেন, ‘তুমিই বুঝিয়ে দাও, জয়ন্ত! আর শোনো, ওঁকে তোমার গাড়িতে বাড়ি পৌঁছে দাও। বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে হালদারমশাইকে।’

বলে নিজের বাড়ির গেটে ঢুকে গেলেন কর্নেল। হালদারমশাই শুকনো হেসে বললেন, ‘কর্নেল স্যার ঠিকই ধরেছেন। আমি সত্যি বড্ড টায়ার্ড, মানে, বুঝলেন না? খামোকা একটা ঝামেলা। তার ওপর কুকুর-টুকুর আমার চক্ষুশূল। কামড়ালে কী হত ভাবুন! পেটে চোদ্দোখানা ইয়া মোটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ ঢোকানো, মাইন্ড দ্যাট, ফোরটিন!... বাপস! আর তা না হলে ভয়াবহ অবস্থা। হাইড্রোফোবিয়া! জলাতঙ্ক রোগ!’

আমার গাড়ি পার্ক করা ছিল গেটের ভেতর চওড়া লনের পাশে। গাড়িতে ঢুকে হালদারমশাই মনে করিয়ে দিলেন, ‘ফর্মুলা-২০।’

কাশ্মীর-সীমান্তে কান্দ্রা উপত্যকায় সেবারকার রোমাঞ্চকর অভিযানের গল্পটা আগে বলে নিতে হল। কারণ ‘ব্যাকগ্রাউন্ড’ ছাড়া হালদারমশাই কোনো কথা শুনতে চান না। যাযাবর গুজরদের ভেড়ার পালের রক্ষী হিংস্র কুকুরবাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে কর্নেল ফর্মুলা-২০ নামের রাসায়নিক জিনিসটি উদ্ভাবন করেছিলেন। জিনিসটার ভীষণ বিচ্ছিরি গন্ধ। একবার শুঁকলে কুকুর কেন, বাঘ-ভাল্লুক-সিংহ সবাই লেজ গুটিয়ে নিপাত্তা হয়ে যায়। কান্দ্রা

উপত্যকার সেই গল্প শুনে হালদারমশাই ফের চাঙ্গা হলেন। এমনই চাঙ্গা যে গড়িয়াহাট মোড়ে পৌঁছেই বলে উঠলেন, 'এখানেই নামিয়ে দিন, জয়ন্তবাবু! আর কষ্ট করতে হবে না।'

অবশ্য তখন মোড়ে প্রচণ্ড ট্র্যাফিক জ্যাম!

২

সেদিনই সন্ধ্যায় 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকার আপিসে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের ফোন এল, উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, 'জয়ন্তবাবু! চলে আসুন! হাহা-হুহু মিস্ট্রি ম্যাথেমেটিক্যালি সলভড! এসে স্বচক্ষে দেখে যান। পিক্টোরিয়াল ফর্মেশনে।'

বললুম, 'আহা, বলুন না ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?'

'ধুর মশাই,' বিজ্ঞানী খাপ্পা হয়ে বললেন, 'ফোনে কি এ-অঙ্কের ফর্মুলা বলা যায়? চলে আসুন না।'

'কিন্তু...'

'কী মুশকিল! এলে আপনারই লাভ। কাগজের দারুণ খবর হবে। হিড়িক পড়ে যাবে।'

'ঠিক আছে যাচ্ছি,' বলে ফোন রেখে দিলুম। খুব হাসি পাচ্ছিল। তারপর মনে পড়ে গেল ওঁর বাগানে রাতবিরেতে সবুজ আলোর ঝলকানির কথা।

হ্যাঁ, এটা অবশ্য একটা খবর হওয়ার মতো জিনিস। কিন্তু চন্দ্রকান্ত আজ সকালে নিজেই বারণ করেছিলেন, ব্যাপারটা যেন না রটে। রটে গেলে আলোটাকে পাকড়াও করতে পারবেন না। বড্ড চালাক আলো, সাবধান হয়ে যাবে।

বেরোনোর আগে কর্নেলকে রিং করলুম। ষষ্ঠী জানাল, 'বাবামশাই বিকেলে বেইরেছেন।'

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত মাস ছয়েক আগে ভি.আই.পি. রোডের তল্লাটে একটা পুরোনো বাগানবাড়ি কিনে তার আমূল ভোল ফিরিয়েছেন। বড়ো রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে জঙ্গুলে পরিবেশের ভেতর নিরিবিলি এক-তলা বাড়ি। একেবারে পাড়াগাঁ বলে মনে হয়। তবে শহরের যাবতীয় সুযোগসুবিধার ঘাটতি নেই। গাছপালার ভেতর আলো জুগজুগ করছে চারদিকে।

পৌঁছোতে সাতটা বেজে গেল। গেটে দাঁড়িয়ে আমারই প্রতীক্ষা করছিলেন চন্দ্রকান্ত। ভেতরে গাড়ি পার্ক করে বেরোনোমাত্র খপ করে আমার একটা হাত ধরে ফেললেন। তারপর হিড়হিড় করে টানতে টানতে সোজা ওঁর ল্যাবে নিয়ে গেলেন।

কম্পিউটারের সামনে বসে বিজ্ঞানী বললেন, 'স্ক্রিনের দিকে লক্ষ রাখুন।'

ভিশন-স্ক্রিনে লাল-নীল-সবুজ রঙের ফুটকি, কাটাকুটি রেখা, নানান হিজিবিজির রেস শুরু হয়ে গেল। একটু পরে সেই হিজিবিজি রঙিন চিত্রকলার ভেতর থেকে নাচতে নাচতে এসে দাঁড়াল, কী অবাক! কী আশ্চর্য! দুটো খুদে মূর্তি-শ্রীমান কোমল ও শ্রীমান কোরক!

মাত্র কয়েক সেকেন্ড! তারপর ওরা জিমন্যাস্টিকসের ভঙ্গিতে ওলটপালট হতে হতে মিলিয়ে গেল। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত ফিক করে হেসে বললেন, 'বড্ড অস্থিরমতি বালক তো!

তাই আটকে রাখা যায় না।'

'কিন্তু এ কীভাবে সম্ভব হল?'

'বিশুদ্ধ অঙ্ক, জয়ন্তবাবু! যাকে বলে পিয়োর ম্যাথ।' চন্দ্রকান্ত কম্পিউটার বন্ধ করে উঠে পড়লেন। পা বাড়িয়ে বললেন, 'সঠিক ডাটা ফিড করাতে পারলে সঠিক সমাধান বেরিয়ে আসে। চলুন, ও-ঘরে গিয়ে সব বলছি।'

বসার ঘরে গিয়ে বললুম, 'আমি সত্যি অভিভূত। মুগ্ধ হয়ে গেছি আপনার কীর্তি দেখে। আপনি সত্যিই একজন জিনিয়াস!'

চন্দ্রকান্ত বসে পা দোলাতে দোলাতে বললেন, 'না, না। জিনিয়াস নয়। ডাটা! স্রেফ তথ্য। তথ্যকে অঙ্কে সাজানো। ব্যাস! কেল্লা ফতে।'

'কিন্তু ওই চিরকুট থেকে এমন কী ডাটা পেলেন যে...'

হাত তুলে আমাকে থামিয়ে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'কর্নেলের সঙ্গে তারপর আর আপনার যোগাযোগ হয়নি?'

'না।'

চন্দ্রকান্ত মিটিমিটি হেসে বললেন, 'কর্নেলের সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব হত না। ওঁর বাড়ি থেকে আসার পর, নোটবইতে যে অঙ্কটা দেখেছেন, তাই নিয়ে জেরবার হচ্ছিলুম। তিনটে নাগাদ বুঝলুম, আরও কিছু ডাটা চাই। তখন কর্নেলকে ফোন করলুম।'

'কর্নেল সব বললেন?'

'হ্যাঁ।' চন্দ্রকান্ত শিশুর মতো খিক খিক করে হাসতে থাকলেন।

'কিন্তু তা থেকে কোমল-কোরকের ছবি কীভাবে ভিশন-স্ক্রিনে ধরা পড়ল?'

চন্দ্রকান্ত হাসি থামিয়ে বললেন, 'এটাই আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানের প্রযুক্তিকৌশল, জয়ন্তবাবু! তবে একটা ব্যাপার আপনিও এখনও জানেন না। আমিও আজ সকাল পর্যন্ত জানতুম না। সেটা হল, অমর আর সবিতা, মানে আপনার এই হাহা-হুহুর বাবা-মা, আমারই কলিগ ছিল। বাঙ্গালোর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি একসময়। ওরা কলকাতায় সাহা ইনস্টিটিউটে চাকরি নিয়ে চলে এল। তারপর আর যোগাযোগ ছিল না। কর্নেলের কাছে অ্যাক্সিডেন্টে ওদের মৃত্যুর খবর শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেছে। শেঠমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে সান্ত্বনা জানিয়ে আসব ভাবছি।'

চন্দ্রকান্ত কথা শেষ করেছেন, এমন সময় বাইরে কার আর্তনাদ শোনা গেল, 'বাপ রে! গেছি রে! আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো!' তারপর হেঁড়ে গলায় চিৎকার, 'চন্দ্রকান্তবাবু-উ-উ! বাঁচান! বাঁচান!'

চন্দ্রকান্ত তড়াক করে উঠে বাইরে এলেন। আমিও বেরিয়ে গেলুম। দেখলুম, চন্দ্রকান্ত বারান্দায় একটা সুইচ টিপে দিলেন। বাঁ-দিকে বাগানের খানিকটা অংশে উজ্জ্বল আলো পড়ল। সেই আলোয় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল।

গোয়েন্দা হালদারমশাইকে শূন্যে তুলে ধরেছে, হ্যাঁ, চন্দ্রকান্তের সেই বেঁটে রোবটটিই বটে, যার নাম 'ধুন্ধুমার'। যাই হোক, দুঃখও হল, রাগও হল, সকালে অমন কাণ্ডের পরেও দেখা যাচ্ছে হালদারমশাইয়ের শিক্ষা হয়নি। নাকগলানোর স্বভাব যাবে কোথায়?

চন্দ্রকান্ত হাঁক দিয়ে বললেন, 'ধুন্ধুমার! ট্রিও ট্রাও টাট।'

নিশ্চয় রোবটের ভাষা। দেখলুম, বিদঘুটে যন্ত্রমানুষটি হালদারমশাইকে ঘাসে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর গটগট করে হেঁটে বাগানের অন্ধকার দিকটায় চলে গেল। হালদারমশাই সটান এসে বারান্দায় উঠলেন। মুখে যথারীতি কাঁচুমাচু হাসি, সকাল বেলাকার মতোই। চন্দ্রকান্ত ফ্ল্যাশলাইটের সুইচ অফ করে বললেন, 'তাহলে মি. হালদার, দেখলেন তো যেখানে-সেখানে নাকগলানোর বদভ্যাস না ছাড়লে কী দুর্গতি ঘটতে পারে? আমার বাড়িতে আপনার সব সময় অবারিত দ্বার। এভাবে লুকিয়ে আসার কোনো দরকার ছিল কি?'

হালদারমশাই হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'বুঝলেন না? প্রফেশনাল হ্যাবিট। তবে আমি আপনার ভালোর জন্যই ওত পাততে এসেছিলুম, সেদিকটাও আপনার ভেবে দেখা উচিত। উইদাউট ফি... একেবারে বিনি পয়সায়, মাইন্ড দ্যাট।'

চন্দ্রকান্ত তেমনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'ভেতরে আসুন।'

ঘরে ঢুকে পা ছড়িয়ে বসে হালদারমশাই বললেন, 'জয়ন্তবাবু, কতক্ষণ?'

বললুম, 'এইমাত্র।'

চন্দ্রকান্ত ভেতরে গেলেন। হালদারমশাই বললেন, 'কর্নেল স্যার এলে ভালো হত। কেন বলছি জানেন? সবুজ আলোর ব্যাপারটা, আমার মনে হচ্ছে, সকালের ব্যাপারটার মতো হোক্স নয়। আপনার কী ধারণা?'

'না, হোক্স নয়। কারণ চন্দ্রকান্তবাবু ধুন্ধুমারকে পাহারায় রেখেছেন।'

'ধুন্ধুমার?' বলে হালদারমশাই ফিক করে হাসলেন, 'ওই ব্যাটাচ্ছেলে যন্তরমন্তরটা!'

'ওটা একটা রোবট, হালদারমশাই!'

‘ওই হল আর কি!’ হালদারমশাই হাত-পা ছুড়ে রক্ত চলাচলের ব্যায়াম শুরু করলেন। ‘কী ঠান্ডা, আর কী শক্ত! বাপস! হাড় মটমটিয়ে দিয়েছে। পাজিটা! গুন্ডাটা! হত...’

চন্দ্রকান্তকে ঢুকতে দেখে থেমে গেলেন। চন্দ্রকান্তের হাতে ট্রে। এখন মুখে অমায়িক ভাব। ট্রে টেবিলে রেখে বললেন, ‘হাত লাগান প্লিজ! জয়ন্তবাবু তো দেখেছেন, আমার কাজের লোক বলতে ওই ধুন্ধুমার। কিন্তু এখন সে পাহারা দিচ্ছে। আমি আবার এসব কাজে একেবারেই অকম্মা।’

বড়ো প্লেটে পকৌড়া দেখে হালদারমশাই সুড়ুৎ করে জিভে জল টেনে বললেন, ‘খাসা! গরম পকৌড়া জমবে ভালো।’ তারপর হাত বাড়িয়ে তুলে মুখে পুরলেন। চিবোনো দেখে বোঝা গেল, সত্যিই গরম।

একটু অবাক হয়ে বললুম, ‘আধ মিনিটের মধ্যে গরম পকৌড়া ভেজে ফেললেন চন্দ্রকান্তবাবু? আর বলছেন আপনি এসব কাজে অকম্মা?’

চন্দ্রকান্ত মিঠে হাসলেন, ‘কম্পিউটারের কাজ। সিন্থেটিক পকৌড়া।’

হালদারমশাই কান দিলেন না। সানন্দে চিবোতে থাকলেন। আমি ইতস্তত করে বললুম, ‘সিন্থেটিক পকৌড়া। মানে সত্যিকার পকৌড়া নয়?’

‘উঁহু।’

‘কী জিনিস দিয়ে তৈরি বলুন তো?’

‘কয়েক রকম সিন্থেটিক ফাইবারের সঙ্গে ভিটামিন মিশিয়ে।’

ঝটপট বললুম, ‘বুঝেছি।’

হালদারমশাই একা প্রায় পুরো প্লেট সাবাড় করলেন। ভয় হল, এবার পেটের কেলেঙ্কারিতে না পড়েন। কফিতে চুমুক দিতেও ভয় করছিল। কে জানে, সিন্থেটিক কফি কি না। জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। অবশ্য কফিটা কফির মতোই। চন্দ্রকান্ত ঘড়ি দেখে বললেন, ‘কর্নেলের আসবার সময় হয়ে এল।’

বললুম, ‘কর্নেল আসবেন নাকি?’

‘সাড়ে সাতটায় পৌঁছোনোর কথা।’

হালদারমশাই খুশি হয়ে বললেন, ‘সবুজ-আলোওয়ালা বদমাশগুলোর এ-রাতেই দফারফা হবে। কর্নেল স্যার তো আর আমি নন!’

কফি শেষ করে চন্দ্রকান্ত বেরিয়ে গেটের দিকে গেলেন। তখন হালদারমশাইকে বললুম, ‘কম্পিউটারের ভিশন-স্ক্রিনে কোমল-কোরকের ছবি দেখলুম, জানেন?’

হালদারমশাই সোজা হয়ে বসে বললেন, ‘কার কম্পিউটার? কোথায় দেখলেন?’

‘চন্দ্রকান্তবাবুর ল্যাবরেটরিতে। ওঁকে বললে নিশ্চয় আবার দেখাবেন। অবাক হয়ে যাবেন হালদারমশাই! শুধু ডাটা, মানে অঙ্কের সাহায্যেই বলা যায়, দুই যমজ ভাইয়ের ছবি ফোটাতে পেরেছেন চন্দ্রকান্তবাবু! তার মানেটা কী, বুঝলেন? উনি হাহা-হুহু রহস্য ঘরে বসেই ফাঁস করে ফেলেছেন।’

‘বলেন কী,’ খুবই অবাক হয়ে গেলেন গোয়েন্দা কে.কে. হালদার। মুখে কিছুক্ষণ কথা বেরোল না।

বাইরে গাড়ির চাপা গরগর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শব্দটা বাড়তে বাড়তে খুব কাছাকাছি এসে থামল। একটু পরে চন্দ্রকান্তের 'ওয়েলকাম' শোনা গেল।

কর্নেল ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন, 'আরে! হালদারমশাই যে!'

হালদারমশাই নস্যি নিয়ে হাঁচার ভঙ্গিতে বললেন, 'এসে গেছি আর কি!'

'আশা করি, সকালের মতো কোনো ঝামেলায় পড়েননি?'

হালদারমশাই ঝটপট স্বীকার করলেন, 'পড়েছিলুম।'

'এবার ডনের বদলে দানোর পাল্লায়?'

'কী বললেন? দানো?' হালদারমশাই খিখি করে হেসে ফেললেন। 'ঠিক, ঠিক। দানোই বটে।'

কর্নেল বসতে যাচ্ছিলেন, চন্দ্রকান্ত বললেন, 'আগে আমার রেজাল্টটা দেখুন। আমি প্লাস আপনি, দু-জনের ডাটা ফিড করিয়ে হাহা-হুহু দারুণ বেরিয়ে এসেছে। জয়ন্তবাবুকে দেখিয়েছি। উনি স্বীকার করেছেন, ওরা অমর ও সবিতার যমজ সন্তানই বটে। কী যেন নাম?'

হালদারমশাই বললেন, 'কোমল আর কোরক।'

'আমার ব্রেন সব জিনিস নেয় না,' চন্দ্রকান্ত ল্যাবের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'কম্পিউটার আছে সেজন্য। যাই হোক, স্বচক্ষে দেখুন, কী আশ্চর্য কীর্তি করে ফেলেছি!'

ল্যাবে ঢুকে কম্পিউটারের সামনে বসে চন্দ্রকান্ত আগের মতো বোতাম টেপাটিপি শুরু করলেন। স্ক্রিনে তেমনি হিজিবিজি রঙের রেস চলতে থাকল। তারপর ওলটপালট জিমন্যাস্টিকসের ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে দুটো মূর্তি এসে গেল। কয়েক সেকেন্ড পরে মিলিয়েও গেল। হালদারমশাই বলে উঠলেন, 'ম্যাজিক! ম্যাজিক! ভাবা যায় না!'

চন্দ্রকান্ত কম্পিউটার বন্ধ করে বললেন, 'দেখলেন তো কর্নেল?'

কর্নেল বললেন, 'দেখলুম!'

চন্দ্রকান্ত আহ্লাদে গলায় বললেন, 'আহা! বলুন, কেমন হুবহু এসেছে।'

'এসেছে, তবে...।'

বিজ্ঞানী একটু অবাক হয়ে বললেন, 'তবে? তবে কী?'

কর্নেল হাসলেন, 'আপনার কৃতিত্ব অস্বীকার করছি না। স্ক্রিনে আমরা দু-জন বালকের ছবি ঠিকই দেখলুম। তাদের চেহারা একইরকম। তবে...'

চন্দ্রকান্ত এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী মুশকিল! তবেটা কী?'

'চন্দ্রকান্তবাবু, আপনি কি কোমল-কোরককে দেখেছেন?'

'নাঃ,' চন্দ্রকান্ত জোরে মাথা দোলালেন, 'কিন্তু তাতে কী? জয়ন্তবাবু, হালদারমশাই! আপনারাও তো দেখলেন। জয়ন্তবাবু দু-বার দেখলেন। বলুন, ঠিক আসেনি?'

হালদারমশাই বললেন, 'আলবাত এসেছে। সেই দুষ্টু ছেলে দুটোই বটে।'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'মানুষের ঘিলু আর কম্পিউটারের ঘিলু এক হতে পারে না চন্দ্রকান্তবাবু! ভুলে যাবেন না, মানুষই কম্পিউটারকে চালায়। যাই হোক, জয়ন্ত আর হালদারমশাইকে বলি, মনের মাধুরী মেশানো বলে কী যেন একটা কথা আছে না।

স্ক্রিনে আমরা দুটো একই চেহারার বালককে দেখেছি এবং দেখামাত্র তাদের ওপর শ্রীমান কোমল আর শ্রীমান কোরককে আরোপ করেছি। স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য যতটা সময় দরকার, পাইনি। এক সেকেন্ডের দেখা ছবি। পুরো ব্যাপারটা সাইকোলজিক্যাল কারচুপি। না না চন্দ্রকান্তবাবু, তবু আপনার কৃতিত্ব অস্বীকার করছি না। নিছক ডাটা থেকে ছবি তৈরির ক্ষমতা খুব সোজা ব্যাপার নয়। আপনার এ কৃতিত্ব অসাধারণ। কনগ্রাচুলেশান!'

চন্দ্রকান্তবাবু এই প্রশস্তিতে খুব খুশি হলেন বলে মনে হল না। ড্রয়িং রুমে গিয়ে মিনমিনে গলায় বললেন, 'বসুন! আর একদফা কফি-পকৌড়া হোক।'

আমার বিজ্ঞ বন্ধু চোখ নাচিয়ে বললেন, 'সিন্থেটিক কফিতে আপত্তি নেই। তবে সিন্থেটিক পকৌড়া চলবে না।'

চন্দ্রকান্ত ভেতরে চলে গেলেন। মুখখানি ম্রিয়মাণ। হালদারমশাই মন্তব্য করলেন, 'টেরিফিক!'

'কী?'

'পকৌড়া।'

'কতগুলো খেয়েছেন?'

হালদারমশাই সহাস্যে পেটে হাত বুলিয়ে বললেন, 'রাত্তিরে আর কিছু না খেলেও চলবে।'

কর্নেল দাড়ি থেকে একটা রাতপোকা বের করে ছুড়ে ফেলে বললেন, 'চন্দ্রকান্তবাবুর কাছে সিন্থেটিক হজমি বড়ি চেয়ে নিতে ভুলবেন না, হালদারমশাই!'

আগের মতোই শিগগির কফি নিয়ে এলেন বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, 'সত্যি টেরিফিক!'

চন্দ্রকান্তকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। ওঁকে খুশি করার জন্য বললুম, 'কর্নেল, জানেন? কোমল-কোরকের বাবা-মা চন্দ্রকান্তবাবুর কলিগ ছিলেন বাঙ্গালোরে?'

কর্নেল বললেন, 'জানি। উনি আমাকে সব বলেছেন।'

হালদারমশাই বললেন, 'কী আশ্চর্য যোগাযোগ তাহলে!'

'হ্যাঁ, আশ্চর্য বলা যায়,' কর্নেল চুরুট ধরালেন এবং ধোঁয়ার সঙ্গে বললেন, 'বিকেলে সাহা পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা গবেষণা সংস্থায় গিয়েছিলুম। কারণ সকালে চন্দ্রকান্তবাবু সবুজ আলোর কথাটা বলার পর থেকে মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছিল।'

চন্দ্রকান্ত ভুরু কুঁচকে বললেন, 'প্রশ্ন? কী প্রশ্ন বলুন তো?'

'অমর ও সবিতার সঙ্গে আমার শেষবার দেখা ওদের দুর্ঘটনার মৃত্যুর মাস তিনেক আগে। পরদিনই ব্রাজিলে চলে গেলুম। তা কথায় কথায় ওদের জিজ্ঞেস করেছিলুম, কী নিয়ে রিসার্চ করছে ওরা? বলল, কসমিক রে, মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে। অদৃশ্য অতি-সবুজ রশ্মিকে কীভাবে দৃশ্যমান করা যায় এবং করতে পারলে পার্থিব বস্তুতে তার কী প্রতিক্রিয়া ঘটে, এই ছিল ওদের গবেষণার বিষয়।'

চন্দ্রকান্ত নড়ে বসলেন, 'তারপর, তারপর?'

‘আজ বিকেলে সাহা গবেষণাসংস্থায় গিয়ে আমার পুরোনো বন্ধু ড. সতীশ চন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। সৌভাগ্যই বলব। তাঁর কাছে জানতে পারলুম, অমর ও সবিতা গবেষণায় সফল হয়েছিল। ব্যাপারটা দু-জনে ডেমনস্ট্রেট করেছিল ওখানে। কিন্তু রিসার্চ পেপার ওখানে তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না। ড. চন্দ্রের ধারণা, পেপার ওরা জমা দেয়নি। যথাসময়ে যদি দিত, তাহলে সেই পেপার গেল কোথায়? ওখান থেকে ছুটে গেলুম শেঠমশাইয়ের দরিয়াগঞ্জ ভবনে। অমর-সবিতার ঘরে তেমন কোনো কাগজপত্র নেই। শেঠমশাই একটা সূত্র দিলেন শুধু। ছেলে-বউমার সঙ্গে সব সময় একটা কালো রঙের ব্রিফকেস দেখতেন, হয় ছেলের হাতে, নয়তো বউমার হাতে, দুর্ঘটনার পর সেটা আর দেখতে পাননি।’

হালদারমশাই হাঁসফাঁস করে বললেন, ‘রহস্য! রহস্য! সাংঘাতিক রহস্য!’

চন্দ্রকান্ত নিজের বড়ো বড়ো চুল টানাটানি করছিলেন। মুখে উত্তেজনার ছাপ। বললেন, ‘তাহলে তো সমস্যা!’

হালদারমশাই ঘন ঘন নস্যি নিচ্ছিলেন। আমি বললুম, ‘কী চন্দ্রকান্তবাবু?’

চন্দ্রকান্ত বললেন, ‘সমস্যা নয়? কেউ রিসার্চ পেপার থেকে সবুজ আলোর ফর্মুলা চুরি করুক, যন্ত্র তৈরি করুক তার সাহায্যে, যা খুশি করুক হতচ্ছাড়া, আমার পেছনে লেগেছে কেন?’

হালদারমশাই বললেন, ‘নিশ্চয় আপনার চেনা কোনো সায়েন্টিস্ট-চোর?’

কর্নেল হাসলেন, ‘সেটা অসম্ভব নয়।’

চন্দ্রকান্ত বললেন, ‘কিন্তু আমার এখানে কেন? সারা পৃথিবী পড়ে আছে। কসমিক সবুজ আলোর প্রতিক্রিয়া পরীক্ষার জন্য আমার বাগানে কেন?’

এইসময় বাইরে মৃদু শিসের শব্দ শোনা গেল। অমনি চন্দ্রকান্ত লাফিয়ে উঠলেন। হালদারমশাই বললেন, ‘ক্কী, ক্কী? ও ক্কীসের শব্দ?’

চন্দ্রকান্ত চাপা স্বরে বললেন, ‘ধুন্ধুমার টের পেয়েছে কিছু। কর্নেল! জয়ন্তবাবু! আমার সঙ্গে আসুন। হালদারমশাইও আসতে পারেন, তবে সাবধান!’

আমাদের সেই ল্যাবের ভেতর নিয়ে গেলেন চন্দ্রকান্ত। একটা ড্রয়ার খুলে টর্চলাইটের গড়নের কী একটা যন্ত্র বের করলেন। তারপর অন্য দরজা সাবধানে খুলে বেরোলেন। আমরা ওঁকে অনুসরণ করলুম। আঁকাবাঁকা করিডরে মিটমিটে নীল আলো জ্বলছে। খানিক গিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুললেন চন্দ্রকান্ত। বাইরে এদিকটায় ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। পোকামাকড় ডাকছে। অন্ধকার বারান্দায় চার জনে দাঁড়িয়ে রইলুম। একটু তফাতে লাল-নীল-হলুদ আলোর ফুটকি জ্বলছে-নিভছে। নড়াচড়া করে বেড়াচ্ছে জন্তুর মতো কী একটা জিনিস। বুঝলুম, উনিই শ্রীমান ধুন্ধুমার। মাঝে মাঝে চাপা শিসের শব্দ। তারপর দূরে এয়ারপোর্ট থেকে একটা প্লেন উড়ল। কয়েক মিনিট ধরে তুমুল গরগর শব্দ হতে থাকল।

তারপরই ডান দিকে খানিকটা দূরে দপ করে জ্বলে উঠল একটা উজ্জ্বল সবুজ আলো। ক্রিকেট বলের সাইজ। শূন্যে, মাটি থেকে অন্তত ফুট দশেক উঁচুতে স্থির হয়ে ভেসে রইল আলোটা। চন্দ্রকান্ত তাঁর যন্ত্রে বোতাম টিপলেন, খুট করে শব্দ হল। অমনি গোল আলোটা কড়া চিনির পাকের মতো আঠালো আর টানটান হয়ে এসে আটকে গেল চন্দ্রকান্তের যন্ত্রটার মাথায়। তারপর শুরু হল টাগ অব ওয়ার, টানাটানির খেলা। কিন্তু শেষপর্যন্ত চন্দ্রকান্ত হেরে গেলেন। আলোটা ছিটকে গিয়ে আগের মতো গোল হল এবং নিভে গেল।

চন্দ্রকান্ত 'যাঃ' বলে দেওয়ালে সুইচ টিপে দিলেন। উজ্জ্বল সার্চলাইটের ছটায় দেখা গেল, ধুন্ধুমার বাবাজি কাত হয়ে ঝাউঝোপে পড়ে আছে। চন্দ্রকান্ত দৌড়ে গেলেন। আমরাও ছুটে গেলুম বেচারার কাছে।

কে বা কারা রোবটটিকে অকেজো করে দিয়ে গেছে। চন্দ্রকান্ত ব্যস্তভাবে ওটার কলকবজা টেপাটিপি করেও জ্যান্ত করতে পারলেন না। ভাঙা গলায় বললেন, 'জয়ন্তবাবু, হালদারমশাই! প্লিজ একটু সাহায্য করুন। একে ল্যাবে ঢোকাতে হবে।'

ধুন্ধুমারের ওজন আছে বোঝা গেল। ওকে তিন জনে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ করলুম, কর্নেল টর্চ জ্বেলে বাগানের ভেতর হনহন করে এগিয়ে চলেছেন।

ল্যাবে হাসপাতালের অপারেশন টেবিলের মতো একটা টেবিলে ধুন্ধুমারকে শোয়ানো হল। চন্দ্রকান্তর মুখ করুণ। ঘেমেছেনও প্রচুর। আশ্বিনের রাত্তিরে আজ গাছের পাতা নড়ে না, ভ্যাপসা গরম। কিন্তু ল্যাবের ভেতরটা এয়ারকন্ডিশনড। চন্দ্রকান্ত ধুপ করে একটা চেয়ারে বসে মাথার চুল আঁকড়ে ধরে বললেন, 'একচক্ষু হরিণের অবস্থা হল আমার। যেদিক থেকে হামলা হবে না ভেবেছিলুম, সেদিক থেকেই হল। জয়ন্তবাবু, আপনারা ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসুন। কী ক্ষতি হয়েছে, দেখে নিয়ে আমি যাচ্ছিখন।'

সেই ঘরটাতে হালদারমশাই আর আমি গুম হয়ে বসে রইলুম কয়েক মিনিট। তারপর হালদারমশাই ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বললেন, 'অবিশ্বাস্য! এমন ঘটনা কখনো ঘটতে দেখিনি! আলো কি দড়ি, বলুন তো জয়ন্তবাবু?'

বাইরে কর্নেলের সাড়া পাওয়া গেল। ঘরে ঢুকে বললেন, 'কী হালদারমশাই, কেমন বুঝছেন?'

হালদারমশাই মাথা চুলকে বললেন, 'এ আমার কম্ম নয়, কর্নেল স্যার! সেটাই তো বলছিলুম জয়ন্তবাবুকে। কে কবে দেখেছে আলো দড়ির বান্ডিলের মতো গুটিয়ে যায়, আবার লম্বা হয়... গুটিয়ে যায়, আবার লম্বা হয়... বাপস! যেন চিটেগুড়ের সঙ্গে পিঁপড়ের লড়াই।'

একটু পরে চন্দ্রকান্ত এলেন। তেমনি ম্রিয়মাণ মুখ। চুল এলোমেলো। বললেন, 'ধুন্ধুমার নিজের বুদ্ধির দোষেই কাবু হয়েছিল। ব্যাপারটা হল, যার ওপর যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে গেলে যা হয়, ঠিক তাই। বুদ্ধু! গবেট! কেন তুই আলোটার লাইন বরাবর দাঁড়াতে গেলি?' আপনমনে বকবক করতে থাকলেন বিজ্ঞানী, 'যে-সে আলো নয়, রীতিমতো তেজস্ক্রিয় কণিকা। ঘিলুকে একেবারে বিগড়ে দিয়েছে।'

হালদারমশাই চুপ করে শুনছিলেন। বললেন, 'পাগল-টাগল হয়ে গেছে বুঝি?'

'কিছু বলা যায় না,' চন্দ্রকান্ত শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'দেখি, জ্ঞান ফিরলে কী করে।'

'জ্ঞান ফিরলে?' হালদারমশাই অবাক, 'মানে, মূর্ছা গেছে?'

'হুঁ:!'

গোয়েন্দা আমার দিকে তাকালেন। মুখে অবিশ্বাসের ছাপ। 'কী কাণ্ড! যন্ত্র বিগড়ে যায় শুনেছি। মূর্ছা যাওয়ার কথা তো কখনো শুনিনি!'

হাসবার মতো অবস্থা নয়, চোখের সামনে যে অদ্ভুত ঘটনা দেখেছি। তবু হাসি পেল। আমাকে হাসতে দেখে চন্দ্রকান্ত চোখ কটমট করে বললেন, 'হাসবেন না। এ হাসির

ব্যাপার নয়।'

কর্নেল ছাইদানিতে চুরুট ঘষটে নিভিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা সিরিয়াস। চন্দ্রকান্তবাবু, তাহলে এবার ওঠা যাক। আর জয়ন্ত, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ফিরে গিয়ে তোমার কাগজে জমকালো, একখানা খবর ঝাড়বে। হেডিং দেবে: 'সবুজ আলোর রহস্য' অথবা 'বিজ্ঞানীর বাগানে রহস্যময় সবুজ আলো'। তাই না?'

আমি কিছু বলার আগে চন্দ্রকান্ত জোরগলায় বললেন, 'না। সে খবর বেরোলে আমি কন্ট্রাডিক্ট করব। আমি চাই না এ-নিয়ে হইচই হোক। তাতে আমার উদ্দেশ্য পণ্ড হবে। আলোটাকে পাকড়াও করা যাবে না।'

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন, 'ঠিক তাই। জয়ন্ত, চেপে যাও।'

বিমর্ষ বিজ্ঞানী চুপচাপ বসে রইলেন। আমরা বেরিয়ে এলুম। কর্নেল তাঁর লাল রঙের ল্যান্ডরোভার গাড়ির দরজা খুলে বললেন, 'হালদারমশাই বরং আমার গাড়িতে আসুন।'

হালদারমশাই এতে খুশিই হলেন। আমিও খুশি হলুম। এত রাতে দক্ষিণ কলকাতায় ওঁকে পৌঁছে কাগজের অফিসে ফিরতে খুব দেরি হয়ে যেত। খিদিরপুর ডক এলাকার স্মাগলিং র্যাকেট নিয়ে একখানা চমকদার রিপোর্তাজ লেখা এখনও বাকি। কালকের কাগজেই ওটা বেরোনো দরকার...

রাত এগারোটায় সেই রিপোর্তাজ লিখে সবে উঠতে যাচ্ছি, আমার টেবিলে ফোন বাজল। সাড়া দিতেই কর্নেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'তোমার ফ্ল্যাটে রিং করেছিলুম। কেউ ধরল না। ভাবনা হল, কোনো ঝামেলায় পড়লে নাকি।'

'নাঃ! নিরাপদে ফিরেছি। আপনারা?'

'আমরাও নিরাপদে ফিরেছি। তবে...'

'তবে?'

'লেকভিউ রোডে হালদারমশাইয়ের ফ্ল্যাটে গেছ কি কখনো?'

'গেছি। কেন বলুন তো?'

'ওঁর ফ্ল্যাটের কি-হোলে একটা চিরকুট গোঁজা ছিল। তাতে লেখা আছে: 'সাবধান। ইতি-হাহা-হুহু।' তুমি বরং...'

চমকে উঠেছিলুম। তারপর হাসতে হাসতে বললুম, 'কো-কো-র কীর্তি!'

'জয়ন্ত, ওরা হালদারমশাইকে চেনে না। তা ছাড়া ওদের দাদু ওদের কোথাও একা একা বেরোতে দেন না কক্ষনো। তার চেয়ে বড়ো কথা, হালদারমশাইয়ের ফ্ল্যাটের ঠিকানাই-বা ওরা জানবে কী করে? তুমি বরং সকালে একবার এসো।... আর শোনো!'

'বলুন।'

'সবুজ আলোর খবরটা দৈনিক সত্যসেবকে ছাপানোর ব্যবস্থা করো। প্রথম পাতায় বক্স আইটেম করলে ভালো হয়। চোখে পড়ার মতো হওয়া চাই।'

'চন্দ্রকান্তবাবু চটে যাবেন কিন্তু।'

'উপায় নেই। সিচুয়েশান দ্রুত বদলে যাচ্ছে।'

ফোন রাখার শব্দ হল। অন্তত এক মিনিট চুপচাপ বসে রইলুম। তারপর সবুজ আলোর খবর লিখতে শুরু করলুম। উত্তেজনা আর অস্বস্তিতে আমার হাত কাঁপছিল...

৩

ইলিয়ট রোড এলাকায় কর্নেলের বাড়িতে যখন পৌঁছোলুম, তখন সকাল ন-টা। ঘুম ভাঙতে এমনিতে রোজ দেরি হয়। তাতে কালকের ওইসব গোলমেলে ঘটনা সারারাত জ্বালিয়ে মেরেছে। ঘুম এলেই উদ্ভুট্টে সব স্বপ্ন। ধুন্ধুমার রবীন্দ্রসংগীত গাইছে, গাছে গাছে ফলের মতো ফলেছে সবুজ আলো, শেঠবাড়ির অ্যালসেশিয়ানটা হাতির মতো প্রকাণ্ড হয়ে কামড়াতে আসছে, হালদারমশাই রকেটের মতো আকাশে উঠে যাচ্ছেন, চন্দ্রকান্ত লেসার-পিস্তল তুলে আমাকে শাসাচ্ছেন, 'কর্নেল, কর্নেল' বলে এত চ্যাঁচাচ্ছি, তবু শুনছেন না, খালি হাসছেন আর হাসছেন, তারপর চড়াৎ করে ওঁর টাক ফেটে রক্তারক্তি। বিচ্ছিরি একটা রাত্তির।...

ষষ্ঠী দরজা খুলে দিয়ে ফিক করে হাসল। বললুম, 'কী ব্যাপার?'

সে চাপা গলায় বলল, 'হালদারবাবুর মাথায় কাকে ঠুকরে দিয়েছে। দেখুন গে না, ব্যান্ডেজ বেঁধে বসে রয়েছেন। রক্তারক্তি কাণ্ড!'

তাহলে আমার দুঃস্বপ্নের ধাক্কাটা হালদারমশাইয়ের ওপর দিয়েই গেছে! ওঁর অবশ্য টাক নেই। তবে কাকের ঠোঁট ধারালো বলেই জানি। ড্রয়িং রুম ফাঁকা। ষষ্ঠী ইশারায় ওপর দিকটা দেখাল। অর্থাৎ ছাদে আছে ওঁরা, শূন্যোদ্যানে।

সেখানে গিয়ে দেখি, সত্যি হালদারমশাইয়ের কপালের ঊর্ধ্বপ্রান্তে একটুকরো ব্যান্ডেজ সাঁটা। কিন্তু বসে নেই, নির্ভীক দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে সম্ভবত কর্নেলেরই বাইনোকুলার। লক্ষ্যস্থল উত্তরের সেই শেঠবাড়ি 'দরিয়াগঞ্জ ভবন'।

কর্নেল হাঁটু মুড়ে বসে অষ্টাবক্রকে লোশন মাখাচ্ছেন। হালদারমশাইয়ের কাছে গিয়ে বললুম, 'কী হালদারমশাই? কাক আপনার ওপর খাপ্পা হল কেন?'

হালদারমশাই প্রচণ্ড চমকে তড়াক করে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। বাইনোকুলার নামিয়ে একটু হাসলেন, 'ও, আপনি!'

'বলছিলুম, হঠাৎ আপনার ওপর কাকার রাগের কারণ কী?'

হালদারমশাই ভুরু কুঁচকে বললেন, 'রং ইনফরমেশন। কাকা নয়, কো-কো।'

কর্নেল লোশন মাখাতে মাখাতে বললেন, 'গুলতি, জয়ন্ত! ঠিক কালকের মতো। তবে আজ ওটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।'

বুঝতে পেরে বললুম, 'তাই বলুন! ষষ্ঠী বলল কাক। কাককে আমি কাকা বলি।'

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে পকেট থেকে কালকের মতো একটা ভাঁজকরা চিরকুট বের করলেন। 'এই দেখুন! বড়োলোক দাদুর আদর খেয়ে বাঁদর হয়ে গেছে ছেলে দুটো। আরও কী কাণ্ড করেছে জানেন? আমার ঠিকানা পর্যন্ত জোগাড় করে আমার ফ্ল্যাটের দরজার কি-হোলে এমনি একটা চিরকুট গুঁজে রেখে এসেছে গতকাল। কর্নেল স্যার স্বচক্ষে দেখে এসেছেন গত রাত্তিরে।'

চিরকুটটা আমার হাতে গুঁজে দিলেন হালদারমশাই। তেমনি আঁকাবাঁকা হরফে লাল কালিতে একই কথা লেখা: 'কো-২-কে চুরি করেছি। নাক গলাতে এলে টাক ফুটো করে দেব। ইতি-হাহা-হুহু'।

পড়ে ফেরত দিয়ে বললুম, 'আপনার ফ্ল্যাটের চিরকুটটা দেখি?'

'কর্নেল স্যারের কাছে আছে।'

কর্নেল বললেন, 'মিলিয়ে দেখে নিয়েছি। একহাতের লেখা নয়। অবশ্য, যে চিরকুটটা তুমি দেখলে, ওটা শ্রীমান কোরকের হাতের লেখা। গতকাল তুমিও শুনেছ জয়ন্ত, শ্রীমান কোরক লেখে, আর শ্রীমান কোমল গুলতি ছুড়ে সেটা যথাস্থানে পৌঁছে দেয়।'

কর্নেল কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন, 'সকাল থেকে চন্দ্রকান্তবাবু বার তিনেক ফোন করেছেন। ভীষণ খাপ্পা হয়ে গেছেন তোমার ওপর। বাড়ির সামনে ভিড় জমে গেছে। অসংখ্য রিপোর্টার গিয়ে জ্বালাচ্ছে। টিভির লোকেরা পর্যন্ত গিয়ে হাজির। ভিড় হটাতে পুলিশ ডাকতে হয়েছে। শেষে লাঠি চার্জ!' কর্নেল হাসতে হাসতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

'হালদারমশাই, মুখোশপরা হাহা-হুহু-র দর্শন পেলেন বাইনোকুলারে?'

আমার প্রশ্নের জবাবে হালদারমশাই গলার ভেতর বললেন, 'নাঃ। মহাধড়িবাজ, বিচ্ছু। বাইনোকুলার দেখেই গা-ঢাকা দিয়েছে।'

ড্রয়িং রুমে বসে কফি খেতে খেতে সিন্থেটিক পকৌড়ার কথা মনে পড়ল। কিন্তু হালদারমশাইয়ের চেহারায় তেমন কোনো গণ্ডগোল চোখে পড়ল না। পটাটো চিপস আর বাদাম চিবোতে চিবোতে বললেন, 'কর্নেল স্যার, আর দেরি করা উচিত নয়। সেনমশাইকে বলে এর একটা বিহিত করা দরকার।'

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছেন। এখনই বেরোব। তবে সেনমশাই নন উনি, শেঠমশাই।'

কিছুক্ষণ পরে আমরা দরিয়াগঞ্জ ভবনের গেটে পৌঁছোলুম। গাড়িবারান্দার কাছে পালোয়ান গোবিন্দ গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। দৌড়ে এল। কর্নেলকে বলল, 'সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে স্যার! কর্তামশাইকে জানাতে সাহস হচ্ছে না। কুকুরটাকে ছেলের মতো ভালোবাসেন। কোন মুখে গিয়ে বলি যে...'

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, 'ডন মারা পড়েছে নাকি?'

'আজ্ঞে! ছোটোবাবুর ছবির ঘরে পড়ে আছে। দেখবেন, আসুন,' পালোয়ান কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল।

আমরা ব্যস্তভাবে সেই হলঘরে গিয়ে ঢুকলুম। ডান দিকের একটা ঘরের দরজায় গিয়ে পর্দা তুলল গোবিন্দ। দেখলুম, ঘরভরতি নানা সাইজের ফ্রেমে আঁটা ক্যানভাসে, রং-বেরঙের চিত্রকলা ওলটপালট হয়ে পড়ে আছে। একধারে দাঁড় করানো ইজেলে একটা অসমাপ্ত কী ছবি। তার তলায় অ্যালসেশিয়ানটা পড়ে আছে। মুখে জমাট চাপ চাপ রক্ত। কর্নেল কুকুরটাকে পরীক্ষা করতে থাকলেন।

গোবিন্দ চাপা গলায় বলল, 'আরও সাংঘাতিক কাণ্ড, এ-ঘরের দরজার তালা ভাঙা। পর্দার আড়ালে কী হয়েছে, কেমন করে বুঝব? ভোর বেলা থেকে ডনের সাড়াশব্দ নেই

দেখে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। একটু আগে কী খেয়াল হল, ছোটোবাবুর ঘরে পর্দা তুলে দেখতে এলুম। দেখি, তালা ভাঙা। দরজা ভেজানো।'

কর্নেল বললেন, 'হরবাবু কোথায়?'

'উনি কাল বিকেলের ট্রেনে দরিয়াগঞ্জ গেছেন। বলে গেছেন, ফিরতে দেরি হতে পারে।'

'কোমল-কোরক কী করছে?'

'মাস্টারমশাই এসেছিলেন কিছুক্ষণ আগে। ওদের চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন।'

এইসময় হলঘরের ভেতরকার সিঁড়ির ওপর থেকে শেঠমশাইয়ের গলা শোনা গেল, 'গোবিন্দ! কী হয়েছে? কাদের সঙ্গে গুজুর-গুজুর কচ্ছিস হতচ্ছাড়া? মতলবটা কী, অ্যাঁ?'

গোবিন্দ বেরিয়ে বলল, 'কিছু না কর্তাবাবু! কর্নেলসায়েবরা এসেছেন!'

কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হতে থাকল। গোবিন্দ ছবিঘরে ঢুকে ঝটপট কয়েকটা বড়ো ক্যানভাস চাপিয়ে ডনকে ঢেকে দিল। ইশারায় ডনের কথা বলতে বারণ করল আমাদের।

কর্নেল বেরিয়ে গিয়ে বললেন, 'চলুন শেঠমশাই! আজ রোববারের দিনটা কোথাও আড্ডা না দিলে ভালো লাগে না। চলুন, ওপরে যাই।'

কিন্তু শেঠমশাই সন্দিগ্ধভাবে নেমে এসে এঘরের পর্দা তুললেন। হালদারমশাই ও আমাকে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকালেন একবার। তারপর ঘরের ভেতরটাতে চোখ বুলিয়ে হাঁক দিলেন, 'অ্যাই গোবিন্দ!'

গোবিন্দ উঁকি মেরে বলল, 'আজ্ঞে?'

'হর-র স্টুডিয়ো খুলল কে? আর মারদাঙ্গাই-বা করল কারা? হাহা-হুহু নিশ্চয়?'

'তাই মনে হচ্ছে কর্তাবাবু!'

'হর ফিরে এ-অবস্থা দেখলে কী কেলেঙ্কারি করবে বুঝতে পারছিস?'

'আজ্ঞে।'

'স্টুডিয়োর চাবি কে দিল ওদের? নিশ্চয় তুই দিয়েছিস!' বলে শেঠমশাই তালাটার দিকে তাকালেন। তালাটা যে ভাঙা, সঙ্গেসঙ্গে তাও বুঝে ফেললেন। বেঁটে, নকশাদার লাঠিটা তুলে বললেন, 'এই হতভাগা! তালা ভাঙল কে? হাহা-হুহু-র অত ক্ষমতা নেই। বল, কে তালা ভাঙল?'

'আজ্ঞে...'

'তুই বড্ড বেয়াড়া হয়ে উঠেছিস গোবিন্দ! তোকে পইপই করে বলেছি, সবসময় চারদিকে নজর রাখবি,' বলে শেঠমশাই গোবিন্দের দিকে ঘুরলেন, 'ডন কোথায়? বেঁধে রেখেছিস নাকি? তোকে বলেছি না, ওকে সবসময় খুলে রাখবি? ডন খোলা থাকলে কখনো এমন কেলেঙ্কারি হত না। দেখ তো এবার, হর এসে সব দেখে কী বলবে! ও যা বদরাগী আর গোঁয়ার!'

কর্নেল বললেন, 'গোবিন্দ সব গুছিয়ে রাখছেখন। চলুন, আমরা আড্ডা দিই।'

শেঠমশাই ওঁর কথায় কান দিলেন না। ছত্রভঙ্গ স্টুডিয়োতে ইতিউতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। সোজা চলে গেলেন প্রকাণ্ড ইজেলের সামনে। ভুরু কুঁচকে অসমাপ্ত ছবিটা (কী ছবি আঁকা হবে

কে জানে, খালি ধ্যাবড়া রং-বেরঙের ছাপ) দেখতে দেখতে নকশাদার লাঠির ডগায় একটা জায়গা খুঁচিয়ে দিলেন। 'ফের সেই জিনিসটা এঁকেছে হর? দেখছ কাণ্ডটা? মরণ-পাখা উঠেছে হতভাগার!'

কর্নেল কাছে গিয়ে বললেন, 'কী এঁকেছে, শেঠমশাই?'

'দেখতে পাচ্ছেন না?' শেঠমশাই লাঠির ডগা দিয়ে ঘষতে শুরু করলেন। ইজেলটা নড়তে থাকল। 'সেই অলক্ষুণে সবুজ বল! এত করেও ওর শিক্ষা হয়নি, আবার এঁকেছে!' লাঠির ঘষায় সবুজ বলটাকে মোছা গেল না দেখে নীচের টুল থেকে একটা কালো রঙের টিউব তুলে নিলেন। মুখটা খুলে টিউব টিপে একদলা কালো রং চাপিয়ে দিলেন।

হালদারমশাই আমাকে চিমটি কাটলেন। কর্নেলের দিকে তাকিয়ে দেখি, মাছের চোখে দেখছেন ব্যাপারটা। ইজেলের ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া নানা রঙের ছোপের ভেতর একটা ক্রিকেটবলের মতো গোল সবুজ জিনিস আমার কেন চোখে পড়েনি, ভেবে অবাক হলুম।

শেঠমশাই টিউবটা টুলে রাখলে কর্নেল বললেন, 'সবুজ বল কেন অলক্ষুণে শেঠমশাই?'

উনি গলার ভেতর বললেন, 'অমর আর বউমা একটা সবুজ বলের পাল্লায় পড়েছিল। তারপর ওরা অ্যাক্সিডেন্টে মারা পড়ল। গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করুন, সত্যি কি না!'

গোবিন্দ বলল, 'বড়োবাবু আর বউদিমণি রাত্তিরে ছাদে বসেছিলেন। খাওয়ার জন্য ওঁদের ডাকতে গিয়ে দেখি, একটা সবুজ রঙের এইটুখানি বল ওঁদের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। আগুনের বল! যেই-না আমি গেছি, ভূতুড়ে বলটা হারিয়ে গেল। বড়োবাবু বারণ করলেন, কর্তাবাবুকে যেন কথাটা না বলি। ঠিক তার এক হপ্তা পরে অ্যাক্সিডেন্ট! তখন কর্তাবাবুকে কথাটা বলতেই হল। ছোটোবাবুকেও বললুম। বলুন না আপনারা, এমন সাংঘাতিক কথা এরপর চেপে রাখা যায়?'

হালদারমশাই আবার আমাকে চিমটি কাটলেন। শেঠমশাই উলটে পড়ে থাকা ছবিগুলো লাঠির ডগায় সিধে করতে ব্যস্ত হয়েছেন। একটা করে সিধে করছেন আর বিড়বিড় করে বলছেন, 'দেখছ, দেখছ পাগলের কীর্তি? খালি সবুজ বল এঁকেছে! আর যেন কিছু আঁকবার ছিল না!' তারপরই আবিষ্কার করে ফেললেন ডনের লেজ। এবার হন্তদন্ত হয়ে লাঠি ফেলে হাত লাগালেন। বড়ো বড়ো ফ্রেমে আঁটা ক্যানভাস দুমদাম করে ছুড়তে থাকলেন।

কুকুরটার লাশ বেরিয়ে পড়ল। অমনি কাঠপুতুল হয়ে গেলেন শেঠমশাই। ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকল। চোখ দিয়ে জলের ধারা নামল।

কর্নেল তাঁর হাত ধরে টানলেন, 'শেঠমশাই! আসুন, আমরা ওপরে যাই!'

শেঠমশাই অতিকষ্টে ভাঙা গলায় বললেন, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কিছু বুঝতে পারছি না! এ কী দেখছি! এ স্বপ্ন না সত্যি?'

কর্নেল তাঁকে টানতে টানতে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। হলঘরে গিয়ে বললেন, 'ডনকে কেউ বা কারা বিষাক্ত ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলেছে, শেঠমশাই!'

বৃদ্ধ শেঠমশাই শিশুর মতো কান্নাকাটি করতে করতে ফের বললেন, 'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না... আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না!'

'প্লিজ, শান্ত হোন। ওপরে চলুন, সব বুঝিয়ে বলছি। আর গোবিন্দ, তুমি সদর দরজা বন্ধ করে দাও। এখানেই থাকো, যতক্ষণ না পুলিশ আসে। আমি থানায় ফোন করে

পুলিশকে জানাচ্ছি।' বলে কর্নেল শেঠমশাইকে ধরে কাঠের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। হালদারমশাই আর আমি তাঁদের অনুসরণ করলুম।

শেঠমশাইয়ের ঘরে পৌঁছে তাঁকে বিছানায় বসিয়ে দিলেন কর্নেল। তারপর পাশের টেবিলে রাখা টেলিফোনটা তুললেন। কিন্তু তুলেই নামিয়ে রাখলেন তখনই। আস্তে বললেন, 'ফোনটা ডেড। মনে হচ্ছে, লাইন কেটে দিয়েছে চোরেরা।'

হালদারমশাই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'সাংঘাতিক রহস্য!'

শেঠমশাই ভাঙা গলায় বললেন, 'চোরেরা লাইন কেটে দিয়েছে? কী চুরি করতে এসেছিল তারা? কী ছিল হর-র স্টুডিয়োতে? আমি তো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না?'

কর্নেল উদবিগ্ন মুখে বললেন, 'নিশ্চয় কোনো মূল্যবান জিনিস ছিল। হরবাবু থাকলে কিছু বোঝা যেত। হালদারমশাই, আপনি শিগগির পার্ক স্ট্রিট থানায় একটু খবর দিন। আমার নাম করে ওঁদের বলুন, কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে কোনো অফিসার যেন এখনই আসেন। অন্তত চব্বিশ ঘণ্টার জন্য পুলিশ পাহারা দরকার। এক মিনিট! বরং আমি একটা চিঠি লিখেই দিই।'

কর্নেলের চিঠি নিয়ে হালদারমশাই সবেগে বেরিয়ে গেলেন। শেঠমশাই হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, 'কিছুতে কিছু হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি, এ সেই অভিশাপের ফল। পঞ্চাশ বছর ধরে সেই অভিশাপের ফল ভুগে আসছি। অথচ গ্রাহ্য করিনি। ভাবতাম, কুসংস্কার! এবার স্পষ্ট বুঝতে পারছি, সত্যিই অভিশাপ বলে একটা ব্যাপার আছে।'

কর্নেল তাঁর মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, 'কীসের অভিশাপ, শেঠমশাই?'

শেঠমশাই চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, 'সব কথা গুছিয়ে বলার মতো অবস্থা নয়। তবু বলছি। দরিয়াগঞ্জের নবাব পরিবারের কথা আপনাকে বলেছিলুম। আমার পূর্বপুরুষ নবাবি আমলে বংশপরম্পরা ওঁদের ব্যাঙ্কার ছিলেন।'

'হ্যাঁ, সেসব কথা বলেছেন। কিন্তু কে অভিশাপ দিয়েছিল?'

'নবাব বংশের একজন লোক। তাঁর নাম ছিল বাচ্চু খান। শেষ বয়সে তিনি ফকির হয়ে যান। মাথায় জটা গজিয়েছিল সন্ন্যাসীদের মতো। কালো আলখাল্লা পরে থাকতেন। টোটো করে ঘুরে বেড়াতেন নানা জায়গায়। বছর পঞ্চাশ আগের কথা। তখন আমাদের দরিয়াগঞ্জ ব্যাঙ্কের অবস্থা ভালোই ছিল। একদিন বাচ্চু ফকির, ওই নামেই উনি পরিচিত ছিলেন, হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে হাজির হলেন। সাধুফকির, তাতে নবাব বংশের লোক। খুব যত্ন-আত্তি করলুম। রাত্তিরটা থাকলেন। সকালে খাবার সময় একটা ভেলভেটের কৌটো চুপিচুপি আমাকে দিয়ে বললেন, জিনিসটা যেন আমি লুকিয়ে রাখি। উনি সময়মতো এসে ফেরত নেবেন।' শ্বাস ফেলে শেঠমশাই বললেন, 'কোনো কথা জিজ্ঞেস করারও সুযোগ পেলুম না। কৌটোটা দিয়েই চলে গেলেন। ঘরে এসে খুলে দেখি, একটা প্রকাণ্ড সবুজ রঙের পান্না!'

কর্নেল চমকে উঠলেন, 'পান্না! সবুজ রঙের!' বলে প্রায় দাড়ি ছেঁড়ার তাল করলেন।

'হ্যাঁ। মরকতও বলা হয় রত্নটাকে। ব্যাঙ্কে ধনী লোকেদের হিরে-জহরত বন্ধক নেওয়া হত। কাজেই চিনতে পারলুম। পরীক্ষা করে বুঝলুম, খাঁটি রত্ন। তখনকার দিনেই দাম অন্তত লাখ দুয়েকের কম নয়। কিন্তু একেবারে গোল সাইজ। বলের মতো।'

'তারপর?'

'বাড়িতে রাখতে সাহস হল না। পার্ক স্ট্রিটে আমাদের ব্যাঙ্কের আয়রনচেস্টে রেখে এলুম। এর কয়েক মাস পরে এক বৃষ্টির দিনে সকাল বেলায় বাচ্চু ফকির আবার এলেন। বললেন, জিনিসটা ফেরত নিতে এসেছেন। ওঁকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্কে গেলুম। তারপর আয়রনচেস্ট খুলে দেখি, সব আছে-শুধু সেই ভেলভেটের কৌটোটাই নেই!'

'সে কী!'

শেঠমশাই দুটো বালিশ টেনে হেলান দিয়ে গলার ভেতর বললেন, 'থানা-পুলিশ করেও কোনো কিনারা হল না। আয়রনচেস্টের চাবি থাকত আমারই কাছে। বাচ্চু ফকির ছিলেন পাগলাটে প্রকৃতির মানুষ। কিছুতেই ওঁকে বোঝাতে পারলুম না, আমি সবুজ পান্নাটা চুরি করিনি। উনি যাবার সময় অভিশাপ দিয়ে গেলেন, তোর সর্বনাশ হবে। হলও তাই, এখন বুঝতে পারছি সব। পরের বছর ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে গেল। মামলায় মামলায় প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেলুম। তারপর একটার পর একটা উটকো বিপদ! আমার স্ত্রী দরিয়াগঞ্জ বেড়াতে গিয়ে পদ্মায় স্নান করতে নেমেছেন। আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ডুবে গেলেন। বডিটাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এইভাবে একের পর এক...।' চাপা শ্বাস ফেলে চুপ করলেন শেঠমশাই।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'অমরবাবু এই পান্না-চুরির কথা জানতেন?'

'অমর তখন ছোট্ট। হর-র জন্মই হয়নি। তবে বড়ো হয়ে আমার মুখে শুনেছিল। ঘটনাটা তো অদ্ভুত।'

'বাচ্চু ফকির নিশ্চয় এতদিন বেঁচে নেই?'

'জানি না। তবে বেঁচে না থাকাই সম্ভব। বেঁচে থাকলে এখন বয়স নব্বইয়ের কম নয়। আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। তাঁর খোঁজে পরে বহুবার দরিয়াগঞ্জ গেছি। সব কথা বুঝিয়ে বলে ক্ষমা চাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু খোঁজ পাইনি।'

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'হরবাবু দরিয়াগঞ্জ গেলেন কেন?'

'মাঝে মাঝে যায়। ওর খেয়াল। বলে, ছবি আঁকতে যাচ্ছে। অবশ্য কিছু জমিজমা এখনও আছে ওখানে। হোসেন নামে একটা লোক আছে। সে-ই চাষবাস করে। আমার পৈতৃক বাড়িটাও দেখাশোনা করে। খুব বিশ্বাসী লোক।'

আমি বললুম, 'কর্নেল, আমার ধারণা, হরবাবুর সবুজ বল আঁকার সঙ্গে বাচ্চু ফকিরের হারানো সেই সবুজ পান্নার কী যেন একটা সম্পর্ক আছে।'

'কী সম্পর্ক?' শেঠমশাই সোজা হয়ে বসলেন আমার কথা শুনে।

বললুম, 'সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার আর কি! হারানো পান্নাটা ওঁর মনের ভেতর একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছে!'

শেঠমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী বলেন মাথামুণ্ডু নেই!'

কর্নেল হাসলেন, 'জয়ন্ত, ইদানীং তুমি বুঝি কোনো সায়েবের মনস্তত্ত্বের বই পড়তে শুরু করেছ?'

বললুম, 'এরিকসনের চাইল্ডহুড অ্যান্ড সোসাইটি বইটা পড়ছি। পড়ছি বলেই বুঝতে পারছি, এটা একটা অবসেশনঘটিত ব্যাপার। হরবাবুর মনে তাঁর বাবার ব্যাঙ্ক থেকে পান্নাচুরির ঘটনাটা একটা জোর ধাক্কা দিয়ে থাকবে। বাবা যে-জিনিসটা ফেরত দিতে

পারেননি, একটা পাপবোধে ভুগছেন যা নিয়ে, ছেলে বাবাকে সেই পাপবোধ থেকে মুক্তি দেবার আকাঙ্খাতেই ছবিতে বড়ো করে সবুজ পান্না আঁকেন। অবদমিত ইচ্ছার প্রকাশ।'

শেঠমশাই অবিকল হালদারমশাইয়ের ভঙ্গিতে বললেন, 'হিং টিং ছট! মাথামুণ্ডু নেই।'

কর্নেল চোখের ইশারায় আমাকে চুপ করতে বললেন। তারপর বললেন, 'শেঠমশাই, গোবিন্দ একরাত্রে ছাদে একটা সবুজ আলোর বল দেখেছিল। আপনি কখনো দেখেছিলেন কি?'

জোরে মাথা নেড়ে শেঠমশাই বললেন, 'নাঃ! কথাটা গোবিন্দের কাছেই শুনেছিলুম।'

কর্নেল দাড়িতে অভ্যাসমতো আঙুলের চিরুনি টানলেন কিছুক্ষণ। শেঠমশাই বালিশে হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইলেন। তারপর কর্নেল বললেন, 'আচ্ছা শেঠমশাই, অ্যালসেশিয়ানটা কি আপনিই পুষেছিলেন?'

শেঠমশাই চোখ না খুলে বললেন, 'আমি না, অমর। বাঙ্গালোর থেকে বদলি হয়ে আসার সময় ডনকে সঙ্গে এনেছিল। কুকুর-টুকুর আমার বরাবর অপছন্দ ছিল। কিন্তু ক্রমশ কুকুর সম্পর্কে আমার ধারণা বদলে দিয়েছিল ডন। খুব ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল দিনে দিনে। অমরের মৃত্যুর পর থেকে ডন আমার কাছে অমরের স্মৃতির প্রতীক। ব্যাপারটা আশা করি বুঝতে পারছেন?'

'পারছি,' কর্নেল বললেন, 'কিন্তু হরবাবুর সঙ্গে ডনের কেমন সম্পর্ক ছিল?'

শেঠমশাই বিরক্ত হয়ে চোখ খুললেন, 'অদ্ভুত প্রশ্ন হল না? বাড়িতে অমন একটা কুকুর থাকলে বাড়ির সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হরও ওকে ভালোবাসত।'

এতক্ষণে হালদারমশাই এলেন হন্তদন্ত হয়ে। বললেন, 'ওঁরা এসে গেছেন।'

নীচের হলঘরে একজন পুলিশ অফিসার আর রীতিমতো একটা পুলিশবাহিনী এসে হাজির। পুলিশ অফিসার কর্নেলের পরিচিত। কর্নেলকে নমস্কার করে মুচকি হেসে বললেন, 'মানুষ-খুন নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর কথা শুনেছি। কিন্তু কুকুর-খুন নিয়েও যে আপনি মাথা ঘামান, জানতুম না কর্নেল!'

কর্নেলের সঙ্গগুণে পুলিশি তদন্তের রীতিনীতি আমার জানা। এক ফাঁকে হালদারমশাইকে ডেকে নিয়ে বাইরে গেলুম। বাড়ির পুবদিকটায় পুরোনো বাগিচা জঙ্গল হয়ে আছে। সেখানে একটা ঝাঁকড়া অমলতাস গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বললুম, 'কী হালদারমশাই! কী থিয়োরি দাঁড় করালেন, বলুন?'

হালদারমশাই নাকে নস্যি গুঁজে বললেন, 'প্রচুর রহস্য!'

'হুঁ, রহস্য প্রচুর তো বটেই। কিন্তু আপনি কিছু সূত্র খুঁজে পেলেন?'

'হুঁউ, পেয়েছি বই কী,' হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন। 'ওই সায়েন্টিস্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে এই কুকুর-মারা কেসের সম্পর্ক আছে।'

'কেন বলুন তো?'

'সবুজ আলোর বল! তা ছাড়া উনিও সায়েন্টিস্ট, এ-বাড়ির তিনিও সায়েন্টিস্ট। অবশ্য উনি প্রেজেন্ট, তিনি পাস্ট। আমার ভয় হচ্ছে, চন্দ্রকান্তবাবুও না পাস্ট হয়ে যান।'

'পাস্ট! তার মানে?'

'ধাক্কা! রামধাক্কা এবং পাস্ট টেন্সে পরিণত হওয়া আর কি!'

'বুঝলুম না!'

হালদারমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ধুর মশাই! অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলছি। আপনার চন্দ্রকান্তবাবুও পেছন থেকে কখন আচমকা না ধাক্কা খান! ওঁকে সাবধান করে দেওয়া দরকার।'

কথাটা আমার মনে ধরল। বললুম, 'ঠিক বলেছেন। আর আপনি যে প্রচুর রহস্য বললেন, সেই ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য কিছুক্ষণ আগে শেঠমশাইয়ের কাছে পাওয়া গেছে। আপনাকে বলা উচিত।'

আসলে বাচ্চু ফকিরের পান্না চুরি যাওয়ার ঘটনাটা শুনে তখন থেকে আমি মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম। আগাগোড়া হালদারমশাইকে না জানিয়ে পারলুম না। গভীর মনোযোগে শুনতে শুনতে সেই মাদাগাস্কারের দাইদিয়েরিয়া গাছটার মতো সিধে ও লম্বাটে হালদারমশাইয়ের শরীর অষ্টাবক্র ক্যাকটাসটার মতো বেঁকে আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। কথা শেষ হতেই সটান ছিলে-ছিঁড়ে-যাওয়া ধনুকের মতো খাড়া হল। তারপর দেখলুম, উনি দ্রুত আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন। সরতে সরতে একেবারে গেটের কাছে গেছেন, তখন মুখে কথা বেরোল। ডাকলুম, 'হালদারমশাই! হালদারমশাই! কোথায় যাচ্ছেন?'

হালদারমশাই বক্রগতিতে পুলিশভ্যানের পাশ কাটিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটাকে পেরিয়ে গলিরাস্তায় জমে-ওঠা কৌতূহলী জনতার ভিড় ভেদ করে নিপাত্তা হয়ে গেলেন। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

কথাটা বলে ঠিক করেছি কি না বুঝতে পারছিলুম না। কর্নেল কী বলবেন কে জানে! উদবিগ্ন হয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে থাকলুম, হালদারমশাই এমন করে কোথায় গেলেন? সেই সময় হঠাৎ দৃষ্টি গেল বাড়িটার ভিতের কাছে একটা ঝোপের দিকে। ঝোপের ভেতর উজ্জ্বল রোদ্দুর পড়েছে চকরা-বকরা হয়ে। সেখানে কী একটা জিনিস ঝিকমিক করছে। কাছে গিয়ে দেখি একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। এমন ছোট্ট ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ কখনো দেখিনি। নিডলটাও খুব মিহি, এতটুকু। হেঁট হয়ে কুড়োতে যাচ্ছি, কর্নেলের গলা শুনে থমকে দাঁড়ালুম। সামনে একটু ওপরে একটা জানলায় কর্নেলের সান্তাক্লজ মুখ। 'ওখানে কী করছ জয়ন্ত?'

'একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, কর্নেল!'

'ছুঁয়ো না। আমি যাচ্ছি।'

একটু পরেই কর্নেল এবং সেই পুলিশ অফিসার এসে গেলেন। কর্নেল বললেন, 'সিরিঞ্জটা রুমালে জড়িয়ে নিন, মি. অধিকারী। সাবধান, ওতে আপনার আঙুলের ছাপ যেন না পড়ে। ওটা ফরেনসিক ল্যাবে পাঠাতে হবে।'

পুলিশ অফিসার হাসলেন, 'ওক্কে! তবে আমার মনে হয় না, এতে কারও আঙুলের ছাপ পাওয়া যাবে। হাতে গ্লাভস পরা ছিল নিশ্চয়। কুকুরকে ইঞ্জেকশন দিতে গেলে কামড় খাওয়ার ভয় আছে না?'

কর্নেল, অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'তবু পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তা ছাড়া ওতে কী বিষ ছিল, সেটাও জানা যাবে।'

পুলিশ অফিসার মি. অধিকারী সিরিঞ্জটা রুমালে জড়িয়ে হস্তগত করলেন। তারপর বললেন, 'আপাতত আমাদের কাজ শেষ। মর্গের রিপোর্ট যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়,

সে-চেষ্টাও করব। তবে আমার ধারণা, এটা স্রেফ ছবি চুরির কেস। আজকাল পেন্টিংয়ের কদর বেড়েছে। বেচলে খদ্দেরের অভাব হয় না। যা বিশ-পঞ্চাশ টাকা পাওয়া যায়, তাই চোরের লাভ।'

পুলিশ অফিসার চলে গেলে কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, 'হালদারমশাই কোথায়, জয়ন্ত?'

বললুম, 'হঠাৎ চলে গেলেন একটু আগে।'

কর্নেল আমার দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'পান্না-চুরির ব্যাপারটা ওঁকে বলেছ?'

'মানে... মুখ ফসকে বলে ফেলেছি।'

'সঙ্গেসঙ্গে উনি অভিযানে বেরিয়ে গেছেন!'

'কে জানে কোথায় গেলেন,' বিব্রতভাবে বললুম, 'বলা উচিত হয়নি, তাই না?'

কর্নেল হেসে ফেললেন, 'তুমিও হালদারমশাইয়ের চেয়ে কম যাও না, বরাবর লক্ষ করে আসছি। যাই হোক, আবার ভদ্রলোক কী বিপদে পড়বেন কে জানে! এসো, আর এখানে থেকে লাভ নেই। বাড়ি ফিরে চন্দ্রকান্তবাবুকে রিং করতে হবে।'

অ্যাম্বুলেন্সে কুকুরের মড়াটা এতক্ষণে ঢোকানো হচ্ছে। গাড়িবারান্দায় দু-জন পুলিশ কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। গোবিন্দকে দেখতে পেলুম না। মি. অধিকারী শেঠমশাইকে আশ্বাস দিচ্ছেন। কর্নেল শেঠমশাইয়ের উদ্দেশে হাত নেড়ে বললেন, 'চলি শেঠমশাই! পরে আসবখন।' শেঠমশাই কোনো কথা বললেন না। মনে হল, একটা পাথরের মূর্তি, নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। হাতের সেই নকশাদার মোটা ছড়ি বা লাঠিটাও যেন পাথরে গড়া।

গলিরাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলুম, 'হরবাবুর স্টুডিয়োতে কিছু সূত্র-টুত্র মিলল?'

আনমনে কর্নেল বললেন, 'কীসের?'

'চোর ও-ঘরে কেন ঢুকেছিল? খুঁজছিলই-বা কী?'

'বোঝা যাচ্ছে না। হরবাবু থাকলে বোঝা যেত, কিছু চুরি গেছে কি না।'

'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। চোর হলঘরে ঢুকল কেমন করে? দরজা বন্ধ থাকার কথা।'

'মাস্টারমশাই, মানে, তপোব্রতবাবু কোমল-কোরককে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে গেছেন,' কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'গোবিন্দ নীচে এসে দরজা বন্ধ করতে দেরি করেছিল বলল। সেই ফাঁকে চোর বা চোরেরা ঢুকে কোনো একটা ঘরে লুকিয়ে থাকতে পারে। নীচের সবগুলো ঘরে তো তালা দেওয়া থাকে না। কাল যেভাবে একটা ঘরে হালদারমশাই ঢুকে পড়েছিলেন, সেইভাবে কেউ বা কারা ভেতরে ঢুকে থাকবে।'

'কিন্তু ডন ছিল! হালদারমশাই ডনের পাল্লায় পড়েছিলেন। কিন্তু চোরকে ডন স্টুডিয়োর তালা ভাঙবার সুযোগ দিল কেন? তার আগেই সে চোরকে জব্দ করল না কেন?'

কর্নেল আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক ধরেছ। সেটাই ভেবে পাচ্ছি না।'

'আমার খুব সন্দেহ ওই হোঁতকামতো লোকটাকে।'

'গোবিন্দের কথা বলতে চাও তো?'

‘ঠিক ধরেছেন। গোবিন্দকে আমার ভালো লোক বলে মনে হয় না।’

‘কেন?’

‘পালোয়ান গুন্ডার মতো চেহারা, কেমন যেন হাবভাব। ঠিক বোঝাতে পারছি না!’

কর্নেল হাসলেন, ‘গোবিন্দ শেঠবাড়িতে ছেলেবেলা থেকে আছে, ডার্লিং! দরিয়াগঞ্জ থেকে শেঠমশাইয়ের বাবা ওকে কলকাতায় এনেছিলেন। গোবিন্দ একসময় এ-পাড়ায় কুস্তির আখড়া গড়েছিল। সবাই ওকে চেনে। আমিও বরাবর চিনি। তার কোনো বদনাম এ-পর্যন্ত কানে আসেনি।’

কর্নেলের তিন-তলার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছোলুম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। ষষ্ঠী জানাল, ‘ফোং-এর জ্বালায় অস্থির। খালি বলে, চন্দরকান্তবাবুকে ফোং করতে বলবে।’

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, ‘জয়ন্ত আজ তো রোববার। তোমার অফ-ডে না?’

‘হ্যাঁ। স্পেশাল রিপোর্টার হয়ে এই সুবিধেটি আদায় করেছি। এতকাল শুক্কুরবার অফ-ডে বরাদ্দ ছিল। কিন্তু আপনার হাসির কারণ কী?’

‘এ বেলা তোমার লাঞ্চের নেমন্তন্ন। শুধু একটাই শর্ত।’

‘শর্তে লাঞ্চের নেমন্তন্নে আমার আপত্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু শর্তটা জানা দরকার।’

‘তুমি চন্দ্রকান্তবাবুর সঙ্গে ফোনে বাক্যালাপ করবে।’

লাফিয়ে উঠলুম, ‘অসম্ভব। আপনিই বলেছেন, ভদ্রলোক আমার ওপর রেগে আগুন হয়ে আছেন। ফোনের ভেতর দিয়ে লেসার-অস্ত্র চালিয়ে আমাকে খতম করে ফেলবেন, ওঁর অসাধ্য কিছু নেই।’

ঠিক এইসময় দরজার ঘণ্টা বাজল। ষষ্ঠী গিয়ে দরজা খুলল এবং তার পাশ কাটিয়ে বেঁটে ডাগরডোগর কেউ ফুটবলের মতো এসে দমাস করে আমাদের সামনে পড়লেন।

স্বয়ং বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত!

আমি আঁতকে উঠে সোফার কোনায় সেঁটে গেলুম। কিন্তু চন্দ্রকান্তের মুখে জ্বলজ্বলে উল্লাস। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘কর্নেল! প্রবলেম সলভড! কেল্লা ফতে!’ তারপর আমার পাশে এসে ধপাস করে বসে খপ করে একটা হাত ধরে বললেন, ‘জয়ন্তবাবু! আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ!’

কর্নেল বললেন, ‘ব্যাপার কী চন্দ্রকান্তবাবু?’

বিজ্ঞানী খিক খিক করে হেসে বললেন, ‘ভাগ্যিস খবরটা জয়ন্তবাবু দৈনিক সত্যসেবকে ছেপে দিয়েছিলেন। সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স থেকে স্বয়ং ড. সতীশ চন্দ্র আমার বাড়িতে হাজির। সঙ্গে ওঁর পুরো টিম। বাঘা বাঘা এক্সপার্ট সব সায়েন্টিস্ট। কই, কফি বলুন!’

কর্নেল ষষ্ঠীকে ডেকে কফির কথা বললেন। তারপর চন্দ্রকান্তকে বললেন, ‘হুঁ, বলুন!’

চন্দ্রকান্ত চোখে ঝিলিক তুলে বললেন, ‘কনগ্রাচুলেশনের ঠেলায় অস্থির। সবুজ আলোটাকে হিমায়িত মিথেনে বন্দি করার জন্য যে লেসার-যন্ত্রটা তৈরি করেছি, সেটা দেখে তো ওঁদের চক্ষু চড়কগাছ। এ পর্যন্ত কোনো সায়েন্টিস্ট এতে সফল হননি, আমি হয়েছি।’

'বুঝলুম। কিন্তু কী প্রবলেম সলভড হল, বলুন।'

চন্দ্রকান্ত চাপা স্বরে বললেন, 'ওই সবুজ আলোটা, বুঝলেন? ওটা অমর আর তার স্ত্রীর উদ্ভাবিত ফর্মুলা থেকে তৈরি। ফর্মুলাটা চুরি করে কেউ সবুজ আলোর বল সৃষ্টি করছে আর আমার বাড়ির আনাচে-কানাচে রাতবিরেতে এসে হানা দিচ্ছে। কেমন তো? এখন প্রশ্ন হল, আমার ওখানে কেন? ড. চন্দ্র একটা থিয়োরি দিলেন। আমার ল্যাবে এমন কিছু মেটিরিয়াল আছে, যার ওপর সবুজ আলোর ওই বলের প্রতিক্রিয়া ঘটবে। ঘটলে কী হবে-না, সেই জিনিসটা মূল্যবান কোনো রত্নে পরিণত হবে। লক্ষ-লক্ষ টাকা দামের রত্ন।'

আমি চমকে উঠে বললুম, 'পান্না?'

'হুঁ, পান্না হতেও পারে,' চন্দ্রকান্ত সায় দিলেন, 'পান্নার রং সবুজ। আপনি ঠিক ধরেছেন।'

কর্নেল আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললেন, 'জয়ন্ত সাবধান! এ খবর ছেপে চন্দ্রকান্তবাবুর বিপদ বাড়িয়ো না।'

বুঝতে পারলুম, পান্নার কথাটা বলা ঠিক হয়নি। শুকনো হেসে বললুম, 'না, না। চন্দ্রকান্তবাবুর কাছে অনুমতি না নিয়ে আর কোনো খবর আমি ছাপব না।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ছাপলেই-বা কী? ধুন্ধুমার আবার ফর্মে এসে গেছে। তার হেলমেটে এবার একটা লেসারচালিত রিঅ্যাকটর বসিয়ে দিয়েছি। সবুজ আলোর লাইনে দাঁড়ালে আর ওর কোনো ক্ষতি হবে না। আলোটা পিছলে যাবে, বুঝলেন তো? যেই আসবে, অমনি সড়াৎ করে পিছলে যাবে।' খিক খিক করে হাসতে থাকলেন বিজ্ঞানী।

'বুঝলুম,' কর্নেল বললেন, 'কিন্তু আপনার ল্যাবে কী এমন জিনিস আছে, সবুজ আলোটার প্রতিক্রিয়ায় যা দামি রত্নে পরিণত হবে?'

বিজ্ঞানী বড়ো বড়ো চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'সেটাই খুঁজে পাচ্ছি না। ড. চন্দ্র এবং তাঁর দলবল ল্যাবে ঢুকে খুব খোঁজাখুঁজি করলেন। ওঁরাও বুঝতে পারলেন না। তবে আমিও চন্দ্রকান্ত চৌধুরী, সহজে হাল ছাড়িনি। ঠিকই খুঁজে বের করব দেখবেন।'

ষষ্ঠী কফি আনল। কফি খেতে খেতে চন্দ্রকান্ত আবার কিছু বলতে যাচ্ছেন, ওঁর বুকের কাছে হঠাৎ চাপা পিঁপিঁ আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে কফি রেখে বুকপকেট থেকে একটা সিগারেট-লাইটারের মতো জিনিস বের করলেন। দেখে নিয়ে বললেন, 'ধুন্ধুমার সন্দেহজনক কিছু দেখেছে। সিগন্যাল দিচ্ছে। আমার বরাত! সিন্থেটিক কফি খেয়ে মুখ তেতো হয়ে গেছে। ভাবলুম, আরাম করে কর্নেলের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে বিশুদ্ধ ন্যাচারাল কফি খাব, হল না।' বলেই উঠে পড়লেন এবং কিক-খাওয়া ফুটবলের মতো বাঁই করে বেরিয়ে গেলেন। দরজার পর্দাটা দুলতে থাকল।

কর্নেল উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। ফিরে এসে বললেন, 'কী বুঝলে, ডার্লিং?'

হালদারমশাইয়ের ভঙ্গিতে বললুম, 'প্রচুর রহস্য।'

'হ্যাঁ, রহস্য তো প্রচুর। কিন্তু তোমার কী মনে হচ্ছে?'

একটু ভেবে নিয়ে বললুম, 'বাবাকে পাপবোধ থেকে মুক্তি দেওয়ার তাগিদে হরবাবু যেমন সবুজ আঁকেন, অমরবাবুও একই তাগিদে সবুজ আলোর বল সৃষ্টি করে কৃত্রিম উপায়ে পান্না তৈরির চেষ্টা করতেন। অমরবাবুরই কোনো বিজ্ঞানী কলিগ সেই ফর্মুলা

হাতিয়ে সে-চেষ্টা করছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই বিজ্ঞানীই অমরবাবু আর তাঁর স্ত্রীর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

'কিন্তু আজ শেঠবাড়িতে যা ঘটেছে, তার ব্যাখ্যাটা কী?'

আবার খানিকটা ভেবে-চিন্তে বললুম, 'চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়িতে যে উদ্দেশ্যে সেই চোর-বিজ্ঞানী হানা দিচ্ছেন, হরবাবুর স্টুডিয়োতেও সেই একই উদ্দেশ্যে আজ হানা দিয়েছিলেন। তার মানে, পান্না তৈরির উপাদান হরবাবুর স্টুডিয়োতেও হয়তো আছে।'

কর্নেল এমন অট্টহাসি হাসলেন যে, ষষ্ঠী দরজার ফাঁকে উঁকি দিল। আমিও হকচকিয়ে গেলুম।

৪

কর্নেলের বাড়ি লাঞ্চ বা ডিনার খাওয়ার সুযোগ প্রায়ই ঘটে। তাঁর মতে 'ভোজনরসিক' হল সে, যে নিজে কম খায়, কিন্তু অপরকে বেশি খাওয়ায়। তার মানে, তিনিই নাকি যথার্থ ভোজনরসিক। সে-বেলা লাঞ্চে যে ভূরিভোজন হয়ে গেল, তার ধাক্কা সামলাতে সোফায় চিত হয়ে ছিলুম, ষষ্ঠী না ডাকলে রাত্তিরটাও পুইয়ে যেত। ষষ্ঠীর হাতে কফির পেয়ালা। কাঁচুমাচু হেসে বলল, 'ডাকব ডাকব করে পাঁচটা বেজে গেল দাদাবাবু। ঘুমোনো মানুষকে খামোকা জাগাতে ইচ্ছে করে না। তবে দিনের বেলা ঘুমোলে বড্ড গা ম্যাজম্যাজ করে। করছে না?'

হাই তুলে বললুম, 'করছে।'

'নিন দাদাবাবু, গরম গরম চুমুক দিন। শরিল কিলিয়ার হয়ে যাবে।'

কয়েক চুমুক কড়া গরম কফি সত্যি 'শরিল কিলিয়ার' করে দিচ্ছিল। বললুম, 'তোমার বাবামশাই কি ছাদের বাগানে?'

'আজ্ঞে না। বেইরেছেন।'

'কিছু বলে যাননি?'

'না তো!' বলে ষষ্ঠী ফিক করে হাসল, 'বলে গেছেন, দাদাবাবুকে যেন বিরক্ত করবিনে, যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমোক। কিন্তু সেটা কি ঠিক হয়, বলুন দাদাবাবু! আশ্বিন মাসের বিকেলে ঘুমোলে পরে শরিল...'

'কিলিয়ার হয় না?'

ষষ্ঠী বুঝতে পারে না ওকে নিয়ে ঠাট্টা করা হচ্ছে কি না। গম্ভীর হয়ে বলল, 'ওই হল আর কি! আমি কি আপনাদের মতো ইংরিজি জানি, না ইশকুলে পাশ দিয়েছি? বাবামশাইয়ের কাছে শুনে দু-চারটে শিখেছি।'

ওকে আর ঘাঁটালুম না। কফি শেষ করে বেরিয়ে পড়লুম। নীচের লনের একধারে পার্কিং স্পটে আমার গাড়িটা পার্ক করা ছিল। স্টার্ট দিয়ে বড়ো রাস্তায় পৌঁছে ঠিক করলুম, বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের কাছে যাওয়া যাক। ধুন্ধুমার কী সন্দেহজনক ব্যাপার দেখে সিগন্যাল দিচ্ছিল, জানা যাবে।

রবিবারেও যেখানে-সেখানে ট্রাফিকজ্যাম। চন্দ্রকান্তের বাড়ি পৌঁছোতে সন্ধ্যে সাড়ে ছ-টা বেজে গেল। ধুন্ধুমারের কথা ভেবে একটু ভয় করছিল। সবুজ আলোর পাল্লায় পড়ে গত রাতে ওর যা দশা হয়েছিল, এখন হয়তো খেপে আছে। বাইরের লোক দেখলেই তেড়ে আসবে এবং হালদারমশাইকে যেভাবে শূন্যে তুলে আছাড় মারতে যাচ্ছিল, আমাকেও গাড়িসুদ্ধু তুলে ছুড়ে মারবে। ভয়ের চোটে সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের আওড়ানো মন্ত্রটা মনে পড়ে গেল: 'ট্রিও ট্রাও ট্যাট!'

ঠিক আছে। মনে মনে তৈরি হয়ে হর্ন বাজালুম। কিন্তু ধুন্ধুমারকে দেখা গেল না। গেট আপনা-আপনি খুলে গেল এবং অদৃশ্য বিজ্ঞানীর সম্ভাষণ শোনা গেল, 'ওয়েলকাম, জয়ন্তবাবু! ওয়েলকাম!'

ভেতরে গাড়ি ঢুকিয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে তবে মাটিতে পা রাখলুম। গেটটা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে, চন্দ্রকান্ত কাল রাতের ঘটনার পর তাঁর এই বাড়িটিতে কিছু নতুন কলকবজা যুক্ত করেছেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গেটটাকে স্বয়ংক্রিয় করে দিয়েছেন।

বারান্দায় চন্দ্রকান্তের আবির্ভাব ঘটল। মুখে উজ্জ্বল হাসি, 'ল্যাবে বসে আপনাকে আসতে দেখেছিলুম। আপনাকে মানে আপনার গাড়িটাকে।'

'টেলিস্কোপ, নাকি সেই পেরিস্কোপে?'

'রেডারে। টেলিস্কোপ-পেরিস্কোপ ওসব সেকেলে জিনিস। এ যুগে অচল।' চন্দ্রকান্ত আমাকে খুব খাতির করে ঘরে ঢোকালেন। 'এ রেডার সাধারণ রেডার নয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে আকাশে আমার বাড়ির দুশো মিটারের মধ্যে যা-কিছু আনাগোনা করবে, আমি টের পাব। সে পিঁপড়ে হোক আর মশাই হোক।'

'এ এলাকায় তো প্রচুর মশা!'

আমার মন্তব্য শুনে চন্দ্রকান্ত একচোট হাসলেন, 'তাতে কী হয়েছে? মশা ইজ মশা। থাকগে, কর্নেলের খবর বলুন!'

'জানি না। আমি এলুম আপনার খবর জানতে। ধুন্ধুমার সন্দেহজনক কী দেখে সিগন্যাল দিচ্ছিল?'

'ধুন্ধু একটি গাড়লস্য গাড়ল! ষাঁড় দেখেই অস্থির।'

'গুঁতোতে এসেছিল বুঝি?'

'নাহ। কাঁটাতারের বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে শিং নাড়ছিল। ধুন্ধু কখনো ষাঁড় দেখেনি। কাজেই একটু গণ্ডগোলে পড়েছিল। ওদিকে ষাঁড়টার অবস্থাও তাই। সেও গণ্ডগোলে পড়েছিল। আমি এসে মিটমাট করে দিলুম।'

এইসব কথাবার্তার সময় বাইরে দু-বার শিস শোনা গেল। চন্দ্রকান্ত গ্রাহ্য করলেন না। বললুম, 'দেখে আসা উচিত। সবুজ আলোর বলটা...'

বিজ্ঞানী আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'লেসার-ল্যাসোটাও ধুন্ধুর মাথায় আটকে দিয়েছি। চিন্তার কারণ নেই।' বলে আমার দিকে ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর নড়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ, তখন কর্নেলের বাড়িতে আপনি পান্নার কথা বলছিলেন। তাই না?'

বহুবছর আগে শেঠমশাইয়ের ব্যাঙ্ক থেকে পান্না-চুরির ঘটনাটা কর্নেল সম্ভবত চন্দ্রকান্তকে বলতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ, হঠাৎ অমন করে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার এই মানেটাই দাঁড়ায়। কিন্তু এ মুহূর্তে কথাটা চন্দ্রকান্তকে খুলে বলা উচিত মনে হল। যদি চন্দ্রকান্ত কম্পিউটারের সাহায্যে এ রহস্যের সমাধান করতে পারেন, কাজ অনেকখানি এগিয়ে থাকবে।

আগাগোড়া ঘটনাটা শেঠমশাইয়ের মুখে যেমন শুনেছিলুম, সবটাই বললুম। তারপর আজ সকালে শেঠবাড়ির কুকুর-খুন এবং স্টুডিয়োতে চোরের হামলার ঘটনাও বর্ণনা করলুম। চন্দ্রকান্ত নোটবই বের করে কোনো সাংকেতিক ভাষায় অথবা শর্টহ্যান্ডে ব্যস্তভাবে নোট নিচ্ছিলেন। আমার কথা শেষ হলে উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। 'চলে আসুন! প্রচুর ডাটা পাওয়া গেল। কী রেজাল্ট বেরোয়, দেখা যাক।' বলে ল্যাবের দিকে পা বাড়ালেন।

ল্যাবে কম্পিউটারের সামনে বসে খটাখট চাবি টিপতে থাকলেন বিজ্ঞানী। আমি স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলুম। রং-বেরঙের বিচিত্তির খালি। কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটা রঙিন চতুষ্পদ প্রাণীকেও যেন দেখতে পেলুম, হয়তো সেই অ্যালসেশিয়ানটাই, যার নাম ছিল ডন। তারপর অসংখ্য ফুটকি, সোজা ও বাঁকা রেখা, জ্যামিতির ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ, 'স্কোয়ার-রুট নির্ণয় করো'-ধরনের অঙ্ক, এইসব জটিল ও মুণ্ডু-ঘুরিয়ে-দেওয়া ব্যাপারের পর একটা সবুজ আলোর বল ফুটে উঠল স্ক্রিনে। চন্দ্রকান্ত বললেন, 'দেখছেন?'

'দেখছি।'

'কী দেখছেন?'

'সবুজ আলোর বল।'

'ওটাই অমরের বাবার চুরি-যাওয়া পান্না!'

'তাই বুঝি?'

'হুঁ:!'

'কিন্তু ওটা এখন কোথায় কার কাছে আছে জানতে পারলেন কি?'

চন্দ্রকান্ত খুট করে আবার বোতাম টিপলেন। সবুজ আলোর বলটা ছিল ক্রিকেট বলের সাইজ, এবার লাফাতে লাফাতে মার্বেলগুলির সাইজে পরিণত হল। বিজ্ঞানী বললেন, 'অন্তত আড়াইশো কিলোমিটারের বেশি দূরে আছে জিনিসটা। আরও ডাটা পেলে বলা যেত, কার কাছে আছে।'

কম্পিউটারের সামনে থেকে উঠে এলেন চন্দ্রকান্ত। এই সময় ল্যাবের কোনার দিকে ব্লিপ ব্লিপ শব্দ শোনা গেল। সেদিকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর ঘোষণা করলেন, 'জয়ন্তবাবু। আপনার ওল্ড বস আসছেন।'

'কর্নেল আসছেন?'

'হ্যাঁ। আসুন, ওঁকে রিসিভ করা যাক।'

স্বয়ংক্রিয় ফটকটি খুলে গেল। কর্নেলের লালরঙের গাড়িটা ঢুকতে দেখলুম। চন্দ্রকান্ত দৌড়ে গিয়ে বললেন, 'ওয়েলকাম কর্নেল! ওয়েলকাম! এতক্ষণ আপনার কথাই ভাবছিলুম।'

কর্নেল গাড়ি থেকে বেরোলেন। মুখটা বেজায় গম্ভীর। আমাকে এখানে দেখেই কি? একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু উনি বারান্দায় উঠে আমাকে আস্তে বললেন, 'তোমাকে ফোন করেছিলুম। যা ভেবেছিলুম, তা-ই ঘটেছে।'

চমকে উঠলুম, 'কী ঘটেছে?'

'এসো, বলছি।'

চন্দ্রকান্ত বোধকরি সিন্থেটিক কফি-পকৌড়া দিয়ে কর্নেলকে আপ্যায়নের জন্য পা বাড়াচ্ছিলেন, কর্নেল বললেন, 'বসুন চন্দ্রকান্তবাবু! কথা আছে।'

চন্দ্রকান্ত সঙ্গেসঙ্গে ধুপ করে বসে বললেন, 'পান্না সম্পর্কে তো? একটু আগে জয়ন্তবাবুর কাছে সব ডাটা নিয়ে কম্পিউটারে ফিড করিয়ে দেখলুম, চুরি যাওয়া পান্নাটা অন্তত আড়াইশো কিলোমিটারের বেশি দূরে লুকোনো আছে।'

কর্নেল তেমনি গম্ভীরমুখে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। দরিয়াগঞ্জেই কোথাও লুকোনো আছে। কিন্তু সেই লুকিয়ে-রাখা পান্নাটার দাবিতে আজ কোমল-কোরককে কেউ বা কারা সত্যিই চুরি করেছে।'

চন্দ্রকান্ত সোজা হয়ে বসলেন। আমি হাঁ করে তাকিয়ে ছিলুম। বললুম, 'সে কী! ওরা তো সকালে ওদের মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েছিল!'

কর্নেল বললেন, 'সন্ধ্যে অবধি ওরা ফিরছে না দেখে শেঠমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তারপর থানায় খবর দিয়েছিলেন। আমি গিয়েছিলুম ড. সতীশ চন্দ্রের বাড়ি। ফিরে এসে শুনি, গোবিন্দ ডাকতে এসেছিল। তখনই শেঠমশাইয়ের বাড়ি চলে গেলুম। লেটার বক্সে একটা চিঠি পাওয়া গেছে দেখলুম। হাতের লেখা কিন্তু কোরকেরই, এটাই আশ্চর্য! চিঠিতে লেখা আছে, 'আগামী রবিবারের মধ্যে দরিয়াগঞ্জের কালীমন্দিরে পান্নাটা পৌঁছে না দিলে কো-২-কে বলি দেওয়া হবে। ইতি, হাহা-হুহু'।'

'ওই প্রাইভেট টিউটর লোকটিরই কীর্তি!'

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন, 'আপাতদৃষ্টে সেটাই পুলিশের ধারণা। মাস তিনেক হবে তপোব্রতবাবু শেঠ বাড়িতে টিউশনি করছেন। শেঠমশাই নাতিদের প্রাইভেট টিউটর রাখার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। অনেক দরখাস্ত এসেছিল। সেটা স্বাভাবিক। আজকাল দেশে অসংখ্য শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে বেকার। যাই হোক, তপোব্রতকে পছন্দ হয়েছিল শেঠমশাইয়ের। পছন্দ হওয়ার একটা কারণও শুনলুম। তপোব্রতের সংস্কৃত ভাষাতেও নাকি একটা ডিগ্রি আছে। শেঠমশাই এদিকে সংস্কৃত প্রচার সমিতির সভাপতি।'

দেখলুম, চন্দ্রকান্ত নোটবই বের করে নোট করছেন। হিজিবিজি আঁচড়। বললুম, 'লেটার বক্সটা গেটেই দেখেছি মনে হচ্ছে। কিন্তু পুলিশ পাহারা ছিল তো আজ। তাদের চোখ এড়িয়ে...'

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, 'কেউ লেটার বক্সে চিঠি ঢোকাতে এলে পুলিশ বাধা দেবে কেন? কিন্তু কথাটা হল, যে দু-জন কনস্টেবল গেটে পাহারা দিচ্ছিল, তারা কাউকে লেটার বক্সে চিঠি ঢোকাতে দেখেনি। তার মানে, চিঠিটা পুলিশ, এমনকী, আমরা শেঠবাড়ি যাওয়ার আগে থেকেই লেটার বক্সে ছিল।'

'তপোব্রত কোমল-কোরককে নিয়ে বেরোনোর সময় চিঠিটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল লেটার বক্সে।'

কর্নেল একটু হাসলেন, 'পুলিশের তাই ধারণা। কিন্তু ওই সময় কোমল-কোরকের সামনেই হরবাবুর স্টুডিয়োর তালা ভাঙা, ডনকে ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলা, ছবি তছনছ করে কিছু খোঁজা, এসব সাংঘাতিক কাজ তপোব্রত করেছে বলে মনে হয় কি তোমার?'

'সে নিজে করেনি। সে ওদের নিয়ে বেরিয়ে গেছে। তারপর তার স্যাঙাতরা ঢুকেছে। গোবিন্দ ওপরে ব্যস্ত ছিল কোনো কাজে। সে নীচের হলঘরের দরজা বন্ধ করতে আসার আগেই তপোব্রতের স্যাঙাতরা ওই কাজগুলো করেছে। ডন বাধা দিতে এসেছিল। তাই তাকে বিষাক্ত ইঞ্জেকশন দিয়ে মেরে ফেলেছে।'

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'পুলিশের থিয়োরির সঙ্গে তোমার থিয়োরি মিলে যাচ্ছে, জয়ন্ত।'

'কিন্তু আপনার থিয়োরি কী?'

'আপাতত কিছু দাঁড় করানো যাচ্ছে না। কারণ,' কর্নেল একরাশ নীল ধোঁয়ার ভেতর বললেন, 'কারণ শেঠমশাইকে অবিশ্বাস করতে বাধছে। তিনি পঞ্চাশ বছর আগে চুরি-যাওয়া পান্নার কোনো হদিশ পাননি।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'অথচ কিডন্যাপাররা সেই পান্নাটা তাঁর কাছেই দাবি করেছে! বড্ড বেয়াড়া লোকগুলো তো!'

বললুম, 'কর্নেল! কিছুক্ষণ আগে আপনি বলেছেন, হারানো পান্নাটা দরিয়াগঞ্জেই কোথায় লুকোনো আছে।'

কর্নেল টুপি খুলে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'বলেছি!'

'তাহলে নিশ্চয় কোনো সূত্র পেয়ে গেছেন?'

'পেয়েছি।'

অধীর হয়ে বললুম, 'খুলে বলতে অসুবিধেটা কী?'

কর্নেল সুর করে এই অদ্ভুত ছড়াটা আওড়ালেন:

'দুই ডাক বাট
উত্তরে হাঁট
ঘাটে মহাবল
তার নীচে জল
ওইখানে থাম
সিদ্ধ মনস্কাম।।'

চন্দ্রকান্ত খিক খিক করে হেসে বললেন, 'কী অদ্ভুত! কী অদ্ভুত!'

বললুম, 'ব্যাপারটা জট পাকিয়ে দিলেন দেখছি! হঠাৎ কোত্থেকে এই উদ্ভুট্টে ছড়া এসে গেল!'

কর্নেল বললেন, 'ছড়াটা কোরকের খাতায় লেখা ছিল।'

'শেঠমশাইকে দেখিয়েছেন?'

'না। এ সময় ওঁর যা মনের অবস্থা, নাতির খাতায় লেখা এই আজব ছড়াটা দেখানো উচিত মনে করিনি।'

'কিন্তু হারানো পান্নাটা দরিয়াগঞ্জে আছে, সেটা কী করে বুঝতে পারলেন?'

'এই ছড়া থেকে।'

হকচকিয়ে গেলুম শুনে। চন্দ্রকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দু-মিনিট সময় দিন। ডাটাগুলো কম্পিউটারে ফিড করিয়ে দেখি, কী বেরোয়।'

কর্নেল বললেন, 'সে পরে হবেখন। এবার শুনুন, আপনার কাছে দৌড়ে এসেছি...'

চন্দ্রকান্ত বাধা দিয়ে বললেন, 'আমার কাছে তো এসেছেনই। এ আর নতুন কথা কী হল? কেন এসেছেন, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।' বলে নোটবই খুলে কলম বাগিয়ে ধরলেন।

কর্নেল বললেন, 'আপনি তো অমরবাবু এবং তাঁর স্ত্রীকে চিনতেন?'

'বাঙ্গালোরে ওরা আমার কলিগ ছিল, আগেই বলেছি।'

'ত্রিভুবন দাশ নামে ওঁদের এক বন্ধু ছিলেন। চিনতেন তাঁকে?'

চন্দ্রকান্ত তেতোমুখে বললেন, 'চোর! এক নম্বর চোর। ইউরেনিয়াম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। সায়েন্টিস্টকুলের কলঙ্ক।'

'ত্রিভুবনবাবু কী নিয়ে রিসার্চ করতেন জানতেন কি?'

চন্দ্রকান্ত বাঁকা হাসলেন, 'ওর আবার রিসার্চ! ধাতুবিজ্ঞানে কী যেন একটা ডিগ্রি ছিল মনে পড়ছে। ওই পর্যন্তই। অমর আর তার বউ কেন যে ওকে পাত্তা দিত কে জানে? প্রায়ই দেখতুম, তিন জনে একখানে বসে আড্ডা দিচ্ছে। আমাকে দেখলেই চুপ করে যেত।'

'কলকাতায় আসার পর ত্রিভুবনবাবুর সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়েছিল কি?'

'মাথা খারাপ! ওই চোরকে আমি পাত্তা দেব ভাবছেন?'

'আহা, দেখা হয়েছিল কি না?'

'হয়েছিল মনে পড়ছে। তবে দূর থেকে।' চন্দ্রকান্ত তর্জনী তুলে হিসেব দিলেন, 'একশো মিটার দূর থেকে।'

'কতদিন আগে?'

চন্দ্রকান্ত স্মরণ করার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'মাস তিন-চার আগে। চৌরঙ্গিতে ভিড়ের ভেতর দেখা। দেখেই সঙ্গেসঙ্গে সরে গেলুম। চোর! চোর!'

বললুম, 'ত্রিভুবনবাবুর কথা কীভাবে জানলেন, কর্নেল?'

'অমরবাবুর নামে কলকাতার ঠিকানায় লেখা একটা চিঠি থেকে,' কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আচ্ছা চন্দ্রকান্তবাবু, খনিজ রত্ন থেকে এমন কিছু কি তৈরি করা সম্ভব, যা হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও ভয়ংকর শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে?'

বিজ্ঞানী হাসলেন, 'পারেই তো। ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, এ সবই তো খনিজ ধাতু। রত্নও বলতে পারেন। তবে সাংঘাতিক রত্ন। কারণ এগুলো তেজস্ক্রিয়। এরাই পারমাণবিক বোমার উপাদান। তবে সাধারণ খনিজ রত্ন, যেমন ধরুন হিরে, পান্না, এরা তেজস্ক্রিয় নয়। কিন্তু তেজস্ক্রিয় না হলেও এদেরও এক ধরনের বিকিরণ ঘটে। নির্দোষ বিকিরণ। এখন

কথা হল, বিকিরণ মানে রশ্মি নির্গমন। কোনো উপায়ে কেউ যদি মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয় রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে সেই সাধারণ রশ্মিকে বন্দুকের ট্রিগার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, কেন্দ্রীভূত মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে মারাত্মক বিক্রিয়া শুরু হবে। পৃথিবী ঝলসে পুড়ে চাঁদের অবস্থা হবে। নিষ্প্রাণ, কঠিন, মড়ার খুলির মতো ভয়ংকর!'

শুনে শিউরে উঠলুম। চন্দ্রকান্তের মুখে নিষ্ঠুর একটা ভাব। কর্নেল খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার বললেন, 'ড. সতীশ চন্দ্র বলছিলেন, কৃত্রিম উপায়ে পান্না তৈরি করাও সম্ভব।'

'আমাকেও বলেছেন,' চন্দ্রকান্ত সায় দিলেন, 'আমিও চেষ্টা করে দেখব ভাবছি। কিন্তু সমস্যা হল, অমর ও সবিতার যুগান্তকারী ফর্মুলাটা জানতে পারলে সবুজ আলোর বল তৈরি করা সহজ হত। ওটাই তো প্রথম ধাপ। তাই না? দেখা যাক।'

'সবুজ আলোর বলটা আপনার বাড়ির আনাচে-কানাচে এসে উঁকি দিচ্ছে। ওটাই পাকড়াও করে ফেলুন।'

'এসে দেখুক না আর এক বার। ধুন্ধু তৈরি হয়েই আছে।'

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন, 'চলি চন্দ্রকান্তবাবু!'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ডাটাগুলো কম্পিউটারে ফিড করিয়ে দেখি, আসুন না ল্যাবে! যদি ছেলে দুটোর কোনো হদিশ বেরিয়ে আসে।'

'বেরোলে আমাকে ফোনে জানিয়ে দেবেন। আমার একটু তাড়া আছে।'

কর্নেলের সঙ্গে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। চন্দ্রকান্ত হাত নেড়ে বিদায় জানালেন। কর্নেলের গাড়ি আগে, আমার গাড়ি পেছনে। ভি.আই.পি. রোড হয়ে উলটোডিঙির মোড়ে পৌঁছোলে, এদিক-সেদিক থেকে একঝাঁক গাড়ি এসে আমাদের দু-জনকে আলাদা করে ফেলল। তারপর আর কর্নেলের লাল গাড়িটা দেখতে পেলুম না।

ইলিয়ট রোডে কর্নেলের বাড়ির গেটের কাছে গাড়ি থামিয়ে ভেতরের পার্কিং স্পট খুঁটিয়ে দেখলুম। কোনো লাল রঙের গাড়ি নেই। এখনও পৌঁছোননি! মিনিট পনেরো অপেক্ষা করার পর বিরক্ত হয়ে নিজের ডেরায় ফিরে চললুম। মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করছে।

রাত এগারোটায় একটা জমজমাট বিলিতি ভূতের গল্পের বই পড়ছি, কারণ বিকেলের ঘুমটা রাতের ঘুমকে পণ্ড করেছে, সেই সময় ফোন বাজল। বিরক্ত হয়ে ফোন তুলে বললুম, 'রং নাম্বার!'

'রাইট নাম্বার, ডার্লিং!'

'সরি, কর্নেল!'

'আমিও দুঃখিত, জয়ন্ত! তোমাকে ভিড়ে হারিয়ে ফেলেছিলুম।'

'বাজে কথা। ইচ্ছে করেই কেটে পড়েছিলেন। যাকগে, বলুন, কী ব্যাপার?'

'জয়ন্ত একটু আগে দরিয়াগঞ্জ থেকে হালদারমশাই ট্রাঙ্ক কল করেছিলেন!'

'বলেন কী! উনি দরিয়াগঞ্জ চলে গেছেন?'

'আমরাও যাচ্ছি। আমি এবং তুমি। সকাল সাতটায় এসপ্ল্যানেডের বাস-স্টেশনে দরিয়াগঞ্জের বাস ছাড়ে, তুমি সাড়ে ছ-টার মধ্যে অবশ্য পৌঁছোবে ওখানে।'

‘কিন্তু ব্যাপারটা কী?’

‘প্রচুর রহস্য, ডার্লিং! প্রচুর রহস্য।’

ফোন রাখার শব্দ হল। বুঝলুম, আর মুখ খোলানো যাবে না। ফোন নামিয়ে ভূতের গল্পে চোখ রাখলুম, কিন্তু আর জমল না। বিলিতি ভূতটা সবুজ আলোর বলটার তাড়া খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

এরপর ঘুম আসা আর সম্ভব নয়। রহস্যটা আমাকে পেয়ে বসল। রহস্য সত্যি প্রচুর। যত সাংঘাতিক, তত জটিল। চিত হয়ে শুয়ে জট ছাড়ানোর চেষ্টা করতে থাকলুম।

হুঁ, তপোব্রত সেই ইউরেনিয়াম-চোর ধাতুবিজ্ঞানী ত্রিভুবন দাশেরই চেলা। ত্রিভুবন দাশ তাকে শেঠবাড়িতে পাঠিয়েছিল বাচ্চু ফকিরের হারানো পান্নার খোঁজে। এখানেই সন্দেহ জাগছে, শেঠমশাই কর্নেলকে সম্ভবত পুরো সত্যি কথাটা বলেননি। পরে কোনো উপায়ে পান্নাটা উদ্ধার করেছিলেন। সেটা বাচ্চু ফকিরকে হয়তো ফেরত দেবার ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু আর তার খোঁজ পাননি। তার খোঁজ না পাওয়ার কথা আমার সামনেই শেঠমশাই বলেছিলেন কর্নেলকে। চন্দ্রকান্তের বাড়িতে কর্নেল বললেন, পান্নাটা দরিয়াগঞ্জেই কোথাও লুকোনো আছে এবং কোরকের খাতায় লেখা ছড়াটা থেকে তার সূত্র পেয়েছেন।

তার মানে দাঁড়াচ্ছে, দাদু নাতিদের ওই ছড়াটা শিখিয়েছিলেন, যাতে ওরা বড়ো হয়ে ছড়াটার সাংকেতিক সূত্র ধরে পান্নাটা উদ্ধার করতে পারে। কোরক ভুলে যাওয়ার ভয়ে বুদ্ধি করে ওটা খাতায় লিখে রেখেছিল।

বাঃ! আমার থিয়োরির সঙ্গে বাস্তব ঘটনাগুলো চমৎকার মিলে যাচ্ছে।

ত্রিভুবন দাশ অমরবাবুর কাছেই হারানো পান্নার ব্যাপারটা শুনে থাকবেন। ওইরকম একটা প্রকাণ্ড পান্না তাঁর দরকার ছিল। অমরবাবু নিশ্চয় টের পেয়েছিলেন, তাঁর বাবা পরে পান্নাটা উদ্ধার করে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। দৈবাৎ মুখ ফসকে বলে থাকবেন ধাতুবিজ্ঞানীকে।

দারুণ মিলে যাচ্ছে আমার থিয়োরি। কর্নেলকে বলতে হবে।

এখন কথাটা হল, ত্রিভুবন দাশ তপোব্রতের সাহায্যে কোমল-কোরককে কিডন্যাপ করলেন কেন? না সেই পান্নার দাবিতে। তার মানে, তপোব্রত কোরকের খাতায় ছড়াটা দেখে থাকবে। কিন্তু ওটার মর্ম বোঝেনি। হুঁ, ব্যাপারটার ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করার জন্যই সে কোমল-কোরককে দিয়ে কর্নেলের ছাদের বাগানে গুলতিতে বাঁধা চিরকুট ছুড়ে মারার ব্যবস্থা করেছিল। যাতে কিনা, সত্যি সত্যি কিডন্যাপ করা হলেও ব্যাপারটা কর্নেল নিছক তামাশা ভেবে নাক গলাতে যাবেন না এবং কিডন্যাপার কোমল-কোরককে লুকিয়ে রাখার জন্য প্রচুর সময় পাবে।

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কীর্তিকলাপ ত্রিভুবন দাশ আর তপোব্রতের জানা। তাই এই ফন্দিফিকির। শেঠবাড়িতে কর্নেল যাতায়াত করেন মাঝে মাঝে। কাজেই ওঁরা সাবধানে এগোচ্ছিলেন লক্ষ্যের দিকে।

এখন বাকি রইল দুটো রহস্য। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের বাগানে রাতবিরেতে সবুজ বলের আবির্ভাব এবং হরবাবুর স্টুডিয়োতে হানা।...

অনেক ভেবেও এ-দুটোর জট ছাড়াতে পারলুম না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, রাত দুটো বাজে। টেবিলবাতির সুইচ অফ করে চোখ বুজলুম। কিন্তু সবুজ আলোর বলটা এসে আটকে গেছে চোখের ভেতর। খুব লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। কী ঝামেলায় পড়া গেল!

তারপর সত্যিই ঘুমিয়ে গেছি কি না, বলতে পারব না। ফোনের বিরক্তিকর শব্দে তড়াক করে উঠে বসলুম এবং ফোন তুলেই অভ্যাসমতো বললুম, 'রং নাম্বার!'

'রাইট নাম্বার, ডার্লিং!'

'সরি, কর্নেল! আবার কী হল?'

'ছ-টা বাজে। উঠে পড়ো। না, না। আর শোওয়া নয়। রেডি হও। ট্যাক্সি করে যাওয়ার পথে তোমাকে বরং তুলে নিয়ে যাব।'

আধ ঘণ্টা পরে কর্নেলের সঙ্গে ট্যাক্সিতে এসপ্ল্যানেডের দিকে যেতে যেতে বললুম, 'হালদারমশাই ট্রাঙ্ক কলে কী কথা জানিয়েছেন যে, শোনামাত্র এভাবে ছুটে চলেছেন?'

'ট্রাঙ্ক কল না করলেও যেতুম, ডার্লিং!'

'নাহয় যেতেনই। কিন্তু হালদারমশাইয়ের কথাটা কী?'

'বাঘ।'

অবাক হয়ে বললুম, 'বাঘ মানে? হালদারমশাই দরিয়াগঞ্জে বাঘ দেখেছেন নাকি?'

'তা-ই তো বললেন।'

'ধরে নিচ্ছি, দরিয়াগঞ্জে জঙ্গল আছে, বাঘও থাকতে পারে। হালদারমশাই সেই বাঘ দেখে থাকতেও পারেন। কিন্তু বাঘের সঙ্গে এই কেসের সম্পর্ক কী?'

'খুব গভীর সম্পর্ক আছে, জয়ন্ত!'

'খুলে বলুন!'

মুখ দেখে বুঝলুম, গোয়েন্দাপ্রবর আপাতত আর কথা বাড়াতে রাজি নন। চুরুটের ধোঁয়ার ভেতর সান্তাক্লজ-সদৃশ মুখটি ঢাকা পড়েছে। চোখ দুটো বন্ধ।

আট ঘণ্টার বাসজার্নি শুনে ভড়কে গেলুম। টিকিট কেটে এনে বললুম, 'নিজেদের গাড়িতে গেলে জার্নিটা আরামদায়ক হত। এইসব দূরপাল্লার বাসের অবস্থা আপনার জানা নেই। আমি জানি। কারণ, প্রথম সাংবাদিক জীবনে এইসব বাসে চেপেই দূরের খবর সরেজমিন তদন্ত করে আনতে হয়েছে আমাকে। তার ওপর ইদানীং তো দুর্ঘটনা লেগেই আছে। আমার বড্ড অস্বস্তি হয় বাসে চাপলে।'

কর্নেল কোনো মন্তব্য করলেন না। বুকের ঝুলন্ত বাইনোকুলারটি চোখে রেখে মনুমেন্টের মাথায় কী যেন দেখতে ব্যস্ত হলেন। তারপর তেতো মুখে বললেন, 'আজকাল কাকেদের বড্ড বাড় হয়েছে। মনুমেন্টের মাথায় কাকের ঝাঁক। কী অবিশ্বাস্য স্পর্ধা, ডার্লিং! এরপর দেখবে, রাইটার্স বিল্ডিংসেও ঝাঁকে ঝাঁকে গিয়ে হানা দিয়েছে। আমার মতো টেকো লোকদের পক্ষে সে এক বিপজ্জনক ঘটনাই বলা চলে। বাই দা বাই, জয়ন্ত, তুমি তো রাইটার্সে যাও-টাও খবর আনতে। কোন কোন মন্ত্রীর টাক আছে, একটা তালিকা দিয়ো তো আমাকে। ওঁদের সাবধান করে দেব, যাতে ওঁরা টুপি পরে দফতরে যান।'

দরিয়াগঞ্জগামী বাসটিতে একজন-দু-জন করে যাত্রী উঠতে শুরু করেছে। সব সিটই রিজার্ভ করার ব্যবস্থা আছে। আমাদের সিট নম্বর পাঁচ আর ছয়। সামনে তিন আর চার। তিন নম্বরের লোকটি টিকিট কাটার সময় কিউতে আমার সামনেই ছিল। কেমন যেন চেহারা, গোঁফ, গালপাট্টা, জুলজুলে চাউনি, গাট্টাগোট্টা গড়ন। বাস ছাড়ার সময় এখনও

হয়নি। সে জানলার ধারে বসে সেই জুলজুলে চাউনিতে আমাদের দেখছিল। আমরা তখনও বাসে উঠিনি। পাশেই দাঁড়িয়ে আছি। লক্ষ করলুম, যতবার চোখে চোখ পড়ছে, চাউনি সরিয়ে নিচ্ছে। ভাবলুম, কর্নেলকে কথাটা বলি। কিন্তু উনি কাক-কাক করে মেতে উঠেছেন। আসলে ওঁর বাড়ির পাশের নিম গাছে রাজ্যের কাকের আড্ডা। কাকেদের পার্লামেন্ট বলা যায়। ষষ্ঠীর কাছে শুনেছি, ভুল করে খালি মাথায় কর্নেল তাঁর শূন্যোদ্যানে গিয়ে ঠোকর খান। কাজেই কাক তাঁর চক্ষুশূল হতেই পারে। কিন্তু লোকটা অমন করে তাকাচ্ছে কেন? খুব সন্দেহজনক এবং অস্বস্তিকর ব্যাপার।

৫

বাস-বেচারার দোষ নেই, রাস্তার যা অবস্থা! ঝাঁকুনির চোটে হাড়ের গিঁট ঢিলে হয়ে যাচ্ছিল। তারই মধ্যে কখন দিব্যি একখানা ঘুমও দিয়ে নিয়েছিলুম। কর্নেলের ডাকে সোজা হয়ে বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। কর্নেল বললেন, 'এসে গেছি। তবে এক ঘণ্টা লেট।'

সামনের তিন নম্বর সিটের সন্দেহভাজন লোকটিকে দেখতে পেলুম না। বাস থেকে নেমে কর্নেলকে তার কথা জিজ্ঞেস করলে মুচকি হেসে বললেন, 'ছ-কিলোমিটার দূরে আগের স্টপে নেমে গেছে। কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, হালদারমশাইয়ের এখানে অপেক্ষা করার কথা। কোথায় তিনি?' :

মফস্সল শহরে বাসস্ট্যান্ড যেমন হয়। চারদিকে ঠাসাঠাসি দোকানপাট, যানবাহনের গুঁতোগুঁতি, এলোপাতাড়ি ভিড় আর চ্যাঁচামেচিতে তুলকালাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এবং এদিকে-ওদিকে আঁতিপাঁতি খোঁজাখুঁজি করেও গোয়েন্দাভদ্রলোকের গোঁফের ডগাটুকুও আবিষ্কার করা গেল না। কর্নেলের মুখে উদবেগ লক্ষ করে বললুম, 'নিশ্চয় কোনো বিপদে পড়েছেন। হালদারমশাইয়ের যা নাক গলানো স্বভাব!'

কর্নেল বললেন, 'হুঁ, বাঘের পেটে যাওয়াও অসম্ভব নয়।'

'বাঘ!' চমকে উঠলুম। তারপর মনে পড়ল, গত রাতে কর্নেল টেলিফোনে হালদারমশাইয়ের বাঘ দেখার কথা বলছিলেন বটে। বললুম, 'দরিয়াগঞ্জে বাঘ আছে নাকি?'

'আছে।'

'কিন্তু বাঘ তো জঙ্গলে থাকে!'

'দরিয়াগঞ্জেও জঙ্গলের অভাব নেই,' বলে কর্নেল একটা সাইকেল-রিকশো ডাকলেন। বললেন, 'প্যালেস হোটেলে যাব।'

রিকশোয় যেতে যেতে বললুম, 'প্যালেস হোটেল শুনে মনে হচ্ছে এই এঁদো শহরেও ফাইভ স্টার হোটেল আছে!'

কর্নেল হাসলেন, 'দরিয়াগঞ্জ খুব বনেদি জায়গা, জয়ন্ত। নবাবি আমলে সুবা বাংলা-বিহার-ওড়িশার বড়ো বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। পদ্মা সেই পুরোনো ঐতিহাসিক শহরের প্রায় অর্ধেকটা গিলে খেয়েছে। তবে আড়াইশো বছরের পুরোনো একটা পাথরের প্রাসাদ

এখনও টিকে আছে। তার ভোল ফিরিয়ে এক জৈন ব্যবসায়ী হোটেল করেছেন। দরিয়াগঞ্জ টুরিস্ট স্পট হিসেবেও বিখ্যাত।'

'এই অখাদ্য জায়গায় টুরিস্টরা কী দেখতে আসে?'

'পদ্মার সৌন্দর্য। তা ছাড়া ঐতিহাসিক নিদর্শনও প্রচুর।' কর্নেল রিকশোওয়ালার কান বাঁচিয়ে চাপা স্বরে এবং মিটিমিটি হেসে বললেন, 'তবে তোমাকে জানানো উচিত, বেশিরভাগ টুরিস্টই ছদ্মবেশী স্মাগলার। এটা সীমান্ত এলাকা। পদ্মা পেরোলেই বাংলাদেশ। তবে আসল কথাটা হল, আজকাল যেখানে সীমান্ত, সেখানেই স্মাগলারদের দাপট।'

বাজার এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে বাঁ-দিকে তাকাতেই পদ্মার দেখা পেলুম। সত্যিই মুগ্ধ হবার মতো বিশাল সুন্দর এক নদী। বুকে কোথাও সবুজ দ্বীপের মতো চর, কোথায় সোনালি কাছিমের খোলের মতো ধু-ধু বালিয়াড়ি। কর্নেলকে চোখে বাইনোকুলার তুলে নিতে দেখলুম। কী দেখছেন, বোঝা গেল। কাছে ও দূরে বুনো হাঁসের ঝাঁক ওড়াউড়ি করছে। কালো, দীর্ঘ আর বাঁকা একটা রেখা মাঝে মাঝে আকাশ থেকে চাবুকের মতো এসে শপাং করে নীলচে জলে আছড়ে পড়ছে। শরতে সবে মরশুমি হাঁসের ঝাঁক আসতে শুরু করেছে। ওপারটা আবছা। জল আকাশ ছুঁয়েছে বলে মনে হয়। সব মিলিয়ে এ-যেন সমুদ্র আর মরুভূমির আজব সহাবস্থান।

ডাইনে বসতি এলাকা। পুরোনো জীর্ণ বাড়ির ভেতর নতুন ঝকমকে সব বাড়ি। একাল-সেকাল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে বসতি এলাকা শেষ হল। বাইনোকুলার নামিয়ে কর্নেল বললেন, 'এবার আমরা ইতিহাসের ভেতর ঢুকছি, জয়ন্ত! ওই দেখো।'

একটা জঙ্গুলে জায়গার ভেতর টুটা-ফাটা পোড়ো মসজিদের গম্বুজ, মন্দিরের চূড়া, ধ্বংসস্তূপ। কোথাও শুধু একটা দেওয়াল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে সবুজ চাপ চাপ শ্যাওলা, মাথায় ঝোপঝাড়। ডাইনে ঘুরে প্রকাণ্ড ফটক। ভেতরে একটা লালরঙের দোতলা বাড়ি চোখে পড়ল। ফটকের মাথায় ইংরেজিতে লেখা আছে 'প্যালেস হোটেল'।

ফটকের সামনে রিকশো থেকে আমরা নামলুম। রিকশোওয়ালা ভাড়া নিয়ে চলে গেলে কর্নেল বললেন, 'হালদারমশাইকে একটা ডাবল বেড ঘর বুক করতে বলেছিলুম। করেছেন কি না কে জানে! এসো, দেখা যাক।'

নুড়ি-বিছানো রাস্তার দু-ধারে পাম গাছের সারি। দু-ধারে টুকরো টুকরো ফুলবাগিচা। দেশি-বিদেশি গাছ। খুদে নকল পাহাড়ের গা বেয়ে নকল ঝরনা ঝরছে। দেখে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'বাঃ!'

কর্নেল বললেন, 'কিন্তু...।' বলেই থেমে গেলেন।

বললুম, 'কিন্তু কী?'

'তোমার সন্দেহভাজন লোকটি দেখছি অন্যপথে আগেই এখানে পৌঁছে গেছে।'

বুকটা ধড়াস করে উঠল। বললুম, 'কই? কোথায়?'

কর্নেল ইশারায় ডান দিকের সবুজ লনের শেষে অশোক গাছের তলায় একটা বেঞ্চ দেখালেন। বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে সেই গুফো-গালপাট্টাওয়ালা লোকটাই বটে, সিগারেট টানছে। তার মুখের এ-পাশটা দেখা যাচ্ছে শুধু। কিন্তু এ যে সে-ই, তাতে ভুল নেই।

লোকটার সঙ্গে বোঝাপড়ার ঝোঁকেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু কর্নেল আমাকে হাত ধরে টানলেন। 'ছেড়ে দাও! আগে রাতের ডেরা খোঁজাটাই এখন জরুরি।'

দু-ধারে দুটো কামান বসানো, মধ্যিখানে চওড়া পাথুরে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে সেই লোকটিকে আবার দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়ালুম। সে এবার বেঞ্চ থেকে উঠে ফটকের দিকে চলেছে। ওকে ফলো করা উচিত ছিল। কিন্তু এ-মুহূর্তে কিছু করা যাচ্ছে না।

রিসেপশনে রাশভারী চেহারার এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসেছিলেন। কর্নেলকে দেখামাত্র উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় চিক্কুর ছাড়লেন, 'হ্যাল্লো! হ্যাল্লো! হ্যাল্লো!' তারপর হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'সকালে এক ভদ্রলোক আপনার নামে ঘর বুক করতে এসেছিলেন। শুনে তো খুব খুশি হলুম। উত্তর-পুবের সেই ঘরটাই আপনার জন্য রেখেছি। ওই ঘরটা আপনার পছন্দ, জানি।'

কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিলেন। হোটেলের এই ম্যানেজার ভদ্রলোকের নাম রামসুন্দর দুবে। চমৎকার বাংলা বলেন। খুব খাতির করে নিজেই দোতলার সেই ঘরটিতে নিয়ে গেলেন। তারপর মুচকি হেসে কর্নেলকে বললেন, 'এবার কী কেস? গত বারের মতো বুদ্ধমূর্তি পাচার, নাকি অন্য কিছু?'

কর্নেল বললেন, 'না দুবেজি! স্রেফ সাইট-সিইং!'

দুবেজি মেনে নিলেন না। হাসতে হাসতে বললেন, 'গত বছরও তাই বলেছিলেন।'

'আমার বরাত, দুবেজি। বেড়াতে গিয়েও রেহাই পাই না। কোত্থেকে উটকো ঝামেলা জুটে যায়। যাই হোক, আপনি বলেছিলেন, এই গোলমেলে জায়গায় আর থাকবেন না। এখনও থেকে গেছেন দেখছি।'

'আগরওয়ালজি ছাড়লে তো?' বলে দুবেজি আমার দিকে ঘুরলেন, 'আপনি কাগজের লোক শুনে ভালো লাগল। আপনাকে প্রচুর তথ্য দেব। একটু কড়া করে লিখবেন তো কাগজে। স্মাগলারদের এই বড়ো ঘাঁটিটা স্থানীয় লোকের পক্ষে ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ক্রমশ। সবসময় খুনোখুনি লেগেই আছে। এক দলের সঙ্গে আর এক দলের বখরা নিয়ে ঝগড়া লাগলেই ব্যাস! বোমাবাজি, এলোপাতাড়ি গুলি। বাড়ি থেকে লোকেরা সন্ধ্যার পর বেরোতে সাহস পায় না। পুলিশ কাঠপুতুল হয়ে মজা দেখে। বলে কী জানেন? যদুবংশ এভাবেই ধ্বংস হবে, আমরা কেন নিমিত্তের ভাগী হই? বুঝুন অবস্থা!'

দুবেজি খুব খোলা মনের মানুষ। ব্যালকনিতে বসে পদ্মায় রাতের চোরাচালানের হালচাল নিয়ে রোমাঞ্চকর গল্প করতে থাকলেন। বেলা পড়ে এসেছে। দুবেজির নির্দেশে নীচের ক্যান্টিন থেকে কফি আর স্ন্যাক্স এসে গেল। খাওয়ার পর কর্নেল বললেন, 'একটু বেরোব, দুবেজি!'

দুবেজি বললেন, 'সন্ধ্যের পর বেশিক্ষণ বাইরে থাকবেন না, কর্নেল! এখন অবস্থা আরও সাংঘাতিক হয়েছে। স্মাগলাররা সন্ধ্যের পর রাস্তাঘাটে লোক চলাচল পছন্দ করে না।'

ওঁকে সেই সন্দেহভাজন লোকটির নামধাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলুম, কর্নেল যেন টের পেয়েই বললেন, 'এসো জয়ন্ত! দিনের আলো থাকতে থাকতে ঘুরে আসি। দুবেজি ঠিকই বলেছেন। আমাদের সাবধান হওয়া দরকার।'

ফটকের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললুম, 'দরিয়াগঞ্জ তাহলে আপনার চেনা জায়গা?'

'সেটা আগেই তোমার বোঝা উচিত ছিল, ডার্লিং,' কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'তবে তত বেশি চেনা নয়। যেমন ধরো, এখানে শেঠমশাইদের বাড়িটা কোথায়, জানি না।

গোবিন্দর মুখে যেটুকু শুনেছি, সেটুকুই ভরসা!'

প্যালেস হোটেলের চৌহদ্দি পাঁচিল-ঘেরা। পশ্চিম দিকে পাঁচিলের সমান্তরাল একটা সংকীর্ণ এবড়োখেবড়ো রাস্তা। ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কিছুটা এগিয়ে একটা খোলামেলা মাঠ দেখতে পেলুম। ধান খেত, সবজি খেত, আর কোথাও নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একলা কোনো গাছ। পাট খেতে পাখপাখালি তুমুল হল্লা করছে। কর্নেল ঘাসে ঢাকা আলপথে পা বাড়িয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে, ওই বাড়িটাই।'

গাছপালার ভেতর একটা জরাজীর্ণ একতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। চারদিকের পাঁচিল ভাঙাচোরা। কাছাকাছি যেতেই একটা নেড়ি কুকুর চ্যাঁচাতে শুরু করল। বললুম, 'আপনার ফর্মুলা-২০ সঙ্গে আনা উচিত ছিল।'

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছিলেন, একটা লোক বেরিয়ে এল। গোবিন্দর মতোই তাগড়াই পালোয়ান চেহারা। হাতে লাঠি। খালি গা, পরনে খাটো লুঙ্গি। কাঁচা-পাকা চুল আর দাড়ি। কর্নেল বললেন, 'তোমার নাম বুঝি হোসেন?'

কর্নেলের অমায়িক এই প্রশ্নের উত্তরে লোকটা রুক্ষস্বরে বলল, 'নামে কী দরকার বাবুসায়েব? ছোটোবাবু বলে দিয়েছেন, বাড়ির ত্রিসীমানায় যেন কেউ না আসে। আপনারা চলে যান!'

কর্নেল মিঠে গলায় বললেন, 'তোমার ছোটোবাবুকে গিয়ে বলো, কলকাতা থেকে কর্নেল এসেছেন। জরুরি খবর আছে।'

লোকটা গোঁ ধরে বলল, 'হুকুম নেই।' নেড়ি কুকুরটাও সমানে ধমক দিতে থাকল।

কর্নেল এবার গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'হরবাবু! হরবাবু! ভীষণ বিপদ। শিগগির আসুন!'

ভাঙা পাঁচিলের ওধারে হরবাবুকে আসতে দেখলুম। তেমনি রাগী তিরিক্ষে চেহারা। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েও আপনার তর সয়নি দেখছি। নিজেই এসে উদয় হয়েছেন!'

'হয়েছি। কারণ কোমল-কোরককে কেউ বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে।'

হরবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, 'চালাকি করবেন না কর্নেল! আপনি ভালোই জানেন, ওরা আপনার সঙ্গে জোক করে।'

'জোক নয়, হরবাবু! এবার সত্যি সত্যি ওদের কিডন্যাপ করা হয়েছে। কিডন্যাপাররা কোরকের হাত দিয়ে লিখিয়েছে, আগামী রবিবারে মধ্যে এখানকার কোনো শিবমন্দিরে জিনিসটা না পৌঁছে দিলে কোমল-কোরককে বলি দেওয়া হবে।'

হরবাবু বললেন, 'কোন জিনিসটা?'

'একটা পান্না। যেটা পঞ্চাশ বছর আগে বাচ্চু ফকির আপনার বাবাকে...'

হরবাবু কর্নেলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভেতরে আসুন! হোসেন, ওঁদের আসতে দাও।'

দু-পাশে ভেঙে পড়া গেটের স্তূপে ঘন ঝোপঝাড়। ভেতরে একটা ধানের মরাই। গোয়ালঘরের সামনে দুটো বলদ ঘাস খাচ্ছে। ঘাসের স্তূপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ধোঁয়াটে ঘাস ওদের পছন্দ বলেই মনে হল। একটি মেয়ে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে আছে। নেড়ি কুকুরটার রাগ পড়ল না। মুরগির ঝাঁক দানা খাচ্ছিল। সে তাদের ওপর হামলা করল।

মুরগিগুলো কোঁকোঁ করে ডানা ঝাপটে সবজির মাচানে উঠে প্রাণ বাঁচাল। মেয়েটি একটা পাটকেল তুলে কুকুরটাকে বাড়িছাড়া করে তবে ছাড়ল।

বারান্দায় হোসেন কয়েকটা নড়বড়ে চেয়ার পেতে দিলে আমরা বসলুম। তারপর হরবাবু তেতো মুখে বললেন, 'কাল এমনি সময় সেই গোয়েন্দা ভদ্রলোক এসেছিলেন। আসা মানে কী? পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকে ঝোপে ওত পেতে বসেছিলেন। হোসেন তখন মাঠে না থাকলে লাঠিপেটা করত। হোসেনের বউও কম নয়। কুকুরের চ্যাঁচামেচি শুনে ওই ঝোপের পেছনে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জামার কলার ধরে টানতে টানতে আমার কাছে নিয়ে এল।'

হালদারমশাইয়ের দুর্দশার কথা শুনে হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু এখন হাসতে মানা। কর্নেল বললেন, 'তাহলে হালদারমশাইয়ের মুখে আপনার স্টুডিয়োতে হামলা আর ডনের মৃত্যুর কথা শুনেছেন?'

হরবাবু ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনার গোয়েন্দা না ফোয়েন্দা লোকটা সেই খবর দিয়েই বেঁচে গেল। নইলে ওকে কী করতুম জানেন? সারা গায়ে আলকুশি ঘষে ছেড়ে দিতুম। ছটফট করতে করতে পদ্মায় ঝাঁপ দিয়ে অতলে তলিয়ে যেত। গোয়েন্দাগিরির সাধ যেত ঘুচে।'

'হরবাবু,' কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন, 'আপনার স্টুডিয়োতে চোর কী চুরি করতে ঢুকেছিল?'

'বলব না।'

'হরবাবু! আপনি একটি ফাঁদে পা দিয়েছেন।'

হরবাবু এবার চমকে উঠলেন, 'তার মানে?'

'আপনার স্টুডিয়োতে হামলার খবর শুনেই সেটা আপনার আঁচ করা উচিত ছিল।' কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটি জ্বেলে ফের বললেন, 'তবে আমি আঁচ করতে পারছি, খবরটা শুনেও আপনি যখন কলকাতা ফিরে যাননি, তখন চোর যেটা আপনার স্টুডিয়োতে চুরি করতে ঢুকেছিল, সেটা আপনি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।'

'হ্যাঁ, এনেছি।'

'সেটা কি একটা ছবি?'

'বলব না।'

'আচ্ছা হরবাবু, আপনি সবুজ বল কেন আঁকেন?'

'বলব না।'

'হরবাবু কোমল-কোরককে কিডন্যাপারদের হাত থেকে বাঁচাতে হলে আপনাকে এসব প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে।'

কর্নেলের কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা ছিল। হরবাবু মুখ নামিয়ে আস্তে বললেন, 'কোমল-কোরককে কেউ কিডন্যাপ করেনি। ওটা জোক! ওরা নিজেরা নিজেদের কিডন্যাপ করে।'

'এবার ওরা সত্যিই বিপদে পড়েছে, হরবাবু! এবারেরটা জোক নয়,' বলে একটু ঝুঁকে পড়লেন হরবাবুর দিকে। চাপা স্বরে ফের বললেন, 'আপনি সাংঘাতিক একটা লোকের ফাঁদে পা দিয়েছেন।'

অমনি হরবাবু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘বারবার ফাঁদ ফাঁদ করছেন। কীসের ফাঁদ?’

‘আপনার দাদার বন্ধু ত্রিভুবন দাশের, যে ত্রিভুবন দাশ আপনার দাদা-বউদির মৃত্যুর জন্য দায়ী।’

কথাটা বলেই কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। আমিও দেখাদেখি উঠে পড়লুম। হরবাবুর মুখে একটা রাক্ষুসে ভাব। যেন এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বেন কর্নেলের ওপর। আমরা বারান্দা থেকে নেমেছি, তখন হরবাবু বললেন, ‘আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, কর্নেল! আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এলে বিপদে পড়বেন।’

কর্নেল কোনো কথা না বলে হাঁটতে থাকলেন। আড়চোখে দেখলুম, হোসেন যেন অবাক হয়ে গেছে। একবার হরবাবুকে, একবার কর্নেলকে দেখছে। কুকুরটা তার বউয়ের তাড়া খেয়ে বাইরে পালিয়েছিল। এতক্ষণে আমাদের পেছনে লাগল। তার চ্যাঁচানিতে বিরক্ত হয়ে একটা পাটকেল কুড়োতে যাচ্ছি, সেইসময় দেখলুম, কর্নেল পকেট থেকে একটা লম্বাটে কৌটোর মতো জিনিস বের করলেন। তারপর কৌটোর মুখটা খুলে কুকুরটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। অমনি কুকুরটা লেজ গুটিয়ে কুঁইকুঁই করতে করতে বাড়ির দিকে দৌড়োল। হাসতে হাসতে বললুম, ‘ফর্মুলা-২০ নাকি?’

কর্নেল কৌটো বন্ধ করে পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, ‘ভাগ্যিস বুদ্ধি করে জিনিসটা সঙ্গে এনেছিলুম। আসলে কোন জিনিস কখন কী কাজে লাগে, বলা যায় না।’

‘ত্রিভুবন দাশের ফাঁদ পা দেওয়ার কথা বললেন কেন?’

কর্নেল আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিড়বিড় করে আওড়ালেন, ‘দুই ডাক বাট, উত্তরে হাঁট...’

অবাক হয়ে বললুম, ‘সেই ছড়াটা!’

কর্নেল ছড়াটা আউড়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করেছেন। একটা এবড়োখেবড়ো পাথুরে রাস্তা শেঠমশাইদের বাড়ির ভেঙে পড়া গেট থেকে সোজা পদ্মার দিকে এগিয়ে গেছে। ডাইনে মাঠ এবং জঙ্গলের ওধারে প্যালেস হোটেল দেখা যাচ্ছে। দিনের আলোর রং এখন ধূসর। রাস্তাটার দু-ধারে ঝোপঝাড় এবং ধ্বংসস্তূপ। প্রায় আধ মাইলটাক হাঁটার পর কর্নেল দাঁড়ালেন। আগের মতো বিড়বিড় করে বললেন, ‘এক ডাক।’ তারপর আবার হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না।

এবার টর্চ জ্বালতে হল। একটু এগিয়ে সেই বড়ো রাস্তাটা পড়ল। ওই রাস্তা দিয়ে আমরা সাইকেল-রিকশো চেপে পুব দিকে প্যালেস হোটেলে গেছি। রাস্তার ওধারে বাঁধ। বাঁধে উঠে কর্নেল আবার দাঁড়ালেন। এবার দাঁড়ানোর কারণ নীচে পদ্মা। এত জোরে হাঁটা অভ্যেস নেই। হাঁপিয়ে গেছি। বললুম, ‘হচ্ছেটা কী?’

কর্নেল বাঁধের ঢালে টর্চের আলো ফেললেন। পাথরের চাবড়া সেঁটে দেওয়া হয়েছে ধস আটকাতে। বাঁধের ওপর গাছের সার। নীচের জলটা দেখে নিয়ে কর্নেল আলো নিভিয়ে বললেন, ‘দুই ডাকের মাঝখানে কবে পদ্মা এসে ঢুকে গেছে দেখছি!’

‘চিরদিন শুধু হেঁয়ালি!’ বিরক্ত হয়ে বললুম, ‘খুলে বললে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়, বুঝি না।’

কর্নেল হাসলেন, ‘বাঘ ডার্লিং, বাঘ!’

‘আবার হেঁয়ালি?’

‘ঘিলু চাঙ্গা করো, জয়ন্ত! তোমার ঘিলু মাঝে মাঝে বড্ড ঝিমিয়ে পড়ে।’

‘পড়াটা স্বাভাবিক। এমন উদ্ভুট্টে...’

‘চুপ!’ বলে আমাকে থামিয়ে দিলেন কর্নেল।

নীচের বড়ো রাস্তায় একটা বচসা হচ্ছে। নিরিবিলি আঁধার রাস্তায় বচসা, বিশেষ করে এই দরিয়াগঞ্জে, ভয় পাইয়ে দেয়। প্যালেস হোটেলের ম্যানেজার দুবেজির কাছে যা শুনেছি, মনে পড়ায় ভয়টা আরও বেড়ে গেল। নিশ্চয় স্মাগলারদের মধ্যে বখরা নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে।

কিন্তু একটু পরে বুঝতে পারলুম, বচসাটা সাংঘাতিক কিছু নয়। গলার স্বরও চেনা মনে হল।

‘মাফ করবেন মশাই! ও-রাস্তায় রিকশো টানতে পারব না।’

‘এতকাল সবাই পেরেছে! তুমি পারবে না?’

‘আজ্ঞে না। ভাড়া মিটিয়ে দিন। চলে যাই। দিনকাল খারাপ। আমি বলেই এলুম এ তল্লাটে।’

‘দেখো বাপু, আমাকে দরিয়াগঞ্জের সবাই চেনে। তুমিই চেন না দেখছি।’

ভরাট গলায় অন্য একজন বলল, ‘তোমাকে রিকশোসুদ্ধু পদ্মায় ছুড়ে ফেলে দিতে পারি, জান?’

‘ছেড়ে দে বাবা! আয়, একটু কষ্ট করে পায়ে হেঁটেই যাই।’

এতক্ষণে চিনতে পারলুম। চাপা স্বরে কর্নেলকে বললুম, ‘শেঠমশাইয়ের গলা মনে হচ্ছে?’

কর্নেলও চাপা গলায় বললেন, ‘হ্যাঁ। শেঠমশাই আর গোবিন্দ।’

রিকশোটা ক্রিং ক্রিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে ঘুরছিল। তার জুগজুগে আলোয় শেঠমশাই আর গোবিন্দকে এক বারের জন্য দেখা গেল। রিকশোটা পশ্চিমে শহরমুখো হয়েই যেন তাড়া-খাওয়া প্রাণীর মতো পালিয়ে গেল। পালোয়ান গোবিন্দের হুমকিই হয়তো এর কারণ। শেঠমশাইয়ের হাতে সেই বেঁটে নকশাদার লাঠি বা ছড়িটাও দেখতে পেলুম।

কিছুক্ষণ পরে বললুম, ‘শেঠমশাই কি নাতিদের উদ্ধার করতে এলেন?’

‘তাই তো মনে হচ্ছে।’

‘কিন্তু বাচ্চু ফকিরের পান্না তো পঞ্চাশ বছর আগে ওঁর ব্যাঙ্ক থেকে হারিয়ে গেছে! ওটা না পেলে উনি নাতিদের উদ্ধার করবেন কী করে?’

কর্নেল কোনো জবাব দিলেন না। ফের পদ্মার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে সেই আজব ছড়াটা আউড়ে তারপর আপনমনে আগের মতোই বললেন, ‘সমস্যা! দুই ডাকের মধ্যিখানে পদ্মা একখানা হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে।’

‘ঃআ। ব্যাপারটা কী?’

‘বাঘ।’

রাগ করে বললুম, ‘হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন। তারপর সত্যি বাঘ এসে হালদারমশাইয়ের মতো আপনাকে পেটে চালান দিক।’

পা বাড়িয়েছি, কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত! বাঘের চেয়ে সাংঘাতিক হল ভূত।'

'আমি ভূত বিশ্বাস করি না।'

'তুমি বিশ্বাস না করলে কী হবে, ওই দেখো, ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে পদ্মার চরে।'

চমকে উঠে পদ্মার দিকে তাকিয়ে দেখি, শূন্যে ভেসে আছে একটা সবুজ আলো। ঠিক যেমনটি বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের বাগানে দেখেছিলুম, ক্রিকেট বলের সাইজ সবুজ সেই ভূতুড়ে আলো। আলোটা কলকাতা থেকে এত দূরে চলে এসেছে। অজানা ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। দম-আটকানো গলায় বলে উঠলুম, 'কর্নেল! সেই সবুজ আলো! ওখানে কী করছে ওটা?'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'ত্রিভুবন দাশের কাজকারবার বোঝা কঠিন। যাই হোক, তার সঙ্গে বোঝাপড়া পরে হবে। এসো, শেঠমশাই কী করছেন দেখি।'

রাস্তায় নেমে বললুম, 'আবার ওঁদের বাড়িতে যাওয়া ঠিক হচ্ছে কি? খেঁকি কুকুরটা নাহয় আপনার ফর্মুলা-২০ শুঁকে লেজ গুটিয়ে পালাবে। কিন্তু এবার শুধু হোসেন পালোয়ান নয়, গোবিন্দ পালোয়ানও তার পাশে। তা ছাড়া হোসেনের বউও যা দজ্জাল! শুনলুম, হালদারমশাইয়ের মতো প্রাক্তন দুঁদে দারোগাকে কাহিল করে ছেড়েছিল।'

কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত, স্পিকটি নট।'

সেই এবড়োখেবড়ো পাথুরে রাস্তায় অন্ধকারে ঠোক্কর খেতে খেতে কর্নেলকে অনুসরণ করছিলুম এবং ভাবছিলুম, আর অন্তত সন্ধ্যের মুখে তাঁর সঙ্গে কোথাও বেরোচ্ছি না। প্যালেস হোটেলের ব্যালকনিতে বসে নিরাপদে রবীন্দ্রসংগীত ভাঁজতে ভাঁজতে পদ্মার শোভা দেখব, কিংবা দুবেজির কাছে স্মাগলিং কারবারের রোমাঞ্চকর গল্প শুনব। হুঁ, সীমান্তে স্মাগলিং নিয়ে ফলাও করে একখানা রিপোর্তাজ লিখে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় প্রকাশ করলে হিড়িক পরে যাবে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া বা পদ্মার শোভা দেখার চাইতে বরং তাতেই আমার বেশি লাভ।

খেঁকি কুকুরটা কয়েকবার ডেকে চুপ করে গেল। বাড়িটাতে বিদ্যুৎ নেই। লণ্ঠনের আলো দেখিয়ে হোসেন শেঠমশাই ও গোবিন্দকে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে।

কর্নেল ভাঙা পাঁচিলের পাশে আমাকে টেনে বসিয়ে দিলেন। কুকুরটার আর সাড়াশব্দ নেই। বুঝলুম, স্বয়ং ফর্মুলা-২০ কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরেছে, সেটা টের পেয়েছে বেচারা। ভেতরে শেঠমশাইয়ের গলা শোনা গেল, 'হর! অ্যাই হর! বেরোচ্ছিসনে কেন? দরজা খোল হতভাগা! নইলে গোবিন্দ দরজা ভেঙে ফেলবে বলে দিচ্ছি।'

একটু পরে হরবাবু সাড়া দিলেন, 'কী হয়েছে? অমন চ্যাঁচাচ্ছেন কেন?'

'চ্যাঁচাব না? আমার সাড়া পেয়েই দরজা বন্ধ করে দিলি। দেখিনি বুঝি?'

'ছবি আঁকছিলুম। জানেন না, দরজা বন্ধ করে ছবি আঁকি?'

'এ কি ছবি আঁকার সময়? ওদিকে সাংঘাতিক বিপদ। একটার পর একটা বিপদ ঘটছে।'

'শুনেছি। কিছুক্ষণ আগে কর্নেলসায়েব এসে সব বলে গেছেন।'

'শুনেও চুপ করে আছিস? দিব্যি ছবি আঁকছিস! এমনকী, আমি এমন করে কেন এসে হাজির হয়েছি, তাতেও তোর মাথাব্যথা নেই? কই দেখি, কী ছবি আঁকছিস?'

‘আপনি অদ্ভুত মানুষ! অতদূর থেকে এসেছেন। বিশ্রাম করবেন, তা নয়...’

‘বিশ্রাম! বলছিস কী তুই! কোমল-কোরককে তপো হতচ্ছাড়া কিডন্যাপ করেছে। বাচ্চু ফকিরের পান্না দাবি করেছে। না দিলে তাদের বলি দেবে বলে হুমকি দিয়েছে। জানিস এসব কথা?’

‘জোক। আপনি জানেন না, কোমল-কোরক এমন জোক কতবার করেছে?’

‘এবারেরটা মোটেই জোক নয়। পুলিশ তপোর বাসায় গিয়েছিল। দরজায় তালা আঁটা। ঃও। দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছিলুম!’

হরবাবু জোর-গলায় বললেন, ‘জোক! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কোমল-কোরকের কোনো ক্ষতি হবে না।’

‘তোর কথাবার্তা খুব সন্দেহজনক, হর! মনে হচ্ছে, এর পেছনে তোরই কারসাজি আছে।’

‘কী বলছেন যা-তা?’

‘হ্যাঁ। তপোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তুই-ই কোমল-কোরককে লুকিয়ে রেখেছিস!’

‘বাবা! বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন আপনি!’

শেঠমশাই গলা চড়িয়ে বললেন, ‘তোকেই পুলিশে ধরিয়ে দেব। বাচ্চু ফকিরের পান্নাটা আমার কাছ থেকে আদায় করে কাউকে বেচবার তাল করেছিস তুই! কিন্তু জেনে রাখ, তুই মাথা ভাঙলেও ও-জিনিস তোকে দেব না।’

‘আপনার মাথার ঠিক নেই দেখছি। কী আবোল-তাবোল বলছেন?’

‘ঠিকই বলছি। এবার বুঝতে পেরেছি, তুই কেন সবুজ বল আঁকিস! পরোক্ষে তুই আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাস। তুই ভালোই জানিস, আমি সবুজ বল দেখলে কষ্ট পাব। এ একটা মেন্টাল টরচারের কারচুপি। নিজের বাবাকে তুই কষ্ট দিয়ে বাচ্চু ফকিরের পান্নাটা আদায় করতে চাস, এই তো!’ বলে বৃদ্ধ শেঠমশাই হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। গোবিন্দ তাঁকে ধরে বারান্দার একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। হরবাবুকে দেখলুম, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। লন্ঠনটা টেবিলের ওপর।

এই নাটকীয় ঘটনার বাকি অংশ দেখার সুযোগ পেলুম না। হঠাৎ কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, ‘চলে এসো।’ তারপর গুড়ি মেরে পাঁচিলের ধারে ধারে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেন। অন্ধকারে এভাবে চলাফেরা ওঁর পক্ষে সহজ। কিন্তু আমার অবস্থা শোচনীয়। শিশিরে ভিজে জবুথবু তো হচ্ছি, তার সঙ্গে সাপের ভয়। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছে, এই বুঝি ফোঁস করে ছোবল মারবে। এমন জায়গায় সাপখোপ থাকা খুবই স্বাভাবিক। শুধু একটাই ভরসা, কর্নেল আগে এবং আমি ওঁর পেছনে, সাপের ছোবল প্রথমে ওঁরই খাওয়ার কথা।

এবং বাঘ! কথায় বলে, আগে গেলে বাঘে খায়। হালদারমশাইকে যদি সত্যি বাঘে খেয়ে থাকে, এমনি অবস্থাতেই খাওয়া সম্ভব। এবার কর্নেলকেও খাবে। খাওয়ার আগে হালুম তো করবেই। শোনামাত্র আমি পিঠটান দেব।

একটু পরে ঘুরঘুট্টে অন্ধকারে খস খস খড় খড় শব্দ হল। পরমুহূর্তে কী একটা ঘটল। কে কার ওপর ঝাঁপ দিল যেন। তার মানে, নির্ঘাত বাঘ! গোয়েন্দাখেকো সেই বাঘটাই

হবে। জাপটাজাপটি, ধস্তাধস্তির শব্দও শুনতে পেলুম। হাতে টর্চ আছে। কিন্তু ভড়কে যাওয়ার দরুন জ্বালতে একটু দেরি হল।

সেই আলোয় প্রত্যাশা অনুযায়ী কর্নেলকে ধরাশায়ী দেখলুম, সেটা ঠিক। কিন্তু এইমাত্র যে প্রাণীটি গুলতির বেগে ঝোপঝাড়, ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে উধাও হয়ে গেল, তার গায়ে ডোরাকাটা দাগ নেই এবং চারখানা ঠ্যাংও নেই তার। সে নিছক দু-ঠেঙে প্রাণী, কর্নেল বা আমার মতোই।

কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন, 'টর্চ নেভাও! হোসেন দেখতে পাবে।'

টর্চ নিভিয়ে বললুম, 'কী আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য তো বটেই!' কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বাঘের বদলে মানুষ! তবে তার চেয়েও যেটা আশ্চর্য, সেটা হল, তুমি ওকে চিনতে পারলে না।'

চমকে উঠে বললুম, 'হুঁ, চেনা চেনা মনে হচ্ছিল যেন। কিন্তু...'

'চুপ! হোসেন শুনতে পাবে। চলো, হোটেলে ফেরা যাক।'

কিছুক্ষণ পরে হোটেলে ফিরে কফি খেতে খেতে বললুম, 'এই কেসের ব্যাপারে একটা থিয়োরি খাড়া করেছিলুম। নেতিয়ে গেছে। রবিঠাকুরের বাচস্পতি মশাইয়ের ভাষায় বলতে গেলে আমার 'আন্তারা ফাঁচকলিয়ে' গেছে এবং 'মাথাটা তাজঝিম-তাজঝিম' করছে।'

কর্নেল জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, 'এই জিনিসটা দেখলে তোমার আন্তারা আরও ফাঁচকলিয়ে যাবে এবং মাথাটা আরও তাজঝিম-তাজঝিম করবে।'

টেবিলের ওপর জিনিসটা রাখলেন কর্নেল। অবাক হয়ে বললুম, 'এ আবার কী বস্তু?'

'গোঁফ-গালপাট্টার অংশ,' কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন। 'পরচুলাটাও সম্ভবত খসে গেছে। ভোরবেলা খুঁজে বের করা যাবে।'

'সেই লোকটা!' লাফিয়ে উঠলুম উত্তেজনায়, 'সেই গোঁফ-গালপাট্টাওয়ালা লোকটা!'

'হ্যাঁ, তোমার সন্দেহভাজন লোকটাই বটে।' কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'তবে ছদ্মবেশ ধরার ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি।'

'আনাড়ি কী বলছেন? অমন করে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল!'

'না ডার্লিং! আমিই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম।'

'ওকে অন্ধকারে দেখতে পেলেন কী করে?'

'তুমি তো জান, আমি রাতচরা প্রাণীদের মতো অন্ধকারেও দিব্যি দেখতে পাই। না, দেখতে পাওয়া বললে ভুল হবে। টের পাই। সামরিক জীবনে জঙ্গলে গেরিলা-যুদ্ধের তালিম নিয়েছিলুম। কান, জয়ন্ত! নিছক দুটো কানই রাতবিরেতের জঙ্গলে কিছু টের পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। শব্দটা কোনখান থেকে আসছে, স্বাভাবিক শব্দ না সন্দেহজনক শব্দ, সেটা কানে শুনে আঁচ করতে হয়। তবে তোমার এই সন্দেহভাজন লোকটিকে পাকড়াও করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার লক্ষ্য ছিল ওর পরচুলা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওর গোঁফ আর একদিকের গালপাট্টাই হস্তগত করতে পারলুম শুধু। পরচুলাটা...' কর্নেল একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'পরচুলাটা খসে পড়া উচিত। অবশ্যই উচিত। ভোরবেলা খুঁজতে বেরোব।'

‘লোকটা তো এই হোটেলেই উঠেছে। দুবেজিকে ওর রুম নম্বর জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। তারপর সরাসরি ওকে চার্জ করলেন...’

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘আগে বাঘ, জয়ন্ত!’

‘আবার বাঘ!’

‘হুঁ, বাঘ। তারপর হালদারমশাই।’

বিরক্ত হয়ে উত্তরের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালুম। এদিকে পদ্মা। অন্ধকার ও কুয়াশায় পদ্মাকে এখন আলাদা করে চেনা যায় না। দূরে ও কাছে আলো জুগজুগ করছে। জেলে নৌকোর আলো। একটু পরে সেইসব হলুদ আলোর ওপর হঠাৎই সেই সবুজ আলোটা ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ স্থির থাকার পর সেটা নিভে গেল। একটু পরে আবার জ্বলল। তারপর নাচ জুড়ে দিল যেন। এদিক থেকে সেদিক, নীচে থেকে ওপরে। ডাকলুম, ‘কর্নেল! কর্নেল! দেখে যান।’

কর্নেল এলেন না। চুরুটের ধোঁয়ার ভেতর বললেন, ‘তুমিই দেখো, ডার্লিং!’

‘ত্রিভুবন দাশ সবুজ আলোর বল নিয়ে ক্রিকেট খেলছে।’

‘সবুজ সংকেত, জয়ন্ত!’

‘কীসের সংকেত?’

‘ত্রিভুবন দাশ বলছে, চলে এসো।’

‘কাকে বলছে?’

‘হরবাবুকে।’

যত কথা বলব, তত হেঁয়ালি শুনব। কাজেই চুপ করে গেলুম। পদ্মার দিকে ঘুরে সবুজ আলোর বলটার খেলা দেখতে থাকলুম। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত থাকলে খেলাটা জমত ভালো। কাল পোস্টাপিসে গিয়ে টেলিফোনে ওঁকে ট্রাঙ্ক কল করতে হবে।

৬

কর্নেলের ডাকে চোখ খুলে দেখি, পুবের জানলা দিয়ে একরাশ রোদ ঢুকেছে ঘরে। বললেন, ‘উঠে পড়ো, ডার্লিং! আটটা বাজে।’

প্রকৃতিবিদের টুপিতে মাকড়সার ছেঁড়া জাল, শুকনো পাতা। সাদা দাড়িতে জ্বলজ্বল করছে একটা নীল পোকা। হান্টিং বুটে জলকাদার ছোপ। ঘাসের কুটো সেঁটে আছে। হাতে প্রজাপতি-ধরা জালের স্টিক। বাইনোকুলারও ঝুলছে বুকের ওপর। অভ্যাসমতো প্রাঃতভ্রমণে বেরিয়েছিলেন এবং প্রজাপতি ধরাও উদ্দেশ্য ছিল। তারপর মনে পড়ে গেল পরচুলাটার কথা। বললুম, ‘পরচুলাটা খুঁজতে যাননি?’

কর্নেল মাথা নাড়লেন। মাথা নাড়ার সঙ্গে দাড়িও নড়ল। নীল রঙের পোকাটা সঙ্গেসঙ্গে যেন কোনো বিপদের আশঙ্কা করে উড়ে পালাল। নিরাশ মুখে বললেন, ‘যা শিশিরের অত্যাচার! প্রজাপতিগুলোও বেরোতে বড্ড বেশি দেরি করে আজকাল। শিশির না শুকোলে বেরোবেই না। তবে প্রচুর হাঁস দেখে খুশি হয়েছি। একটা জেলে-নৌকোর সঙ্গে কথা হয়েছে। মন্দিরের চরে পৌঁছে দেবে। ওদিকটায় নাকি আরও বেশি হাঁস দেখা যায়।

তা ছাড়া মন্দিরের চরে প্রজাপতিও নাকি প্রচুর। জয়ন্ত, তুমি কি জগন্নাথ-প্রজাপতির নাম শুনেছ?'

'না,' বলে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলুম। কী প্রশ্নের কী জবাব!

'ঝটপট রেডি হও। ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরোব,' কর্নেল পেছন থেকে ঘোষণা করলেন।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি, ব্রেকফাস্ট এসে গেছে। একটু পরে দুবেজি এলেন হন্তদন্ত হয়ে। বললেন, 'গত রাতে একটা ভূতুড়ে কাণ্ড, কর্নেল! দরিয়াগঞ্জ তোলপাড় হচ্ছে সেই নিয়ে।'

কর্নেল ওমলেটের টুকরো মুখে গুঁজে বললেন, 'সবুজ আলো?'

'আপনি দেখেছেন?' দুবেজি উত্তেজিতভাবে বললেন। 'তাহলে তো ব্যাপারটা সত্যি। গত রাতে মন্দিরের চরের ওপর ওই ভূতুড়ে আলো দেখে তল্লাটের সব মাছধরা নৌকো পালিয়ে এসেছে।'

'শুনে এলুম।'

'বর্ডার সিকিউরিটির ক্যাম্পে খবর দেওয়া হয়েছিল। ওরা বলছে, স্মাগলারদের সিগন্যাল। কিন্তু কথাটা হল, এর আগেও মন্দিরের চরে অনেক ভূতুড়ে ব্যাপার লোকে দেখেছে। তাই রাতবিরেতে ওই চরে পারতপক্ষে কোনো জেলে নৌকো ভেড়ায় না।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'মন্দিরের চর কেন বলা হয়, দুবেজি?'

দুবেজি মুখে রহস্যের ভাব ফুটিয়ে বললেন, 'ওটা আসলে চর বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা নয়। বছর তিরিশেক আগেও ওই মাটিটা দরিয়াগঞ্জের অংশ ছিল। পদ্মার ব্যাপার-স্যাপার তো জানেন! মাঝখানে ঢুঁ মেরে ঢুকে ওই মাটিটাকে আলাদা করে দিয়েছে। আসল পদ্মা মন্দিরের চরের ওপারে। বাঁধের নীচে যেটা দেখেছেন, ওটা একটা শাখা। শাখাটা পেরোলেই মন্দিরের চর।'

'ওখানে মন্দির আছে বুঝি?'

'কয়েকটা মন্দিরই ছিল। এখন ভেঙেচুরে গেছে। শুধু শিবমন্দিরটাই আস্ত আছে। তবে দরিয়াগঞ্জের লাগোয়া ছিল যখন, তখন পুজোআচ্চা হত। আলাদা হয়ে যাওয়ার পর আর মেরামত হয়নি। তা ছাড়া বর্ডার এলাকা। যখন-তখন দু-দেশের সেপাইদের মধ্যে গুলি ছোড়াছুড়ি হত। বাংলাদেশ হওয়ার পর সেটা থেমেছে। কিন্তু এখন স্মাগলারদের যা দৌরাত্ম্য!'

দুবেজি স্মাগলারদের গল্প শুরু করলেন। ব্রেকফাস্ট শেষ করে কফি খেয়ে কর্নেল বললেন, 'আমরা বেরোচ্ছি, দুবেজি! হুঁ, আপনার আট নম্বর রুমের ভদ্রলোক ফিরেছেন কি?'

দুবেজির মুখে উদবেগ ফুটে উঠল। 'না। খুব ভাবনায় পড়ে গেছি। আমার ধারণা, লোকটা স্মাগলার। সেজন্যই ভাবনা হচ্ছে, ওর একটা কিছু ঘটে থাকলে গভর্নমেন্ট আমাদেরও টানাটানি করবেন। এ-হোটেলের ওপর এমনিতেই পুলিশের নজর আছে। তারপর ধরুন, কাস্টমসের লোকেদেরও নজর আছে। শুধু মালিকের নামডাকের জোরে রক্ষে।'

এই সুযোগে বললুম, 'গোঁফ-গালপাট্টাওয়ালা লোকটার কথা বলছেন কি দুবেজি?'

'হ্যাঁ। কাল বিকেলে এসে ঘর বুক করলেন ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে গেলেন। এখনও পর্যন্ত নিপাত্তা। কী করা যায়, ভেবে পাচ্ছি না!'

'নাম কী ভদ্রলোকের?'

দুবেজি একটু হাসলেন, 'স্মাগলার হলে আসল নামধাম তো হোটেলের খাতায় লিখবে না। লিখেছে, স্বপন মজুমদার।'

'পুলিশে খবর দেওয়া উচিত, দুবেজি! আর দেরি করবেন না।'

কর্নেল বললেন, 'ফিরবেন যথাসময়ে। ও নিয়ে দুবেজির ভাবনার কারণ নেই। দুবেজি, আপনি পুলিশ-টুলিশ করতে যাবেন না। আমার এই তরুণ বন্ধুটির পরামর্শ কানে নেবেন না। বুঝতে পারছেন না, ও একজন রিপোর্টার? অতএব ও এই সুযোগে একখানা খবরের দাঁও মারতে চায়।'

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। দুবেজিও হাসলেন। বললেন, 'তা যা বলেছেন। কাগজের লোকেরা খবরের গন্ধ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে মনে হচ্ছে আট নম্বর ঘরের লোকটা শেষ পর্যন্ত খবরই হবে।'

'হবে,' কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, 'কিন্তু এখনও দেরি আছে। আপনি মুখটি বুজে থাকুন, দুবেজি!'

হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে কর্নেলকে বললুম, 'ওই স্বপন মজুমদার ত্রিভুবন দাশের এক স্যাঙাত।'

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। ফটক পেরিয়ে বাঁধের দিকে হাঁটতে থাকলেন। বাঁধে উঠে নীচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নৌকোটা এসে গেছে। এসো জয়ন্ত, মন্দিরের চরে তোমাকে জগন্নাথ-প্রজাপতি দেখাব।'

বাঁধের ঢালে পাথরের চাবড়ার খাঁজে পা রেখে সাবধানে দু-জনে নেমে গেলুম। জেলেডিঙির হালে এক বুড়ো, দাঁড়ে এক জোয়ান। ছইয়ের সামনে জালের স্তূপ। নৌকোর মুখ মন্দিরের চরের দিকে ঘুরল। কর্নেল বুড়ো লোকটির সঙ্গে গল্প করতে থাকলেন। গত রাতের সেই সবুজ আলোর গল্পও চলতে থাকল। বুড়ো লোকটির মতে, মন্দিরের চরে মন্দিরের পুরোনো দেবতা ফিরে এসেছেন। ভক্তদের ইশারা দিচ্ছেন, পুজোআচ্চা বন্ধ রেখেছিস কেন? পুজো দে। নইলে সর্বনাশ হবে। কিন্তু তার জোয়ান ছেলের মতে, 'মাগলার'! সে বারবার 'মাগলার' বলায় তার বাবা খুব চটে গেল। বলল, 'কী খালি 'মাগলার মাগলার' করছিস! তুই জানিস কিছু? তখন তোর জম্মোই হয়নি। ওই মাটি আর গঞ্জের মাটি এক ছিল। দেশ ভাগ না হবে, না দেবতার কোপ পড়বে। দেবতা মানুষের ওপর রাগ করে নিজের মন্দির সরিয়ে নিয়ে গেলেন। মাঝখানটা ধুয়ে-মুছে ভাসিয়ে দিলেন জলে।'

চরে ঘন জঙ্গল। প্রচুর ইট-পাটকেল এবং পাথরের স্ল্যাব পড়ে আছে। বোঝা যায়, সত্যিই একসময় এটা দরিয়াগঞ্জের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নৌকোর বুড়ো লোকটি ভাড়া আর বকশিশ নিয়ে সেলাম ঠুকে কর্নেলকে বলল, 'কখন ফিরবেন স্যার? বললে পরে নৌকো নিয়ে আসব টাইমমতো।'

কর্নেল তাকে প্রচণ্ড অবাক করে বললেন, 'আমরা আর ফিরব না।'

বুড়োর ছেলে মুচকি হেসে বলল, 'ওপারে যাবেন তো? দিনের বেলা পারবেন না কিন্তু। ধরা পড়লেই বিপদ। তবে যদি বলেন, মাঝরাত্তিরে নৌকো এনে রাখব। ওপারে পৌঁছে

দেব। একশো টাকা লাগবে।’

কর্নেল তাকেও অবাক করে বললেন, ‘আমরা উড়তে জানি, বুঝলে তো? পদ্মা পেরিয়ে চলে যাব পাখির মতো।’

বাবা-ছেলে দু-জনেই গুম হয়ে নৌকো নিয়ে চলে গেল। পাড়ের দিকে নয়, মূল পদ্মার দিকে নৌকোর গতি। মাছ ধরতেই চলেছে বোঝা যায়।

চর না বলে টিলা বলাই উচিত। উঠতে উঠতে কর্নেল একজায়গায় থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, ‘দুই ডাক। হুঁ, আরও একটু হাঁটতে হবে।’

বললুম, ‘কাল সন্ধ্যেয় এক ডাক ছিল। এখন হল দুই ডাক। কীসের ডাক?’

‘মানুষের।’

‘তার মানে?’

‘দুই ডাকে বাট।’

‘সেই উদ্ভুট্টে ছড়াটা,’ হাসতে হাসতে বললুম, ‘এ বয়সেও ছড়া নিয়ে আপনি মাথা ঘামান!’

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, ‘জয়ন্ত, এ হল আগের আমলে দূরত্ব বোঝানোর হিসেব। এক ডাক মানে একখানে দাঁড়িয়ে কেউ চিৎকার করে কাউকে ডাকলে যতদূর ডাক পৌঁছোয়, সেটাই হল এক ডাকের পথ। আনুমানিক হিসেবে আধ মাইল দূরত্ব। দুই ডাকে বাট! বাট মানে পথ। দুই ডাক প্রায় এক মাইল দূরত্ব। ছড়ায় আছে: ‘দুই ডাকে বাট/ উত্তরে হাঁট।’ আমরা উত্তরেই এসেছি। এরপর ছড়া বলছে: ‘ঘাটে মহাবল/তার নীচে জল।’ একটু সমস্যা আছে এবার। এই মাটিটা যখন গঞ্জের সঙ্গে যুক্ত ছিল, তখন শেঠমশাইদের বাড়ির গেট থেকে সেই ঘাটের দূরত্ব ছিল প্রায় এক মাইল। পদ্মা সেই ঘাটের কী দশা করেছে কে জানে। এসো তো। দেখা যাক।’

জঙ্গলে চরের মাথায় গিয়ে ওধারে বালিয়াড়ি দেখতে পেলুম। কর্নেল এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছু খুঁজছিলেন। গাছপালা-ঝোপঝাড়ের ভেতর ইট আর পাথরের স্ল্যাব ছড়িয়ে

রয়েছে। কর্নেল বিড়বিড় করে আওড়ালেন, 'ঘাটে মহাবল/তার নীচে জল।' তারপর হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে গেলেন সামনের দিকে, 'চলে এসো জয়ন্ত! পাওয়া গেছে।'

কাছে গিয়ে বললুম, 'কী পাওয়া গেছে?'

'মহাবল!'

'মহাবল! সে আবার কী?'

'বাঘ।'

চমকে উঠে বললুম, 'কই বাঘ? কোথায় বাঘ?'

'এই তো!' বলে কর্নেল তাঁর সামনে একটা ঝোপের ভেতর কিছু দেখালেন।

উঁকি মেরে দেখি, একটা পাথরে তৈরি চতুষ্পদ প্রাণী কাত হয়ে পড়ে আছে। লেজটা ভাঙা। ওটা যে বাঘের মূর্তি, বুঝতে একটু দেরি হল। কালো পাথরের প্রাণীটির গায়ে টানা টানা দাগ খোদাই করা। হাসতে হাসতে বললুম, 'হালদারমশাই কি এই পাথুরে বাঘের কথাই বলেছিলেন আপনাকে?'

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'মহাবল, ডার্লিং! মহাবল।'

'কী আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য নয় জয়ন্ত! বাঘকে কোনো কোনো অঞ্চলে মহাবল বলা হয়। পুজোও করা হয় মহাবলদেব নামে। একসময় এ-অঞ্চলে ভীষণ জঙ্গল ছিল। অথচ মাটি খুব উর্বর। তাই বাঘের উৎপাত থেকে বাঁচতে লোকেরা মহাবলদেবের পুজো করত।'

'সুন্দরবনে দক্ষিণরায়ের পুজো হয়। এখানে তাহলে উত্তররায়ের পুজো হত বলুন?'

'না, জয়ন্ত! দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রবাহন দেবতা। কিন্তু মহাবল নিজেই দেবতা।' কর্নেল নীচে বালিয়াড়ির দিকে কয়েক-পা এগিয়ে গেলেন, 'এখানেই ঘাট ছিল। এখন বালির চড়া জমে গেছে। হুঁ, ছড়ায় বলছে: 'ওইখানে থাম/সিদ্ধ মনস্কাম।' খুব ভালো কথা,' কর্নেল আপনমনে বলতে থাকলেন। 'ওইখানে থাম। হুঁ, থামলুম। আর এগোচ্ছিনে। কিন্তু মনস্কাম সিদ্ধ হওয়ার মতো তো কিছু দেখছিনে।'

ঝোপের শেষে বালিতে ডুবে থাকা একটা পাথরের স্ল্যাবে বসে পড়লেন কর্নেল। বিড়বিড় করে ফের ছড়াটা আওড়ালেন। মুখে হতাশ ভাব। দাড়িতে আঁচড় কাটতে থাকলেন, 'ওইখানে থাম/সিদ্ধ মনস্কাম। থেমেছি। কিন্তু মনস্কাম সিদ্ধ হচ্ছে না। ভারি সমস্যায় পড়া গেল দেখছি। ও জয়ন্ত, তুমি একটু ভাবো তো! দু-জনে ভেবে যদি মনস্কাম সিদ্ধ হয়।'

'কী মনস্কাম সিদ্ধ হবে, না জানলে মাথা ঘামানোর মানে হয় না।'

কর্নেল কী জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বালিয়াড়ির শেষে পদ্মার ওপর কী একটা জিনিস আকাশে ভেসে আসছে দেখে বললুম, 'কর্নেল! ওটা কী দেখুন তো?'

কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে উড়ুক্কু জিনিসটা দেখলেন। তারপর তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। মুখে হাসি ঝলমল করছে। বললেন, 'প্লেন, জয়ন্ত! চন্দ্রকান্তবাবু ছোটো প্লেনে চেপে উড়ে আসছেন। সত্যি উনি! এসো, এসো! আমরা ওঁকে ওয়েলকাম করি। এ সময়ে ওঁকে আমাদের খুবই দরকার ছিল। মেঘ না চাইতেই জল, জয়ন্ত!'

কর্নেল দু-হাত তুলে বালির চরে নেমে গেলেন। হাত দুটো জোরে নাড়তেও থাকলেন।

কর্নেল বালির চরে দু-হাত তুলে নাচানাচি করতে থাকায় তাঁর টুপিটা পড়ে গেল। শরতের উজ্জ্বল রোদে ঝলমলিয়ে উঠল তাঁর প্রসিদ্ধ টাক। কাছে গিয়ে টুপিটা কুড়িয়ে তাঁর হাতে গুঁজে দিলুম। তখন টুপিটা নাড়তে থাকলেন।

বালির চড়ায় যন্ত্রচালিত হ্যাং-গ্লাইডার নেমে পড়ল। চন্দ্রকান্ত বেরিয়ে এলেন। মুখে হাসি। আমরা দৌড়ে কাছে গেলে কর্নেলের মতো দু-হাত তুলে বললেন, 'এসে গেলুম। না এসে পারা গেল না।'

কর্নেল খুশি হয়ে বললেন, 'ওয়েলকাম চন্দ্রকান্তবাবু! সুস্বাগতম!'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'এক মিনিট। একটু হাঁফ ছাড়ি। তারপর কথা হবে।'

হাঁফ ছেড়ে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'আসতেই হল, তার কারণ এই চিঠি। পড়ে দেখুন।'

পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করলেন বিজ্ঞানী। কর্নেল সেটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে দেখার পর আমাকে দিলেন। পড়ে দেখি, ওতে লেখা আছে:

'ভাই চাঁদু,

একটা জরুরি ব্যাপারে তোমার সাহায্য নিতে চাই। কিন্তু তুমি তো আমাকে দেখলেই চটে যাও। এদিকে তোমার বাড়ি গিয়ে দেখা করব, তার উপায় নেই। ধুন্ধুমারকে লেলিয়ে দেবে। অগত্যা রাতবিরেতে গিয়ে তোমাকে গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছিলুম, একটা অসাধারণ জিনিস আমার হস্তগত হয়েছে। ভেবেছিলুম, তুমি নিজেই আগ্রহী হয়ে যোগাযোগ করবে। কিন্তু উলটো বুঝলে ভায়া! আমার গ্রিন সিগন্যালকে তুমি পাকড়াও করার চেষ্টা করলে। অগত্যা এই চিঠি লিখতে হল। পদ্মা সীমান্তে দরিয়াগঞ্জের সামনে যে জঙ্গুলে চরটা আছে, সেখানে অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করো। দু-জনে কাজে নামলে একটা সাংঘাতিক কীর্তি করে ফেলব। দু-জনেই কোটিপতি হয়ে যাব। বাকি সব কথা মুখোমুখি হবে। তবে সাবধান, গোপনে একা যাবে। আমার পেছনে গোয়েন্দা লেগেছে। ইতি,

তোমার গুণমুগ্ধ পাঁচু।'

বললুম, 'পাঁচু কে?'

খিখি করে হাসলেন চন্দ্রকান্ত, 'বুঝলেন না? সেই চোর ধাতুবিজ্ঞানী ত্রিভুবন দাশ। ওর ডাকনাম পাঁচু। বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।'

কর্নেল বললেন, 'হালদারমশাইয়ের ফ্ল্যাটে পাওয়া চিঠিটার হাতের লেখার সঙ্গে ওই লেখার মিল আছে, কীভাবে পেলেন এটা?'

'গেটের লেটার বক্সে,' চন্দ্রকান্ত চাপা গলায় বললেন, 'চিঠিটা গতকাল সকালে আবিষ্কার করেছি। কিন্তু আমার ব্যাপার তো জানেন! কম্পিউটারে হিসেব-নিকেশ না করে কোনো সিদ্ধান্ত নিই না। কাল সারাদিন এই নিয়ে খুব পরিশ্রম করলুম। প্রতিবার কম্পিউটার থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছিল। অর্থাৎ পাঁচুর সংসর্গে গেলেই বিপদে পড়ব। গত রাতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, জয়ন্তবাবু কোন এক ফকিরের হারানো পান্নার কথা বলছিলেন। তারপর আপনিও জিজ্ঞেস করেছিলেন, মহাজাগতিক তেজস্ক্রিয় রশ্মিতে কোনো অ-তেজস্ক্রিয় খনিজ ধাতুরশ্মির সাহায্যে ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব কি না! ব্যাস! পাঁচুর চিঠির ডাটা আর আপনাদের দু-জনকার বক্তব্যের ডাটা একসঙ্গে কম্পিউটারে ফিড করলুম। রেজাল্ট বেরিয়ে এল: 'গো! চলে যাও। সুতরাং চলে এলুম।'

বললুম, 'আপনি বলেছিলেন হারানো পান্নাটা আড়াইশো কিলোমিটার দূরে আছে। আগে সেটা খুঁজে দেখা উচিত।'

চন্দ্রকান্ত মিটিমিটি হেসে বললেন, 'খুঁজতেই হবে। পাঁচুর উদ্দেশ্য তো বুঝে গেছি। 'সাংঘাতিক কীর্তি' মানে মারণাস্ত্র। কোনো ধনী দেশের কাছে সেটা বেচলেই কোটিপতি হয়ে যাবে পাঁচু। এখন ওর দরকার একটা বড়ো সাইজের রত্ন।'

কর্নেল বললেন, 'বাচ্চু ফকিরের হারানো পান্নাটা পেলে পাঁচুবাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।'

চন্দ্রকান্ত জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা সিগারেট-লাইটারের মতো যন্ত্র বের করলেন, 'এটা একটা ডিটেক্টর। সাধারণ মেটাল-ডিটেক্টর বলতে যা বোঝায়, তা নয়। এটা হল নন-রেডিয়ো অ্যাক্টিভ মেটাল-রে-ডিটেক্টর।' উঠে দাঁড়ালেন বিজ্ঞানী। খুট করে যন্ত্রটার বোতাম টিপে চালু করলেন। ক্ষীণ পিঁপিঁ শব্দ শোনা গেল। অমনি চন্দ্রকান্ত প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'খোঁজ পাওয়া গেছে!'

চন্দ্রকান্ত এদিকে-ওদিকে যন্ত্রটা বাগিয়ে ধরে এগোচ্ছেন, পিছোচ্ছেন। ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে হাঁটাচলা করছেন। কখনো পিঁপিঁ আওয়াজটা বেড়ে যাচ্ছে, কখনো কমে যাচ্ছে। পাথুরে বাঘটার কাছে গিয়ে বললেন, 'শুনছেন তো? সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি এখানেই বেশি। তার মানে এখানেই আছে। কিন্তু এ-জিনিসটা তো নিরেট পাথর। আরে! এ তো দেখছি একটা পাথরের বাঘ!'

কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ। মহাবলদেব।'

'আসুন তো এটাকে সরিয়ে দেখি।'

তিন জনে চেষ্টা করেও পাথুরে বাঘটাকে নড়ানো গেল না। দরদর করে ঘাম ঝরছিল। বাতাস বন্ধ। হাত ব্যথা করছিল। কর্নেল বললেন, 'একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার চেষ্টা করা যাবে।'

যন্ত্রটার সুইচ অফ করে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'এই বাঘের তলায় পান্নাটা লুকোনো আছে। ধুন্ধুকে সঙ্গে আনতে পারলে ভালো হত। এটাকে তুলে দূরে ছুড়ে ফেলত।'

'তার আগে আপনাদের ছুড়ে ফেলা হবে, একেবারে পদ্মায়।'

আচমকা এই হুমকি শুনে তিন জনেই ঘুরে দাঁড়ালুম। পেছনে ভাঙাচোরা কয়েকটা পাথুরে থাম ঘিরে যথেষ্ট ঝোপ গজিয়েছে। আর সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং শেঠমশাই। তাঁর পাশে গোবিন্দ পালোয়ান।

কর্নেল বললেন, 'আসুন শেঠমশাই! আপনি এখানেই আসবেন, জানতুম। তবে এমন অসময়ে দিনদুপুরে এসে পড়বেন ভাবিনি।'

শেঠমশাই এগিয়ে এসে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'কে ইনি?'

'প্রখ্যাত বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চৌধুরী।'

'বিজ্ঞানী হোন আর যাই হোন, ওঁর কথাবার্তা ভালো নয়,' শেঠমশাই বললেন, 'মহাবলদেবকে উনি ছুড়ে ফেলার কথা বলছিলেন! মহাবলদেব এখন ঘুমোচ্ছেন বলেই পার পেয়ে গেলেন।'

চন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে বললেন, 'ঘুমোচ্ছেন? একেবারে সাউন্ড স্লিপ দেখছি! অবশ্য জ্যান্ত বাঘ এমন কাত হয়ে শুয়েই ঘুমোয়। কিন্তু এটা তো মরা বাঘ!'

শেঠমশাই খাপ্পা হয়ে বললেন, ‘মরা বাঘ মানে?’

চন্দ্রকান্ত খিখি করে হাসলেন, ‘মরা বই কী। পাথুরে বাঘ মরা ছাড়া আর কী?’

‘গোবিন্দ!’ শেঠমশাই হাঁকলেন। ‘এই বিজ্ঞানী না টিজ্ঞানিকে পদ্মায় চান করিয়ে নিয়ে আয়।’

গোবিন্দ চন্দ্রকান্তের দিকে এগিয়ে এলে কর্নেল মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আহা, এই বিপদের সময় গণ্ডগোল করা ঠিক নয়, শেঠমশাই! চন্দ্রকান্তবাবু বোধকরি ফসিলাইজড বাঘের কথাই বলতে চাইছেন। চন্দ্রকান্তবাবু, ইনিই সেই শেঠমশাই, যাঁর নাতিদের কিডন্যাপ করা হয়েছে।’

চন্দ্রকান্ত নমস্কার করে বললেন, ‘তাই বলুন। আমার আজকাল কী হয়েছে, নিজের স্মৃতি কাজ করে না। হাতের কাছে কম্পিউটার থাকলে ঠিকই জানিয়ে দিত, আপনিই তিনি।’

কর্নেল বললেন, ‘শেঠমশাই কি তাহলে বাচ্চু ফকিরের পান্নাটা দিয়ে নাতিদের উদ্ধার করতে এলেন?’

শেঠমশাই গম্ভীর মুখে বললেন, ‘উপায় কী? আপনি তো কিছুই করতে পারলেন না। এখন আপনাদের অনুরোধ করছি, এখান থেকে চলে যান। পান্নাটা বের করে আমি শিবমন্দিরে গিয়ে বসে থাকব। ওরা কোমল-কোরককে সঙ্গে নিয়ে এলে তবেই পান্না দেব। নইলে গোবিন্দ যা করার করবে।’

কর্নেল একটু হেসে সেই ছড়াটা আওড়ালেন:

‘দুই ডাক বাট

উত্তরে হাঁট

ঘাটে মহাবল

তার নীচে জল

ওইখানে থাম

সিদ্ধ মনস্কাম!’

শেঠমশাই অবাক হয়ে বললেন, ‘আপনি এ ছড়া জানেন দেখছি! কোথায় শুনলেন এ ছড়া?’

‘শ্রীমান কোরকের খাতার পাতায় লেখা ছিল,’ কর্নেল বললেন, ‘তাহলে দেখছেন, ছড়াটার সূত্র আমি ঠিকই ধরতে পেরেছি এবং সঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছি।’

‘পৌঁছেছেন। কিন্তু এখনও হাতড়ে বেড়াচ্ছেন অন্ধের মতো।’ শেঠমশাইয়ের মুখে বিদ্রূপ ফুটে উঠল, ‘খুঁজে বের করতে পারেননি। পারবেনও না।’

চন্দ্রকান্ত তাঁর খুদে যন্ত্রটা বাগিয়ে ধরে বললেন, ‘আমি পারব।’ বলে গোবিন্দকে ডাকলেন, ‘এই ভাই পালোয়ান! একটু হেল্প করো তো! এই বাঘটা, সরি, মহাবলদেবকে একটু উলটে দাও তো!’

যন্ত্রটা আবার পিঁপিঁ করে চ্যাঁচাতে থাকল। কর্নেল বললেন, ‘থাক, চন্দ্রকান্তবাবু! শেঠমশাইয়ের মন ভালো নেই। গোবিন্দকেও ঘাঁটাবেন না। কারণ, আপনার ধুন্ধু এখন কাছে নেই।’

চন্দ্রকান্ত গোবিন্দের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে যন্ত্রটা বন্ধ করলেন। কর্নেল এদিকে-সেদিকে একটুখানি পায়চারির ভঙ্গিতে হাঁটাচলা করার পর হঠাৎ চমকে দেওয়া কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, 'পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি!'

শেঠমশাই ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তাই বুঝি? কই? বের করুন দেখি।'

কর্নেল মহাবলদেবের মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে একটা ভেঙে-পড়া নিটোল পাথরের থাম বিঘত খানেক উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওপরের দিকটা ভেঙে পড়ে ঝোপের ভেতর কয়েক টুকরো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এতক্ষণে লক্ষ করলুম, এই মহাবলদেবের রীতিমতো একটা থামওয়ালা মন্দির ছিল। ছাদের টুকরোগুলো কবে সরিয়ে সম্ভবত মহাবলদেবকে পুঃনপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু কাজটা এগোয়নি। হয়তো এই সীমান্ত এলাকায় দু-দেশের ফৌজি সংঘর্ষই তার কারণ। কর্নেল হাঁটু মুড়ে সেই থামটার গোড়ার দিকে ঝুঁকে পড়তেই শেঠমশাই বললেন, 'কর্নেল! আপনার জিত।'

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার রচিত ছড়ায় আছে: 'ওইখানে থাম। সিদ্ধ মনস্কাম।' আমি ভেবেছিলুম, থামতে বলা হচ্ছে। কিন্তু আসলে আপনি একটা থাম বা স্তম্ভের কথাই বলেছেন। 'ঘাটে মহাবল/তার নীচে জল।' এখানে ঘাটের ধাপ দেখতে পাচ্ছি। বালিতে ঘাটটা অবশ্য তলিয়ে গেছে। কিন্তু একসময় এখানে জল ছিল। 'তার নীচে জল/ওইখানে থাম/সিদ্ধ মনস্কাম।' এই থামটাই ঘাটের ধারে টিঁকে থাকা শেষ থাম। কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, থামটার নীচে একটা ছিদ্র। কুশঘাসের আড়ালে ছিদ্রটা ঢাকা পড়েছে। ওই ছিদ্রটা একটা তালা বলেই মনে হচ্ছে।'

শেঠমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, তালা।'

'এই তালার চাবি আপনার কাছে আছে?'

'আছে।'

'আপনার হাতের ওই মোটা ছড়ির বাঁটের ভেতর লুকনো আছে।'

শেঠমশাই হঠাৎ একটু চটে গেলেন, 'এত আপনার বুদ্ধিসুদ্ধি, অথচ আমার নাতিদের উদ্ধার করতে পারলেন না? আমাকে কিডন্যাপারদের দাবি মেনে নিতে কষ্ট করে ছুটে আসতে হল!'

কর্নেল হাসলেন, 'কোমল-কোরকের জন্য ভাববেন না, শেঠমশাই!'

'ভাবব না? কী বলছেন আপনি?'

'শেঠমশাই, আগে আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিন। তারপর আপনার নাতিদের উদ্ধারের চেষ্টা করব।'

'কী আপনার প্রশ্ন?'

'আপনার ব্যাঙ্কের আলমারি থেকে সত্যিই কি বাচ্চু ফকিরের পান্না চুরি গিয়েছিল?'

শেঠমশাই ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বললেন, 'পুরোনো কথা চাপা আছে, চাপা থাক।'

'শেঠমশাই! পান্না চুরি যায়নি। যায়নি, তার একমাত্র কারণ, ওটা এই থামের ভেতর লুকোনো আছে।'

শেঠমশাই একবার কর্নেলের দিকে তাকিয়ে মুখ নামালেন। কিছু বললেন না।

কর্নেল বললেন, 'আপনার ব্যাঙ্কের লগ্নিকরা টাকা অনাদায় হওয়াতে বিপদে পড়েছিলেন। আমানতকারীরা টাকার দাবিতে মামলা করেছিল। তাই পান্নাটা গোপনে বেচে তাদের টাকা শোধ করার মতলবে বাচ্চু ফকিরকে বলেছিলেন, ওটা হারিয়ে গেছে। বাচ্চু ফকির অভিশাপ দিয়ে চলে যান। তারপরই আপনার স্ত্রী দরিয়াগঞ্জের শিবমন্দিরে পুজো দিতে এসে স্নান করার সময় পদ্মায় তলিয়ে যান। অমনি আপনি ভয় পেয়ে যান।'

'কে বলল এসব কথা?'

কর্নেল হাসলেন, 'আপনার ব্যাঙ্ক সম্পর্কে খোঁজখবর, কলকাতায় পুরোনো রেকর্ড ঘেঁটে জেনে এসেছি। আর আপনার স্ত্রীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু সম্পর্কে দরিয়াগঞ্জে বিশদ তদন্ত করেছি। তা ছাড়া আপনি নিজেও এসব ঘটনা সংক্ষেপে বলেছেন আমাকে। শুধু বলেননি যে, পান্নাটা সত্যিই চুরি যায়নি। আমাকে আপনি বলেছেন, বাচ্চু ফকিরের কাছে ক্ষমা চাইতে বহুবার দরিয়াগঞ্জ ছুটে এসেছেন। কিন্তু তাঁর খোঁজ পাননি। ক্ষমা চাইতে নয়, বাচ্চু ফকিরকে তাঁর পান্না ফেরত দিতেই আসতেন আপনি। অভিশাপের ভয়ে হোক, আর অনুশোচনাবোধ হোক, পান্না ফেরত দিতে চাওয়ার মধ্যে আপনার বিবেকই কাজ করেছে। আপনার প্রশংসা করছি, শেঠমশাই।'

শেঠমশাই দুঃখিত মুখে বললেন, 'বাচ্চু ফকিরের খোঁজ না পেয়ে ঠিক করেছিলুম, পান্নাটা কোথাও লুকিয়ে রাখা দরকার। এখানে এই বেদিটা দেখছেন, এর ওপর মহাবলদেবের ওই মূর্তিটা ছিল। এখানে একটা গাছ ছিল মাত্র। কোনো মন্দির ছিল না। কিছু জমি বেচে আর লোকের কাছে চাঁদা তুলে সাতটা থামের মাথায় ছাদ বসিয়ে মন্দির তৈরি করে দিয়েছিলুম। এই জায়গাটা তখন দরিয়াগঞ্জেরই অংশ ছিল। ধ্বংসস্তূপে প্রচুর পাথরের থাম পড়ে ছিল-এখনও আছে। সেইসব থাম জোড়া দিয়ে কম খরচায় কোনো রকমে একটা মন্দির গড়া। আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল, রত্নটা লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। মন্দির গড়া হয়ে গেলে কলকাতা থেকে একজন বিশ্বস্ত রাজমিস্ত্রি এনে ওই থামটার গোড়া খোদাই করে লকার বানিয়ে নিয়েছিলুম। রাত্রিবেলা গোপনে লকার তৈরি করে দিয়েছিল সে।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'থামে কেন? বেদিতেই তো ভালো লকার তৈরি করা যেত!'

শেঠমশাই চটে গেলেন, 'কেন বেদিতে লকার বানিয়ে নিইনি, তা বোঝবার মতো বুদ্ধি আপনার নেই! বেদিতে করলে লোকের চোখে পড়ত না? পুজো দিতে এসে বেদিপ্রদক্ষিণ করার সময় তালার ছেঁদা চোখে পড়ত, আর তাই নিয়ে মাথা ঘামাত সবাই।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ঠিক, ঠিক। কিন্তু ওই বিশেষ থামটাই বেছে নিয়েছিলেন কেন?'

শেঠমশাই চার্জ করলেন, 'আপনি তো সায়েন্টিস্ট। পাথর চেনেন? কতরকম পাথর আছে জানেন? সব পাথরে সব কাজ হয় না, বোঝেন?'

চন্দ্রকান্ত থামটার কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে হাসিমুখে ঘুরলেন, 'ইউ আর রাইট শেঠমশাই! তবে আপনি একটু ভুলও করেছেন। মাত্র ইঞ্চি ছয়েক ভুল।'

'ইঞ্চি ছয়েক ভুল মানে?'

'থামের তলার দিকটা ছ-ইঞ্চি গ্র্যাফাইট। কালো সিসে দিয়ে তৈরি। ওপরটা গ্র্যানিট পাথর।'

শেঠমশাই পা বাড়িয়ে বললেন, 'অত আমি বুঝি না। মিস্ত্রি সব থাম পরীক্ষা করে দেখে বলেছিল, এইটাতে কাজ হবে।' বলে ছড়ির বাটটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুললেন। একটা চাবি

বের করে থামটার কাছে বসলেন। তারপর সেই অদ্ভুত লকার খুলে একটা কালো রঙের ছোট্ট চারকোনা কৌটো বের করলেন। কৌটোটা পকেটে ঢুকিয়ে লকারটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন শেঠমশাই।

কর্নেল চুপচাপ দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিলেন। বললেন, 'আপনি কি এবার শিবমন্দিরে যাবেন শেঠমশাই?'

'হ্যাঁ। আপনারা কেটে পড়ুন এখান থেকে,' শেঠমশাই গম্ভীর মুখে বললেন, 'আপনাদের দেখলে কিডন্যাপাররা ভড়কে যাবে। দুর্বৃত্তদের বিশ্বাস করা যায় না। কোমল-কোরকের একটা ক্ষতি করে বসলে আমি আর বাঁচব না। আয় গোবিন্দ!'

'আর একটা প্রশ্ন ছিল, শেঠমশাই!'

'বলুন।'

'মহাবলমন্দিরের কোনো ফটো তুলিয়েছিলেন কি?'

'হ্যাঁ,' শেঠমশাই পা বাড়িয়ে বললেন, 'ফটোটা বাঁধিয়ে রেখেছিলুম। আমার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। কিন্তু...'

'সেটা চুরি গেছে!'

শেঠমশাই একথায় একটুও অবাক না হয়ে বললেন, 'গেছে। কোমল-কোরকই হয়তো দুষ্টুমি করে লুকিয়ে রেখেছে কোথাও।'

আমরা তিন জনে তাকিয়ে রইলুম। শেঠমশাই আর গোবিন্দ গাছপালার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটু পরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ইস! কী কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে! পাঁচু পান্নাটা হাতাবে এবং ভয়ংকর মারণাস্ত্র তৈরির চেষ্টা করবে। আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে, কর্নেল! কেন যে ধুন্ধুকে সঙ্গে আনলুম না!'

আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম, তার একটু তফাতে একটা ঝাঁকড়া গাছ। হঠাৎ কর্নেল সেই গাছটার কাছে গিয়ে পকেট থেকে রিভলবার বের করে কাউকে বললেন, 'দশ গোনা পর্যন্ত নেমে না এলে গুলি ছুড়ব বলে দিচ্ছি। ওয়ান... টু... থ্রি... ফোর...'

ঝাঁকড়া গাছ থেকে হনুমানের মতো ঝুপ করে কেউ লাফিয়ে পড়ল। আমার বয়সি এক যুবক। মুখে করুণ হাসি। প্যান্ট-শার্টে প্রচুর কাদার ছোপ। কর্নেল হো-হো করে হেসে বললেন, 'জয়ন্ত! এই তোমার সেই সন্দেহভাজন লোকটি। অবশ্য বেচারার গোঁফ-গালপাট্টা-পরচুলা আমার হস্তগত হয়েছে! একটু ভুল বোঝাবুঝিতে এই সেমসাইড ঘটে গেছে আর কি!' কর্নেল রিভলবার পকেটস্থ করে বললেন, 'না, তপোব্রতবাবু! আপনার ভয় পাওয়ার কারণ নেই। কোমল-কোরকের হাত দিয়ে চক্রান্তের ব্যাপারটা জানিয়ে আপনি ঠিক কাজই করেছিলেন। হরবাবুর ভয়ে আপনি মুখ খুলতে সাহস পাননি। আমি জানি চিড়িয়াখানা থেকে কোমল-কোরক কিডন্যাপড হওয়ার পর আপনি তাদের উদ্ধারের জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছেন। এখানে পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। তবে ওই যে বললুম, গতরাতের ঘটনাটা নেহাত ভুল বোঝাবুঝি।'

আমি বোকা বনে দাঁড়িয়ে আছি। জীবনে এমন বোকা কখনো বনিনি। ব্যাপারটা আঁচ করে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত বেজায় হেসে বললেন, 'কী অদ্ভুত! কী অদ্ভুত!'

কর্নেল বললেন, 'তার চেয়ে অদ্ভুত হালদারমশাইয়ের অন্তর্ধান।'

বললুম, 'কিন্তু শিবমন্দিরে কী ঘটেছে, চুপিচুপি গিয়ে আমাদের দেখা উচিত। যদি সত্যি ত্রিভুবন দাশ ওরফে পাঁচুবাবুকে শেঠমশাই পান্নাটা দিয়ে ফেলেন, সর্বনাশ হবে।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'পৃথিবীর মৃত্যু ঠেকানো যাবে না। মারণাস্ত্র তৈরি করে পাঁচু কোনো দেশকে বেচবে। কোটিপতি হবে। তারপর যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে, সেই দেশ ভয়ংকর অস্ত্রটা ব্যবহার করলেই, ব্যাস! আর দেখতে হবে না। এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা মড়ার খুলি হয়ে মহাকাশে ভেসে বেড়াবে।' :

বিজ্ঞানী দু-হাতে চুল আঁকড়ে ধরে ধুপ করে বসে পড়লেন। কর্নেল হাসলেন, 'তার অনেক দেরি, চন্দ্রকান্তবাবু! তার আগে যদি পদ্মার তাজা ইলিশের ঝোল খেতে চান, প্যালেস হোটেলে চলুন। ভেবে দেখুন, আপনার তৈরি সিন্থেটিক ইলিশ নয়, সুস্বাদু সত্যিকার ইলিশ।'

চন্দ্রকান্ত লাফিয়ে উঠলেন। স্লোগান হাঁকার মতো বললেন, 'জিভে জল আসছে! জিভে জল আসছে! পদ্মার ইলিশ!'

তপোব্রতবাবু বললেন, 'কিন্তু শিবমন্দিরে এতক্ষণে কী হচ্ছে...'

তাঁকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, 'শিবমন্দিরে গিয়ে শেঠমশাই আর গোবিন্দ এতক্ষণে ভড়কে গেছেন। ঝগড়াঝাঁটি হওয়াও অসম্ভব নয়। গোবিন্দ পালোয়ান যা গোঁয়ার!'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'গোঁয়ারগোবিন্দ কথাটা শুনেছি বটে। কিন্তু সেখানে ঝগড়া হচ্ছে কেন?'

'একদঙ্গল পুলিশ লাঠি-বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গত রাতে শেঠমশাইয়ের আসা দেখেই বুঝেছিলুম, বাচ্চু ফকিরের পান্না বের করে নিয়ে শিবমন্দিরে হাজির হবেন। তাই সকালে থানায় গিয়ে ওই ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

'সর্বনাশ!' তপোব্রত শিউরে উঠলেন, তাহলে যে কোমল-কোরককে ওরা মেরে ফেলবে।'

কর্নেল সেকথায় কান দিলেন না। বললেন, 'চন্দ্রকান্তবাবু, আপনি অবশ্য ইচ্ছে করলে গ্লাইডারে উড়ে প্যালেস হোটেলের ছাদে অবতরণ করতে পারেন। ভেবে দেখুন, উড়ে যাবেন না, না আমাদের সঙ্গী হবেন?'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'বড্ড টায়ার্ড। একটানা উড়ে গা ব্যথা করছে।'

'তাহলে আপনার গ্লাইডারের বোঁচকাটা কোথাও লুকিয়ে রাখা যাক।'

ঝোপের ভেতর ওটা লুকিয়ে রাখার পর আমরা দক্ষিণে পদ্মার সেই খাতের দিকে এগিয়ে গেলুম। যেতে যেতে বললুম, 'কিন্তু নৌকো না পেলেই সমস্যা। তখন ওই নৌকোটাকে অমন করে বিদায় না দেওয়াই উচিত ছিল।'

কর্নেল বললেন, 'ভেবো না। আমরা শেঠমশাইয়ের নৌকোয় যাব। ওঁরা নিশ্চয় চন্দ্রকান্তবাবুর মতো উড়ে আসেননি!'

খাতের ধারে পৌঁছে দেখি, সত্যিই একটা ছোট্ট পানসি-নৌকো বাঁধা। নৌকোর মাঝি অবাক চোখে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। আমরা একে একে তার পানসিতে উঠতে শুরু করলে তার সংবিৎ ফিরল। আপত্তি করে বলল, 'একী বাবুমশাইরা! এটা খেয়ানৌকা নয়। শেঠমশাই ভাড়া করে এনেছেন।'

কর্নেল তার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, 'শেঠমশাই ফেরার আগে তুমি আমাদের পৌঁছে দিয়ে এসো। ওঁর ফিরতে দেরি হবে। উনি এখন ঝগড়া করছেন মন্দিরে।'

টাকাটা মাঝির উপরি রোজগার। সে দেরি করল না। আমাদের পারে পৌঁছে দিয়ে তারপর প্রাণপণে নৌকো বেয়ে সবুজ চরটার দিকে আবার পাড়ি জমাল।

প্যালেস হোটেলের ফটকে পৌঁছে কর্নেল বললেন, 'চন্দ্রকান্তবাবু, সেই লেসার-ল্যাসো সঙ্গে এনেছেন তো? ওটা দরকার হতে পারে।'

চন্দ্রকান্তের পিঠে একটা ব্যাগ আটকানো। বললেন, 'এর মধ্যে আছে। কিচ্ছু ভাববেন না। পাঁচুর চুরি-করা ফর্মুলায় তৈরি সবুজ আলোর বলটাকে বন্দি না করে আমার সোয়াস্তি নেই। আসলে যন্ত্রটার সামান্য ত্রুটি ছিল। শুধরে নিয়েছি। এবার দেখবেন, বল-বাছাধন সুড়ুৎ করে এসে পায়রার মতো খোপে ঢুকবে।'

হোটেলের লবিতে ঢুকে থমকে দাঁড়ালুম। সোফার এককোনে পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসে বা শুয়ে আছেন স্বয়ং গোয়েন্দা কে.কে. হালদার! চোখ বন্ধ। হাঁ-করা মুখ। নাকও ডাকছে এবং মাথায় ব্যান্ডেজ!

কর্নেলের ডাকে তড়াক করে উঠে ঘুসি পাকিয়ে বললেন, 'তবে রে!'

বলেই জিভ কাটলেন। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। কর্নেল বললেন, 'স্বপ্ন দেখছিলেন হালদারমশাই?'

হালদারমশাই কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'সরি, ভেরি সরি, কর্নেল স্যার!'

'মাথায় ব্যান্ডেজ কেন?'

'সব বলছি, চলুন। প্রচুর রহস্য! প্রচুর!'

কর্নেল আমাদের দোতলার ঘরে যেতে বলে ক্যান্টিনের দিকে গেলেন। গেস্ট আছে, জানাতেই গেলেন হয়তো। একটু পরে ওপরের ঘরে ফিরে হালদারমশাইকে বললেন, 'কাল বিকেলে আপনার বাসস্ট্যান্ডে থাকার কথা। আমি খুব ভাবনায় পড়েছিলুম, আপনার কোনো বিপদ হল নাকি। ব্যান্ডেজ দেখে বুঝতে পারছি, সত্যিই বিপদ হয়েছিল।'

হালদারমশাই বললেন, 'প্রচণ্ড বিপদ, প্রচণ্ড! আগের দিন বিকেলে হরবাবুর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে গিয়ে প্রথম বিপদ।'

'হোসেনের বউয়ের পাল্লায় পড়েছিলেন!'

'জানেন দেখছি,' হালদারমশাই অবাক হলেন, 'উঃ! মেয়েটার গায়ে কী জোর, ভাবা যায় না। এই দেখুন, জামার কলারের কী অবস্থা করেছে! নতুন জামা!'

'কিন্তু মাথায় ব্যান্ডেজ কেন?' কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'হোসেনের লাঠির ঘা খাননি তো?'

হালদারমশাই স্বীকার করলেন, 'ঠিক ধরেছেন। আপনাকে থানা থেকে ট্রাঙ্ক কল করে ফের হরবাবুর ওপর নজর রাখতে গিয়েছিলুম। এবার আর পাঁচিল ডিঙোতে সাহস পাইনি। অন্ধকারে একটা ঝোপের ভেতর ঘাপটি মেরে বসেছিলুম। কুকুরটা মহা বিচ্ছু। পেছনে লাগল আবার। যেই উঠতে গেছি, হঠাৎ পেছন থেকে টর্চের আলো। তারপর মাথায় লাঠির ঘা। অন্য কেউ হলে ভিরমি খেয়ে পড়ে থাকত। পুলিশ-লাইফে এমন অনেক বিপদ গেছে। কাজেই বিপদেও মাথা ঠিক থাকে। রক্তারক্তি হলেও।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'তারপর? তারপর?'

'তারপর আর কী?' হালদারমশাই ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'মাথা ফেটে রক্তারক্তি হলে দৌড়ে পালাতেই হয়। তারপর সোজা হাসপাতালে যেতে হয়। কিন্তু আমার বেলায় সমস্যা হল। ডাক্তারবাবু কিছুতেই ছাড়বেন না। বলেন, এ অবস্থায় হাঁটাচলা করলে মারা পড়বেন। খামোকা বেডে শুইয়ে রাখলেন। কী বিপদ দেখুন।'

কর্নেল বললেন, 'হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসেননি তো হালদারমশাই?'

'আসতেই হল। উপায় কী? এ সময়ে হাসপাতালে শুয়ে থাকা চলে?'

'দরিয়াগঞ্জে আপনি উঠেছেন কোথায়?'

'অন্নপূর্ণা হোটেলে। বাসস্ট্যান্ডের কাছে। এ আমার চেনা জায়গা, কর্নেল স্যার! বহুবছর আগে এই থানার চার্জে ছিলুম।'

'হরবাবুর বাড়িতে সন্দেহজনক কিছু কি দেখেছেন?'

'দেখেছি। একজন বেঁটে হোঁতকা মোটা লোক হরবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'পাঁচু! পাঁচু!'

হালদারমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, 'পাঁচু-ফাঁচু কি না জানি না। বারান্দায় বসে দু-জনে কথা বলছিল। বার কতক 'বাঘ' কথাটা কানে এল। শুনতে পাব কী, খেঁকি কুকুরটার যা চ্যাঁচানি! তারপর লোকটা চলে গেল। ঠিক সেই সময় দজ্জাল মেয়েটা এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। টানতে টানতে হরবাবুর কাছে নিয়ে গেল। হরবাবু হাঁক দিলেন, আলকুশি নিয়ে আয়! বেগতিক দেখে এক নিশ্বাসে ওঁর স্টুডিয়োতে হামলা আর ডনের মৃত্যুসংবাদ দিলুম। তখন কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকার পর হরবাবু আমাকে শাসিয়ে গালমন্দ করে ছেড়ে দিলেন। আমি থানায় গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে ট্রাঙ্ক কলের চেষ্টা করলুম। লাইন পেলুম রাত দশটায়। তখন আপনাকে বাঘের কথাটা জানালুম, কর্নেল স্যার! ঠিক কি না?'

'ঠিক, তারপর আবার ওত পাততে গিয়ে হোসেনের লাঠি খেলেন,' কর্নেল হাসলেন, 'তখন আর কিছু দেখেছেন কি হালদারমশাই?'

হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন, 'এক পলকের দেখা। ভুল হতেও পারে। একটা ঘরের জানালা খোলা ছিল। ভেতরে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় মুখোশপরা খুদে দুটো মূর্তি, কোমল আর কোরককেই যেন খেলতে দেখেছি। ভালো করে দেখার আগেই মাথায় লাঠি।'

শুনে আমি চমকে উঠলুম। তপোব্রতবাবুও নড়ে বসলেন। বললেন, 'আমার অনুমানই ঠিক। হরবাবু শনিবার এখানে আসছেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু রাত্তিরে

কলকাতাতেই কোথাও ছিলেন। এই হল এক নম্বর পয়েন্ট। দু-নম্বর পয়েন্ট, রবিবার চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়ার জন্য কোমল-কোরককে উনিই প্ররোচিত করেছিলেন।'

কর্নেল বললেন, 'এবং আপনার সঙ্গেই যাওয়ার জন্য, যাতে কিনা দোষটা আপনার ঘাড়ে পড়ে।'

'ঠিক বলেছেন,' তপোব্রত বললেন। 'তিন নম্বর পয়েন্ট হল, হরবাবু নিশ্চয় চিড়িয়াখানার ভেতর ওত পেতে অপেক্ষা করছিলেন। আমি ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের ছায়ায় বসেছিলুম। আর কোমল-কোরক 'স্টার-ওঅর' খেলছিল। একটু পরে মুখ তুলে দেখি, ওরা নেই। এবার বুঝতে পারছি, কাকু দূর থেকে ইশারায় ওদের ডাকছেন দেখেই ওরা তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছিল। তারপর উনি ওদের নিয়ে উধাও হন। এদিকে আমি খুঁজে সারা। কোনমুখে শেঠমশাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াব, এই ভেবে অস্থির।'

হালদারমশাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা শুনছিলেন। বললেন, 'এঁকে তো চিনতে পারলুম না। কে ইনি?'

কর্নেল বললেন, 'ইনিই কোমল-কোরকের প্রাইভেট টিউটর তপোব্রতবাবু।'

হালদারমশাই নস্যি নিয়ে বললেন, 'বড্ড গোলমেলে ব্যাপার।'

আমি বললুম, 'কর্নেল! হরবাবু তাঁর বাবাকে বলছিলেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কোমল-কোরকের কোনো ক্ষতি হবে না। তার মানে, ওরা ত্রিভুবন দাশ ওরফে পাঁচুবাবুর...'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ফের বাবু? পাঁচুচোর বলুন!'

'বেশ। পাঁচুই বলছি,' হাসতে হাসতে বললুম। 'কোমল-কোরক পাঁচুর পাল্লায় পড়েনি। হরবাবু তাঁর বাবাকে এভাবে চাপ দিয়ে পান্নাটা আদায় করতে চেয়েছেন। পান্নাটা পেলে তখন পাঁচুকে বেচবেন।'

তপোব্রত বললেন, 'ঠিক তাই। কিন্তু গত রাতে শেঠমশাই এসেছেন। কোমল-কোরককে তাহলে কোথায় লুকিয়ে রাখলেন হরবাবু? আমি গত রাতে মন্দিরের চরে সবুজ আলো দেখার পর সাঁতার কেটে ওখানে গেছি। কোনো হদিশ করতে পারিনি। বালিয়াড়িতে শুয়ে রাত কাটিয়েছি। তারপর সকালেও খুঁজে বেড়িয়েছি। শেষে পাথরের বাঘটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় কর্নেল আর জয়ন্তবাবুকে আসতে দেখলুম। সঙ্গেসঙ্গে গাছে চড়ে গা-ঢাকা দিলুম।'

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, 'একটা বাজে। ক্যান্টিনে যাওয়া যাক। খিদে পেয়েছে।'

হালদারমশাই বললেন, 'আমি অন্নপূর্ণা হোটেলেই যাই। হোটেলের মালিক আমার চেনা লোক। বলা আছে, ফিরতে দেরি দেখলে চিন্তাভাবনা কোরো না। তবে বলা যায় না কিছু।'

কর্নেল বললেন, 'ঠিক আছে। খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে নিন গিয়ে। সময়মতো আপনাকে খবর দেব।'

একটু পরে নীচের ক্যান্টিনে চন্দ্রকান্তবাবু হাপুস-হুপুস করে ইলিশের ঝোল খেতে খেতে বললেন, 'বহুকাল বাদে পদ্মার টাটকা ইলিশ খাওয়ার সুযোগ দেখছি পাঁচুই দিল আমাকে। দেখা হলে প্রথমে সেজন্য ওকে ধন্যবাদ দেব। তারপর লেসার-ল্যাসো বের করব। কী বলেন কর্নেল?'

কর্নেল বললেন, 'ত্রিভুবন দাশ খুব ধূর্ত লোক, চন্দ্রকান্তবাবু!'

'জানি,' চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ওর কাছাকাছি যাব না। দূর থেকে ধন্যবাদ দেব।'

দুবেজি এলেন হঠাৎ। 'কর্নেল, আপনার ফোন।'

কর্নেল এঁটো হাতে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। দুবেজি আমাদের খাওয়ার তদারকে ব্যস্ত হলেন। সেই সময় মুচকি হেসে বললুম, 'দুবেজি, আপনার আট নম্বর রুমের ভদ্রলোকের কী খবর?'

দুবেজি বাঁকা মুখে বললেন, 'স্মাগলার! স্মাগলার! বি.এস.এফ. গুলি করে পদ্মায় ভাসিয়ে দিয়েছে। শকুনের ঝাঁক কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে।'

অমনি তপোব্রত চটেমটে বলে উঠলেন, 'কী বাজে কথা বলছেন মশাই? আমি স্মাগলার হতে যাব কোন দুঃখে?'

দুবেজি অবাক হয়ে বললেন, 'কী মুশকিল! আপনাকে কে স্মাগলার বলেছে? আমি আট নম্বর রুমের লোকটার কথা বলছি!'

'আমিই তো আট নম্বর রুম বুক করেছি।'

'তার মানে?' দুবেজি হকচকিয়ে গেলেন। 'আপনি বুক করলেন কখন?'

তপোব্রত পকেট থেকে একটা চাবি বের করে দেখালেন, 'এটা চিনতে পারছেন? প্যালেস হোটেল লেখা চাবি। রুম নম্বরও লেখা আছে।'

দুবেজি হতভম্ব। বললেন, 'কিন্তু সে তো অন্য লোক। ইয়া গোঁফ, গালপাট্টা! মাথায় পাখির বাসার মতো চুল! বয়স্ক লোক। আর আপনি তো একেবারে নিরীহ চেহারার ইয়াংম্যান।'

আমি এবং চন্দ্রকান্ত হাসছিলুম। বললুম, 'পরে সব কর্নেলের কাছে শুনবেন, দুবেজি! ইনিই তিনি। ছদ্মবেশে এসেছিলেন স্বপন মজুমদার নামে।'

দুবেজি মিনিট খানেক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন তপোব্রতের দিকে। তারপর ফোঁস করে চাপা শ্বাস ফেলে চলে গেলেন। একটু পরে কর্নেল ফিরে এলেন। জিজ্ঞেস করলুম, 'কার ফোন?'

'থানা থেকে অফিসার-ইন-চার্জ মুকুন্দবাবু জানালেন, কথামতো কাজ হয়েছে। তবে একটু ঝামেলাও হয়েছে। তিন জন কনস্টেবল আহত।'

চন্দ্রকান্ত ইলিশের কাঁটা চুষতে চুষতে বললেন, 'পাঁচুর গায়ে জোর আছে। ওকে আমরা বলতুম এলিফ্যান্ট-ম্যান।'

'পাঁচু নয়, চন্দ্রকান্তবাবু! গোবিন্দ!'

এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললুম, 'গোবিন্দের সঙ্গে পুলিশের ঝামেলা হয়েছে? আপনি শিবমন্দিরে ঝগড়া হতে পারে বলেছিলেন।'

কর্নেল বললেন, 'ঠিক ধরেছ, জয়ন্ত! মুকুন্দবাবুকে বলেছিলুম, শেঠমশাই শিবমন্দিরে গেলে যেন তাঁকে সসম্মানে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাই করতে গিয়ে গোবিন্দর সঙ্গে কনস্টেবলদের মল্লযুদ্ধ হয়ে গেছে। শেষে গোবিন্দর বুকে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে তাকে কাবু করা হয়েছে।'

চন্দ্রকান্ত বললেন, 'কাজটা ভালো ঠেকছে না। শেঠমশাইকে খামোকা গ্রেফতার করা মোটেই উচিত হয়নি।'

'খামোকা নয়, চন্দ্রকান্তবাবু!' কর্নেল তাঁর ঝোল-ভাতে হাত লাগালেন, 'ওঁর কাছে মূল্যবান একটা রত্ন আছে। তাই ওঁর নিরাপত্তার জন্যই এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে। শেঠমশাই এখন রত্নটা সমেত নিরাপদে পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন।'

তপোব্রত বললেন, 'কোমল-কোরকের বিপদ হবে না তো এবার?'

কর্নেল বললেন, 'আর একটু অপেক্ষা করুন, তপোব্রতবাবু! আশা করি, আজই এই রহস্য-অ্যাডভেঞ্চারের পালা শেষ হয়ে যাবে।'

চন্দ্রকান্ত হতাশমুখে বললেন, 'ধূর্ত পাঁচু এইসব গণ্ডগোল দেখে নির্ঘাত কেটে পড়েছে। সবুজ আলোর বলটা আমার হাতছাড়া হয়ে গেল!'

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, 'আপনার সঙ্গে তার মন্দিরের চরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ভুলে যাবেন না। চিঠি লিখে আপনাকে ডেকেছে ত্রিভুবন দাশ।'

চন্দ্রকান্ত এ-কথায় একটু উৎসাহ পেলেন যেন। খাওয়ায় মন দিলেন।

খাওয়ার পর দোতলায় গিয়ে আট নম্বর ঘরে তপোব্রত ঢুকলেন। আমরা ঢুকলুম দশ নম্বরে, আমাদের ঘরে। চন্দ্রকান্ত তাঁর ব্যাগ খুলে কয়েকটা বিদঘুটে গড়নের যন্ত্র বের করে খুটখাট শব্দে চাবি টিপতে থাকলেন। কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুরুট টানছেন। আমি অভ্যাসমতো ভাতঘুম ঘুমোনোর তালে আছি। সেই সময় বিরক্তিকর ডোর বেলের শব্দ। কর্নেল উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই হালদারমশাই ঢুকে দম-আটকানো গলায় বলে উঠলেন, 'প্রচণ্ড ঝগড়া, প্রচণ্ড। প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। পিস্তল বের করেছিল। অমনি হোসেনের লাঠির বাড়ি। কবজি ভেঙে গেছে ব্যাটাচ্ছেলের। দৌড়ে পিঠটান দিল। ফাঁকতালে একটা পিস্তল লাভ হয়ে গেল হরবাবুর।' খিখি খ্যাখ্যা করে হাসতে থাকলেন হালদারমশাই।

কর্নেলও হাসলেন, 'তাহলে আর হোসেনের ওপর আপনার রাগ থাকা উচিত নয়।'

হালদারমশাই চেয়ারে ধপাস করে বসে নস্যি নিয়ে বললেন, 'না। ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'

চন্দ্রকান্ত শুনছিলেন। বললেন, 'সেকেন্ড রাউন্ড ফাইট কার সঙ্গে কার?'

আমি বললুম, 'সম্ভবত পাঁচুর সঙ্গে হরবাবুর।'

'সম্ভবত নয়, তাই,' হালদারমশাই বললেন। 'হোটেলে যাওয়ার পথে সেই হোঁতকা-মোটা লোকটা পাঁচু না ফাঁচুকে দেখলুম। শেঠমশাইদের বাড়ির দিকে হনহন করে হেঁটে চলেছে। আর যাওয়া হল না হোটেলে। ফলো করলুম চুপিচুপি। বেশ খানিকটা দূরে একটা ইটের ঢিবির ওপর থেকে নজর রাখলুম। একটু পরে হরবাবু বেরোলেন। তারপর দু-জনে ঝগড়া বেঁধে গেল। খেঁকি কুকুরটাও কম যায় না। সেও পাঁচু না ফাঁচুকে মুখ ভেংচে যাচ্ছেতাই গাল দিতে শুরু করল।'

কর্নেল বললেন, 'হালদারমশাই, খবরটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে এবার আপনার পেটে কিছু পড়া দরকার। নীচের ক্যান্টিনে গিয়ে দেখুন, যদি কিছু মেলে।'

'নাঃ। আমি অন্নপূর্ণা হোটেলেই যাই। মোটে তো সওয়া দুটো বাজে। ওখানে তিনটে পর্যন্ত খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে।' হালদারমশাই তেতো মুখে বললেন। 'তবে আসল কথাটা হল, এই হোটেলের চার্জটা বড্ড বেশি।'

হালদারমশাই চলে গেলে আবার চোখ বুজে প্রিয় ভাতঘুম ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম। তারপর যে ঠিকই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাতে সন্দেহ নেই। ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে। কর্নেল বললেন, 'চারটে বাজে, জয়ন্ত! উঠে পড়ো। বেরোতে হবে।'

ঘরে চন্দ্রকান্ত নেই দেখে বললুম, 'বিজ্ঞানী ভদ্রলোক কোথায় গেলেন?'

'মন্দিরের চরে রওনা দিয়েছেন।'

'সর্বনাশ! ওঁকে একা বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত হয়নি।'

'ভয় নেই, ডার্লিং! ওঁর কাছে শুধু লেসার-ল্যাসো নেই, দস্তুরমতো সাংঘাতিক লেসার-পিস্তলও আছে। ছুড়লে ত্রিভুবন দাশ সঙ্গেসঙ্গে ভস্মীভূত হবে, তবে তার চেয়ে ওঁর দুর্ভাবনা গ্লাইডারটা নিয়ে। ত্রিভুবন দাশের চোখে পড়লে ওটা সামলে দিতেও পারে।'

বেরিয়ে আট নম্বর ঘরের দরজায় তপোব্রতকে ডাকতে গেলুম। দেখি, দরজায় তালা আঁটা। বললুম, 'তপোব্রতবাবুও একা বেরিয়েছেন দেখছি।'

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'হয়তো কোমল-কোরককে উদ্ধারে বেরিয়েছেন ফের। এসো, আমরা আগে থানায় যাই। শেঠমশাই চটে আগুন হয়ে আছেন। ওঁকে সব বুঝিয়ে বলা দরকার। তারপর মন্দিরের চরে রওনা হব। ত্রিভুবন দাশ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে। ঘটনাটা কী দাঁড়ায়, দেখা দরকার। লোকটা অসম্ভব ধূর্ত।'

প্যালেস হোটেলের ফটকের কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালুম। বুক ধড়াস করে উঠল। রাস্তার ওধারের জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছেন হরবাবু। চাপা গলায় বলে উঠলুম, 'কর্নেল! কর্নেল! হরবাবু!'

কর্নেল কিন্তু একটুও ভড়কালেন না। সহাস্যে এগিয়ে গেলেন হরবাবুর দিকে। যেন হ্যান্ডশেক করবেন, এমন একটা হাবভাব। হরবাবু এবার পাঁচুবাবুর পিস্তলটা বের করে কর্নেলের বুকে কয়েকটা গুলি ছুড়বেন ধরেই নিয়েছি, এবং কর্নেলের বোকামি দেখে যত তাজ্জব, তত কাঠ হয়ে গেছি আতঙ্কে।

কিন্তু হরবাবু সেসব কিছুই করলেন না। মুখে সেই রাগী ভাবটাও দেখলুম না। কাঁদো-কাঁদো মুখ করে ভাঙা গলায় বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে কর্নেল। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, আমি ত্রিভুবন দাশের ফাঁদে পা দিয়েছি। ওকে আমি চিনতে পারিনি বলেই এই ভুলটা করে ফেলেছি। আমায় ক্ষমা করুন।'

কর্নেল বললেন, 'কী সর্বনাশ হয়েছে, হরবাবু?'

'কোমল-কোরককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কোথায় রেখেছিলেন ওদের?'

'বাজার এলাকায় আমার এক বন্ধু ব্রতীনের বাড়িতে। গত রাতে বাবা এসে পড়লেন হঠাৎ। বেগতিক দেখে হোসেনের বউকে সেখানে ওদের রাখতে পাঠিয়েছিলুম। আজ সকালে গিয়েও দেখেছি, ওরা ব্রতীনের ছেলের সঙ্গে ভাব করে ফেলেছে। খেলায় মেতে আছে।'

'ব্রতীনবাবুকে কিছু খুলে বলেননি?'

'না। ওকে বলেছিলুম, জঙ্গলের ভেতর ভাঙাচোরা বাড়িতে ওদের মন টিকছে না। কলকাতার ছেলে তো!'

'বেশ। তারপর কী হল বলুন?'

'এইমাত্র ব্রতীনের বাড়ি থেকে আসছি। ব্রতীন কোর্টে। ওর বউ বলল, বুলুর সঙ্গে একটু আগে বাগানে ওদের খেলতে দেখেছে। বুলু ব্রতীনের ছেলে। সে বলল, খেলতে খেলতে হঠাৎ দৌড়ে দু-জনে চলে গেল। তারপর আর পাত্তা নেই।' হরবাবু দম নিয়ে বললেন ফের, 'আমার সন্দেহ, ত্রিভুবন দাশ ওদের চুরি করেছে।'

'বুলু বলল, খেলতে খেলতে হঠাৎ দৌড়ে চলে গেল?'

'তাই তো বলল। কেন অমন করে চলে গেল, বোঝা যাচ্ছে না।'

'হয়তো বোঝা যাচ্ছে হরবাবু!'

হরবাবু ব্যগ্রভাবে বললেন, 'কী বোঝা যাচ্ছে, কর্নেল?'

'বাগানের কাছে কেউ এসে ওদের ইশারায় ডেকেছিল।'

'ঠিক ঠিক। কোমল-কোরক খুব মিশুকে স্বভাবের ছেলে তো। ত্রিভুবন ব্যাটাচ্ছেলে ঝোপের আড়াল থেকে ইশারায় ডেকেছে, অমনি ওরা দৌড়ে গেছে। আর ওর পাল্লায় পড়েছে।'

কর্নেল বললেন, 'ভাববেন না হরবাবু! ওদের উদ্ধার করে দেব। এখন আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিন।'

হরবাবুর চেহারায় আগের মতো রাগী ভাবটা ফুটে উঠল। বললেন, 'এ কি প্রশ্ন করার সময়?'

কর্নেল নির্বিকার মুখে বললেন, 'আপনার কলকাতার বাড়ির গেটে লেটার বক্সে কোরকের হাতে লেখা একটা চিঠি পাওয়া গেছে। সেটা আপনিই কোরককে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন একসময়। তাই না?'

হরবাবু মুখ নামিয়ে বললেন, 'হুঁ:! কিন্তু এখন এসব কথার মানে হয় না।'

'রবিবার তপোব্রতের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যাওয়ার জন্য আপনিই কোমল-কোরককে...'

কর্নেলকে থামিয়ে দিয়ে হরবাবু বললেন, 'বেশ করেছি। ওয়ার্থলেস! এলুম সাহায্যের আশায়, এসে দেখছি, ভুল করেছি। খালি আজেবাজে প্রশ্ন।'

হরবাবু পা বাড়ালেন। ত্রিভুবন দাশের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই যাচ্ছেন, এমন ভঙ্গি। কর্নেল বললেন, 'প্যারিসে ছবির প্রদর্শনী করার জন্য ত্রিভুবন দাশের ফাঁদে পা না দিলেই পারতেন, হরবাবু!'

হরবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, 'কে বলল এমন কথা?'

'তপোব্রত আড়ি পেতে শুনেছিলেন,' কর্নেল তেমনি নির্বিকার মুখে বললেন। 'হ্যাঁ, একথা ঠিক, কোমল-কোরক আপনার দাদার ছেলে। তাদের ক্ষতি করার ইচ্ছে আপনার ছিল না। শুধু এটা ট্রাম্প কার্ড হিসেবে-অর্থাৎ, তুরুপের তাস হিসেবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। মহাবল মন্দিরের ফটো থেকে রত্নটা কোথায় আছে, তার ক্লু খুঁজে পেলে সেটা উদ্ধার করে ত্রিভুবন দাশকে দিতেন। প্যারিসে প্রদর্শনী করতে যাওয়ার জন্য টাকাকড়ির লোভ দেখিয়েছে সে। আর ফটো থেকে সূত্র খুঁজে না পেলে আপনার বাবা যে নাতিদের উদ্ধার করতে দরিয়াগঞ্জে ছুটে আসবেন এবং মুক্তিপণ হিসেবে পান্নাটা

শিবমন্দিরে নিয়ে যাবেন, সে তো নিশ্চিত। সেজন্যই দীর্ঘ এক সপ্তাহ-আগামী রবিবার পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু হালদারমশাইয়ের মুখে কলকাতায় আপনার স্টুডিয়োতে হামলা আর ডনের মৃত্যুর খবর পেয়ে আপনি বুঝতে পারলেন, ত্রিভুবন দাশ বিনি পয়সায় রত্নটা হাতাতে চায়। এদিকে হঠাৎ গত রাতে আপনার বাবা এসে হাজির। আপনার তখন সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা।'

হরবাবু গলার ভেতর বললেন, 'শয়তানের বাচ্চাকে ফটোটার কথা বলা ভুল হয়েছিল।'

'হরবাবু, আপনি কি জানেন, এই ত্রিভুবন দাশই আপনার দাদা-বউদির মৃত্যুর কারণ?'

হরবাবু চমকে উঠলেন। ঠোঁট কামড়ে ধরে রাঙা চোখে তাকিয়ে রইলেন।

'আপনাকে একটু হিন্ট দিয়েছিলুম হরবাবু, গ্রাহ্য করেননি।' কর্নেল শান্তভাবে চুরুট বের করে ধরালেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, 'তবে কথাটা হল, লুকিয়ে রাখা রত্নটার সহজ সূত্র অন্যত্র ছিল, হরবাবু!'

হরবাবু আস্তে বললেন, 'কোথায় ছিল?'

'আপনার বাবা ছেলেবেলায় আপনাকে এই ছড়াটা শিখিয়ে থাকবেন আশা করি: দুই ডাকে বাট/উত্তরে হাঁট/ঘাটে মহাবল...'

এ পর্যন্ত শুনেই হরবাবু বলে উঠলেন, 'ধুর মশাই! এলুম আপনার সাহায্য চাইতে। আর আপনি ছড়া আওড়াচ্ছেন! শয়তানের বাচ্চার সঙ্গে আমাকে একা লড়তে হবে। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত!' বলে সটান ঘুরে জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপের ভেতর গজরাতে গজরাতে অদৃশ্য হলেন।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'শিল্পীরা একটু ছিটগ্রস্ত হন, সেটা ঠিক। কিন্তু এমন নির্বোধ শিল্পী কখনো দেখিনি, ডার্লিং! প্যারিসে ছবির প্রদর্শনী করার লোভে এমন কাণ্ড কেউ করে?'

খাপ্পা হয়ে বললুম, 'হরবাবু করেছেন। করে শেষ পর্যন্ত বিপদে ফেলেছেন দুটো বাপ-মা-মরা ছেলেকে। নিজের দাদার ছেলে!'

'বোকা! বোকা!' বলে কর্নেল পা বাড়ালেন।

বললুম, 'পাঁচু কোমল-কোরককে চুরি করে ধরে নিয়ে গেছে। আমার খুব ভয় হচ্ছে, কর্নেল!'

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। বললেন, 'এসো। থানায় গিয়ে শেঠমশাই আর গোবিন্দ পালোয়ানের কী অবস্থা হল, দেখা যাক।'

রাস্তায় একটা সাইকেল-রিকশো পাওয়া গেল। আমরা থানার দিকে চললুম। বাজার এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে থানা। অফিসার-ইন-চার্জ মুকুন্দবাবুর ঘরে ঢুকেই যা দেখলুম, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না।

শেঠমশাই হাসিমুখে বসে আছেন এবং তাঁর দুই ঊরুর ওপর দুটো মুখোশপরা খুদে মানুষ। তাদের হাতে খেলনা-পিস্তল। কর্নেলকে দেখে তারা সেই পিস্তল তুলে চিক্কুর ছাড়ল, 'হ্যান্ডস আপ!'

কর্নেল দু-হাত তুলে বললেন, 'হ্যান্ডস আপ তো করলুম কো-কো। কিন্তু আমাকে চুরি করে লুকিয়ে রাখার জায়গা কোথায় পাবে? এই পেল্লায় শরীর লুকিয়ে রাখা সোজা নয়।'

কো-কো-ই বটে! স্বপ্ন নয়, সত্যি তাদের দেখছি। শেঠমশাই ওদের মুখোশ খুলে দিয়ে বললেন, 'খুব হয়েছে! সব সময় খালি এইসব কুৎসিত মুখোশ পরে থাকবে আর গণ্ডগোল বাধাবে! চলো, ফিরে গিয়ে মজা দেখাচ্ছি!'

কর্নেল বললেন, 'তাহলে শেঠমশাই নাতিদের ফিরে পেলেন তো?'

অমনি শেঠমশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'আপনিও মশাই কম গণ্ডগোলের লোক নন। আপনার পেটে পেটে বড্ড বেশি প্যাঁচ-পয়জার। তবে কোমল-কোরককে উদ্ধারের দাবি আপনি করবেন না। তপু এদের এইমাত্র উদ্ধার করে এনেছে। ওকে আমি মিথ্যে সন্দেহ করেছিলুম।'

তপোব্রতকে এতক্ষণে দেখতে পেলুম। আসলে কো-কো-র দিকেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলুম বলে তাকে লক্ষ করিনি। তিনি বললেন, 'না শেঠমশাই! কর্নেলের পরামর্শেই কো-কো-কে খুঁজে পেয়েছি।'

শেঠমশাই ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তার মানে?'

তপোব্রত বললেন, 'দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম করছি, তখন কর্নেল আমার রুমে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এখানে ছোটোবাবুর কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন কি না। অমনি ব্রতীনবাবুর কথা মনে পড়ল। ব্রতীনবাবু কলকাতায় আপনাদের বাড়ি গিয়ে ওঠেন দেখেছি।'

'হুঁ, ব্রতীন উকিল।'

'তো, কর্নেল বললেন, ব্রতীনবাবুর বাড়ি খুঁজে আনাচেকানাচে গিয়ে লক্ষ রাখুন। সঙ্গেসঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। একে-তাকে জিজ্ঞেস করে বাড়িটা খুঁজে বের করলুম। বাড়ির পেছনে বাগান। দেখি কী, সেখানে কো-কো একটা ছেলের সঙ্গে স্টার-ওঅর খেলছে। খেলতে খেলতে আমাকে ওরা দেখতে পেল। দৌড়ে এল।'

শেঠমশাই কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাহলে আপনারই ক্রেডিট পাওনা। তবে শিবমন্দিরে খামোকা হাঙ্গামার পেছনে আপনারই চক্রান্ত ছিল। জানেনেই তো, গোবিন্দটা যা গোঁয়ার!'

'সবই আপনার নিরাপত্তার জন্য শেঠমশাই,' অফিসার-ইন-চার্জ মুকুন্দবাবু বললেন, 'যাই হোক, জিপ রেডি। সঙ্গে আর্মড গার্ড থাকবে। কলকাতায় নিরাপদে আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসবে, ভাববেন না। এতক্ষণ শুধু কর্নেল সায়েবের জন্য অপেক্ষা করছিলুম।'

শেঠমশাই ব্যস্তভাবে উঠে পড়লেন। নাতিদের বগলদাবা করে বেরোলেন। গোবিন্দর হাতে তাঁর সেই নকশা কাটা লাঠি। কর্নেল আর আমার দিকে সে এমন চোখে তাকাচ্ছিল, বুঝতে পারলুম, এরপর কলকাতার দরিয়াগঞ্জ ভবনে আমাদের ঢোকা হয়তো নিরাপদ হবে না। শিবমন্দিরে পুলিশের সঙ্গে তার মল্লযুদ্ধের পেছনে কর্নেলের চক্রান্তের ব্যাপারটা সে আঁচ করে থাকবে।

বাইরে গিয়ে তপোব্রতকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কে কোমল আর কে কোরক, তপোব্রতবাবু?'

তপোব্রত বললেন, 'এই হল কোমল, আর এই হচ্ছে কোরক।'

কোমল বলল, 'ভ্যাট! আমি হাহা!'

কোরক বলল, ‘আমি হুহু।’

শেঠমশাই ধমক দিলেন, ‘শাট আপ! ফের হাহা-হুহু করলে এবার আহা-উঁহু করিয়ে ছাড়ব। তপু, সাবধান! তুমি একজনকে ধরো! গোবিন্দ, আমার ছড়ি দে। দিয়ে তুই একজনকে ধর। নইলে আবার ভো-কাট্টা হয়ে যাবে।’

তপোব্রত বললেন, ‘ছোটোবাবুকে ডেকে নিয়ে এলে হত, শেঠমশাই!’

শেঠমশাই তাঁর সেই গাবদা ছড়িটা বাগিয়ে ধরে বললেন, ‘ওকে লাঠিপেটা করব। উড্ডুট্টে সব ছবি এঁকে এঁকে ও নিজেই একটা উড্ডুট্টে ছবি হয়ে গেছে। গিয়ে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। এখানে বসে যত ইচ্ছে ছবি আঁক। ভিটে আগলে বসে থাক আর জমিজমার দেখাশোনা কর। গবেট! বুদ্ধু হাঁদারাম!’ তারপর কর্নেলের দিকে ঘুরে বললেন, ‘বাচ্চু ফকিরের পান্নাটা বেচে আমি একটা অনাথ আশ্রম খুলব। ভাববেন না এটা আমি মেরে দেবার তালে আছি। প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?’

জিপটা চলে গেল। কর্নেল মুকুন্দবাবুকে একটু তফাতে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি কীসব শলাপরামর্শ করলেন। তারপর এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, ‘চলো, ডার্লিং! বিজ্ঞানী ভদ্রলোক মন্দিরের চরে কী করছেন দেখা যাক।’

বাঁধে হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের চরের সামনাসামনি যখন পৌঁছোলুম, তখন সূর্য ডুবুডুবু। নরম গোলাপি আলো ঝলমল করছে নীচের চওড়া খাতে। কর্নেল বাইনোকুলারে পদ্মার বুকে বুনো হাঁস দেখলেন কিছুক্ষণ। ক্রমশ দিনের আলো ধূসর হয়ে এল। এতক্ষণ নীচের খাতে দুপুরের সেই ছোট্ট পানসিটাকে আসতে দেখলুম। কর্নেল বললেন, ‘এসো জয়ন্ত! মন্দিরের চরে পাড়ি দিই।’

বাঁধের ঢালে পাথরের চাবড়ার খাঁজে সাবধানে পা রেখে পর্বত-অভিযাত্রীদের মতো নেমে গেলুম দু-জনে। কর্নেল পানসির মাঝিকে ডেকে বললেন, ‘যে ভদ্রলোককে মন্দিরের চরে পৌঁছে দিয়েছ, তিনি ফিরে আসেননি তো ওখান থেকে?’

মাঝি বলল, ‘না তো! উনি বললেন রাত্তিরে শিবমন্দিরে পুজো দেবেন।’

বুঝলুম, বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তর কথা হচ্ছে। মিনিট কুড়ি পরে পানসি মন্দিরের চরে গিয়ে ভিড়ল। কর্নেল মাঝিকে বললেন, ‘তুমি বরং ওপারে গিয়ে অপেক্ষা করো। টর্চের আলো দেখিয়ে ইশারা করব, তখন নৌকো নিয়ে আসবে।’

মাঝি একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল, ‘স্যার, গত রাত্তিরে মন্দিরের চরে ভূতুড়ে আলো দেখেছি।’

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, ‘স্মাগলারদের কারবার! আলোর ইশারা দিচ্ছে স্যাঙাতদের।’

মাঝি বলল, ‘কেউ কেউ তা বলছেও বটে। তবে বলা যায় না কিছু। এই চরে ভূত আছে, তাও সত্যি স্যার! বাবার কাছে শুনেছি...’

কর্নেল তার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিলেন। বললেন, ‘মোটা বকশিশ পাবে। নাও, শিগগির ওপারে চলে যাও। পুলিশের চোখে পড়লে তোমাকে সন্দেহ করবে, বুঝতে পারছ না?’

মাঝি দ্রুত নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে ওপারে পাড়ি জমাল। বললুম, ‘লোকটা আমাদেরই হয়তো স্মাগলার ভাবল।’

কর্নেল বললেন, 'চুপ, আর স্পিকটি নট।'

মন্দিরের চরে গাছপালার ভেতর এখনই জমাট আঁধার ঘনিয়েছে। তবে পাখিদের তুলকালাম চ্যাঁচামেচি থামেনি। কর্নেল অন্ধকারে দেখতে পান, সেটা সত্যি। তবে আমাকে বার কতক আছাড় খেতে হল। কিছুক্ষণ পরে একটা খোলা জায়গায় পৌঁছোলুম। কর্নেল একটা ঝোপের পাশে আমাকে টেনে বসিয়ে দিলেন এবং নিজেও বসলেন। চোখে অন্ধকার মেখে যাচ্ছে ক্রমশ। কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

একটু পরে হেঁড়ে গলায় কেউ গেয়ে উঠল, 'আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে-এ-এ...!' কী অদ্ভুত! এ যে চন্দ্রকান্তের গলা। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন! এর চেয়ে আরও অদ্ভুত ব্যাপার হল, এখন জ্যোৎস্না কোথায়? কৃষ্ণপক্ষের ঘুরঘুট্টে অন্ধকারে এমন গান গাওয়ার কোনো মানে হয়?

রবিঠাকুর বেঁচে থাকলে বিজ্ঞানীকে লাঠিপেটা করতেন সন্দেহ নেই। চন্দ্রকান্তকে পাঁচু কিছু খাইয়ে পাগল করে দেয়নি তো?

কর্নেলকে চিমটি কাটলুম। কর্নেল পালটা চিমটি কেটে আমাকে যেন ধমকে দিলেন। আবছা দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানী পায়চারি করছেন আর সমানে গাইছেন, 'জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে-এ-এ-এ!'

একটু পরে কেউ বলে উঠল, 'হ্যাল্লো চাঁদু! এসে গেছ তাহলে!'

গান থামিয়ে চন্দ্রকান্ত বললেন, 'ওয়েলকাম, পাঁচু! কনগ্রাচুলেশন! তুমি যে কসমিক রেডিয়ো-অ্যাকটিভ রে কেন্দ্রীভূত করে সবুজ আলোর বল তৈরি করেছ, তা আগাম আমায় জানাবে তো? খামোকা আমার বাগানে গিয়ে তাই নিয়ে লুকোচুরি খেলতে শুরু করলে। আমি কি জানি যে, তুমিই এই কীর্তি করে সিগন্যাল দিচ্ছ?'

'তুমি আমাকে দেখলেই ধুন্ধুকে লেলিয়ে দিতে। সেই ভয়ে তোমার মুখোমুখি হতে পারছিলুম না।'

'যাকগে। কই, দেখি তোমার কীর্তিকলাপ। ডেমনস্ট্রেশান দাও। তারপর কথা হবে।'

'দেখাচ্ছি। তবে সাবধান, গ্রিন কসমিক বলটা কেড়ে নেবার চেষ্টা কোরো না যেন। মারা পড়বে। আমি এখন মরিয়া হয়ে উঠেছি, চাঁদু!'

'তোমার কথা শুনেই বুঝতে পারছি সেটা! নাও, দেরি কোরো না!'

এবার সেই সবুজ আলোর ক্রিকেট বলটা ভেসে উঠল অন্ধকারে। এদিকে-ওদিকে নাচানাচি জুড়ে দিল। তারপরই ঠিক চন্দ্রকান্তের বাগানে সে-রাতে যা ঘটেছিল, তাই ঘটল। সবুজ বলটা সুড়ুৎ করে পিছলে এল এবং অদৃশ্য হয়ে গেল। চন্দ্রকান্তের খিখি হাসি শুনতে পেলুম। পরক্ষণে ত্রিভুবন দাশ ওরফে পাঁচুর গর্জন শুনলুম, 'তবে রে বিশ্বাসঘাতক!'

তারপর কেউ টর্চ জ্বালল। দেখলুম, চন্দ্রকান্ত এবং একটা বেঁটে হোঁতকা মোটা লোক মল্লযুদ্ধ করছেন। সঙ্গেসঙ্গে হরবাবুর চিৎকার শুনলুম, 'হ্যান্ডস আপ!'

পাঁচু হকচকিয়ে গিয়ে চন্দ্রকান্তকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দু-হাত তুলে বলল, 'হর নাকি? তুমি আবার এর মধ্যে নাক গলাতে কেন এলে?'

'কোমল-কোরক কোথায়, আগে বলো! নইলে তোমার পিস্তলের গুলিতে তোমারই খুলি ফুটো করে দেব!'

‘কী মুশকিল! আমি কেমন করে জানব? ওদের তো তুমিই চুরি করে এনেছ!’

ততক্ষণে চন্দ্রকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে ধুলোবালি ঝাড়ছিলেন পোশাক থেকে। এবার খপ করে পাঁচুকে পেছন থেকে ধরতে গেলেন। অমনি পাঁচু একটা পা ছুড়ল। ব্যাস! চন্দ্রকান্ত আবার কুপোকাত। সেই ফাঁকে পাঁচু ঝাঁপ দিল হরবাবুর ওপর। গুলির শব্দ শুনতে পেলুম। তারপর হরবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘ধর! ধর!’ তাঁর হাতের টর্চটা পড়ে নিভে গিয়েছিল। এতক্ষণে কর্নেল টর্চ জ্বেলে রণক্ষেত্রে ঢুকলেন। সেই আলোয় পাঁচুকে দেখলুম, বালিয়াড়ির দিকে ফুটবলের মতো ছুটে চলেছে।

কর্নেল দৌড়ে গেলেন। চন্দ্রকান্ত, হরবাবু এবং আমিও ‘ধর! ধর!’ বলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। হরবাবু পিস্তলের সব ক-টা গুলি শেষ করে ফেললেন। একটাও পাঁচুর গায়ে লাগল না।

বালিয়াড়ির ঢালে পৌঁছে পাঁচু থমকে দাঁড়াল। কারণ সামনের দিক থেকে হঠাৎ একসঙ্গে কয়েকটা টর্চের আলো এসে পড়েছে। তখন সে ডান দিকে মোড় নিয়ে সমতল বালির চরে দৌড়োতে শুরু করল। ওই আলোগুলো যে পুলিশের, তখনই বুঝতে পারলুম। কেউ চেঁচিয়ে উঠল, ‘হল্ট! হল্ট! গোলি মার দেগা!’

একটু পরে চমকে উঠে দেখলুম, পাঁচু বালির ভেতর তলিয়ে যাচ্ছে। সে দু-হাত তুলে করুণ আর্তনাদ করে উঠল, ‘বাঁচাও! বাঁচাও!’

কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, ‘সর্বনাশ! চোরাবালিতে গিয়ে পড়েছে!’

একদল পুলিশ টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে দৌড়ে আসছিল। তারা আমাদের পাশে এসে থমকে দাঁড়াল। মুকুন্দবাবু বললেন, ‘যাঃ! আসামি হাতছাড়া হয়ে গেল যে!’

চন্দ্রকান্ত বিব্রতভাবে বললেন, ‘কিচ্ছু করা যাবে না। লেসার-ল্যাসো দিয়ে জ্যান্ত মানুষ আটকানো যায় না।’

এতগুলো টর্চের আলোয় চোরাবালিতে একটা মানুষ ক্রমশ তলিয়ে গেল দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এমন ভয়ংকর দৃশ্য কখনো দেখিনি। বালিগুলো নড়তে নড়তে একসময় স্থির হয়ে গেল।

কর্নেল চাপা শ্বাস ফেলে দুঃখিতভাবে বললেন, ‘আর কী! ধাতুবিজ্ঞানী ত্রিভুবন দাশ তাঁর পাপের শাস্তি পেলেন। মুকুন্দবাবু, আগামীকাল ওই বিপজ্জনক এরিয়াটা ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করুন।’

আমরা বিষণ্ণ, ক্লান্ত একদল মানুষ ফিরে চললুম দরিয়াগঞ্জ শহরের দিকে। পদ্মাকে যে কেন রাক্ষুসি নদী বলা হয়, এতদিনে সেটা বুঝতে পারছিলুম।